ওঁ নমঃ।

"সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য"—(তৃতীয় খণ্ড)

জ্ঞান-প্রদীপ

(দ্বিতীয় ভাগ।)

শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত।

——:০:——

শিল্প ও সাহিত্য পুস্তক-বিভাগ হইতে
শ্রীশ্যামলাল শর্ম্মা, শিল্পবিশারদ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুল, বহুবাজার,
কলিকাতা।

১৩২৯।

মূল্য বাঁধাই ১৷০ পাঁচসিকা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

পঞ্চমোল্লাস।

ষষ্ঠোল্লাস।

সপ্তমোল্লাস।

ভূমিকা।

বহুদিন পরে শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় "জ্ঞান প্রদীপ" দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ গুরুদেব সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশে একান্তে অবস্থান করিবার কারণ, যাঁহাদের উপর ইহার "প্রুফ" দেখিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে নানা দৈবী বাধা বিঘ্ন সংঘটিত হওয়ায় "প্রুফ" দেখার অসুবিধা হেতু ইহা প্রকাশ হইতে এত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বিরজা সংস্কার ও অন্তিম দীক্ষা, সন্ন্যাসাশ্রম, অবধূতাদিসন্ন্যাসীর আচার, অধিকার ভেদ ও সমাধি, শ্রীমদ্ বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ দেব-কপিল ও গঙ্গাসাগর প্রসঙ্গ, মঠ ও মঠাম্নায় সপ্তকরহস্য, জ্ঞানতত্ত্বাদি বিচার ও তাহার সাধনা, তন্ত্রে সৃষ্ট্যাদিতত্ত্ব ও সমগ্র দর্শনশাস্ত্রসমন্বয়, আত্ম তত্ত্বাদি রহস্য চতুষ্টয়, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য রহস্য, ত্রিবিধ প্রণব রহস্য এবং মুক্তি তত্ত্বাদি অতি গভীর ও অতি গুহ্য বিষয়সকল অতি বিশদ ভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অধুনাতন সাধু মহাত্মা ও গৃহস্থসাধকভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই এই সকল গূঢ় তত্ত্ব সম্যকরূপ অবগত নহেন, তাই আমরা পূজ্যপাদের শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ ভাবে ধরিয়া সাধারণের উপকারের নিমিত্ত এই সমুদায় বিষয় সুন্নিবেশিত করিয়া লিখাইয়া লইয়া প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। এক্ষণে মুক্তিকামী মহোদয়গণকে ইহার মর্ম্মাবগত হইয়া নিগূঢ় তত্ত্ব সকল হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক সাধন মার্গে অগ্রসর হইতে দেখিলে আমরা আপনাদিগকে চরিতার্থজ্ঞান করিব কারণ পূজ্যপাদ

করিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার শম-দম-সিদ্ধি ও বিবেক-বুদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়াছে, জানিতে পারিলেই, তাঁহাকে এই অন্তিম আশ্রম গ্রহণের আদেশ প্রদান করিবেন। কিন্তু কালধর্ম্মের প্রবাহে সময় সময় ইহার ভিন্নরূপও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মফল যে, সেই বৈচিত্র্যময় সংস্কারসমূহের সৃষ্টি করিয়া দেয়, তাহা অবধারিত সত্য। সুতরাং অনেক স্থলে অনেক অপুষ্ট-কর্ম্ম শিষ্যকেও এই আশ্রম গ্রহণের আদেশ প্রদানের জন্য গুরুদেবকে বাধ্য হইতে হয়। এই হেতু অতি প্রাচীনকাল হইতেই সন্ন্যাসীর নানাবিধ ভেদ প্রচলিত আছে। নিগমাগম অর্থাৎ বেদ ও তন্ত্র বা ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় প্রকার সাধন বিধানের মধ্যেই সন্ন্যাসীদিগের কর্ম্ম ও উপাসনার ভেদ বর্ণিত আছে। পরবর্ত্তী অংশে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই আশ্রম গ্রহণের সাধারণ বিধিই প্রদর্শিত হইতেছে। সন্ন্যাস গ্রহণের এই সাধারণ বিধি ব্যতীত বিশেষ বিধি সম্বন্ধে পরে যথাস্থলে বর্ণিত হইবে। অর্থাৎ কুটীচক, বহূদক, পরিব্রাজক, হংস ও পরমহংসাদি অবধূত, ভিক্ষু বা যতিদিগের পক্ষে যে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার অবলম্বন করিতে হয় বা কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ সংস্কার অবলম্বনীয় তাহা পাঠক পরবর্ত্তী অংশে দেখিতে পাইবেন। পরমহংসাবধূতপ্রবর ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যদেবের প্রবর্ত্তিত "সন্ন্যাস-পদ্ধতির" মধ্যেও পূর্ব্বকথিতরূপ অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়।

"অহং সন্ন্যাসং করোমীত্যনুজ্ঞাং গৃহীত্বা আত্মগৃহগ্রামাদিকং প্রদক্ষিণীকৃত্য, ততঃ ক্রোশপ্রমাণাং উদীচীমনুসৃত্য তত্র স্নানাদিকং নিত্যকর্ম্ম বিধায় বিশেষ দেবার্চ্চনাদিকং কুর্য্যাৎ। ততঃ দেব-

পিত্রাদীংশ্চ স্মৃত্বা পুনঃ শান্তং সুশীলং সুবলং ব্রহ্মকুলোৎপন্নং সর্ব্ববিধ ক্রিয়ারহিতং, লোভমোহাদি ষড়ূর্ম্মিরহিতঃ * শিবঃ সন, আত্মদর্শিনং ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণং সম্যক্ তং শুদ্ধচৈতন্যমেবং গুরুং পশ্যেৎ। যথোক্ত বিধিনা গুরুস্থানং দণ্ডবৎ প্রণম্য সন্ন্যাসং প্রার্থয়েৎ। হে গুরো ত্বং—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র-স্বরূপঃ ত্বৎপ্রাসাদাৎ সন্ন্যাসং করোমি ॥"

অর্থাৎ আত্মীয় পরিবারবর্গের নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আপনার গৃহ ও গ্রামাদি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক উত্তর-দিকে অন্ততঃ এক ক্রোশ পরিমাণ পথ চলিয়া সেই স্থানেই স্নানাদি নিত্যকর্ম্ম করণান্তর তথায় বিশেষ দেবার্চ্চনাদি কর্ম্ম করিবেন। দেবতা ও পিতৃ আদির স্মরণ করিয়া লোভ-মোহাদি অর্থাৎ শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা এই ষড়ূর্ম্মি রহিত অথবা শরীরের শীতাতপ, চিত্তের লোভ এবং প্রাণের ক্ষুৎপিপাসা এই ষড়ূর্ম্মি রহিত শিব স্বরূপ হইয়া, শান্ত, সুশীল, সুবশ, ব্রহ্মকুলোৎপন্ন সর্ব্বক্রিয়ারহিত আত্মদর্শী ও ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ সম্পূর্ণ শুদ্ধ-চৈতন্যময় শ্রীগুরু সন্দর্শন করিয়া যথোক্ত বিধানে দণ্ডবৎ প্রণামান্তে প্রার্থনা করিবেন, হে গুরো, আপনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রের স্বরূপ, আপনারই প্রসাদে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।"

গুরুদেব শিষ্যকে পুনরায় বলিবেনঃ—হে পুত্র, সন্ন্যাসং কিমর্থং করিষ্যসি, গৃহাশ্রম এব কর্ত্তব্যঃ, গৃহাশ্রমে সর্ব্বধর্ম্মান্ প্রাপ্নোসি ॥"

অর্থাৎ হে পুত্র, কেন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে? এখন

"শীতাতপৌ শরীরস্য লোভমোহৌচ চেতসঃ।
প্রাণস্য ক্ষুৎপিপাসাচ" ইতি ষড়ূর্ম্ময়ঃ ॥

গৃহাশ্রমই তোমার কর্ত্তব্য, গৃহস্থাশ্রমেই সকল ধর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শিষ্য বলিবেন :—"গৃহাশ্রমং ন করোমি গৃহাশ্রমে অনেক শোক মোহাদি কর্ম্ম বন্ধনানি ভবন্তি, তস্মাৎ গৃহাশ্রমো ন কর্ত্তব্যঃ, তচ্চরণপ্রসাদেন সদা ব্রহ্মস্মরণং করোমি ॥"

অর্থাৎ না প্রভো! আর গৃহাশ্রমের অনুমতি করিবেন না, তথায় নানা শোক ও মোহাদি কর্ম্মবন্ধনের সদা আশঙ্কা আছে, আর গৃহাশ্রম করিব না। আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে এক্ষণে সর্ব্বদা ব্রহ্মস্মরণে দিনাতিপাত করিব।

গুরুদেব বলিবেন :—"পুত্র আচার্য্য স্থানে গচ্ছ ॥"*

অর্থাৎ হে পুত্র, তুমি আচার্য্য সন্নিধানে যাও।

শিষ্য তদনুসারে আচার্য্যের সমীপে যাইয়া দণ্ডবৎ প্রণামান্তে বলিবেন :—"গুরোস্তদাজ্ঞয়া সন্ন্যাসং করোমি।" অর্থাৎ হে গুরুদেব! আপনি আজ্ঞা দিন আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।

আচার্য্য বলিবেন :—"হে পুত্র কেন দুঃখেন সন্ন্যাসং করোষি।" অর্থাৎ হে পুত্র, কি দুঃখে সন্ন্যাসী হইবে?

শিষ্য বলিবেন :—"হে আচার্য্য দুঃখং নাস্তি মে, মোক্ষার্থং তৎ কৃপয়া সন্ন্যাসাশ্রমে ব্রহ্মচিন্তনং করোমি ॥" অর্থাৎ হে

---

* আচার্য্য ও গুরুর ভেদ যথা :—

উপনীয়াদদদ্ বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ।

যঃ সাধন প্রকর্ষার্থং দীক্ষয়েৎস গুরুঃস্মৃতঃ ॥

যিনি উপনয়ন সংস্কারান্তে সাবিত্রী দীক্ষাসহ বেদাদি শিক্ষা দেন বা উপদেশ করেন, তাঁহাকে আচার্য্য বলা যায়, আর যিনি আধ্যাত্মিক কল্যাণার্থ সাধনোপদেশ ও দীক্ষা প্রদান করেন তাঁহাকে গুরু বলা যায়।

আচার্য্য প্রভু, আমার কোনও দুঃখ নাই, আপনার কৃপায় মোক্ষ-লাভের জন্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তা করিব। ইত্যাদি।

অনন্তর আচার্য্য, শিষ্যকে পঞ্চগব্য প্রাশন দ্বারা দেহ শুদ্ধ করাইয়া "ওঁ হ্রীং শ্রীং ব্রহ্মহংসোঽহমস্মি তত্ত্বমসি" শব্দ প্রদান করিবেন। শিষ্য তদাজ্ঞায় তৎ প্রদত্ত কমণ্ডলু করমধ্যে লইয়া উত্তরাখণ্ডস্থিত বদরিকাশ্রমের দিকে তীর্থযাত্রার উদ্দেশে গমন করিবেন।

শিষ্য তীর্থযাত্রা সমাপনপূর্ব্বক পুনরায় গুরুস্থানে আসিয়া সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলে, গুরু পুনরায় আচার্য্য সমীপে পাঠাইয়া দিবেন। শিষ্য আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া পুনরায় সন্ন্যাসাশ্রম প্রার্থনা করিলে, আচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণের আজ্ঞা দিবেন। এস্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য, অধুনা প্রায় স্বতন্ত্র আচার্য্য পরিদৃষ্ট হয় না অথবা সন্ন্যাস গ্রহণকালে সে সাবিত্রী দীক্ষার আচার্য্য কিম্বা কুল-গুরু জীবিত নাও থাকিতে পারেন। অতএব বৈরাগ্যের পূর্ণতা হইলেই শিষ্য দ্বিধাশূন্যভাবে সন্ন্যাসী সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করিতে পারিবেন।

শিষ্য শ্রীগুরুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে আহ্নিক-কার্য্য সমাধা করিবেন, † পরে দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ হইতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত দেবতাবৃন্দ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের নিম্নলিখিতরূপে অর্চ্চনা করিবেন।

ঋণত্রয় মুক্তির প্রার্থনা ও ক্রিয়া।

† কোন কোন মঠে এই স্থলে নিম্নলিখিতরূপ সঙ্কল্পেরও বিধি আছে।

"ওঁ অশেষ দুঃখ নিবৃত্তি নিরতিশয়ানন্দ প্রাপ্তি পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তয়ে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণং করিষ্যে॥"

দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের নিকট ঋণত্রয় মুক্তির তাৎপর্য্য এই যে, আমি এই সংসারে কত কাল ধরিয়া গমনাগমন করিতেছি, কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া তাহারই কর্ম্মফলে স্বর্গে মর্ত্তে কত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই, এতদিনে বুঝি আমার সেই গতাগতিচক্র নিরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমার পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ভোগসুখ কিছুরই আর প্রয়োজন নাই, এখন চাই কেবল অন্তিম-পদ—মুক্তি। কিন্তু দেখিতেছি এখনও তাহার কিছু অন্তরায় আছে। আমার এই অবস্থার আনয়ন পক্ষে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পবিত্র প্রবাহে রক্ষা ও নিয়ত সহায়তা প্রদান করিয়া আমাকে ঋণত্রয়ে আবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব এ ঋণভার মস্তকে লইয়া কেমন করিয়া আমি মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইব? সুতরাং তাঁহাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা, তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহাদের ঋণভার হইতে মুক্তি দান করুন।

দেবতাবৃন্দ আমার জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মের বিচার করিয়া আমার প্রাক্তন নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমার কর্ম্মসমূহের সহায়তা ও রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আমি তাঁহাদের নিকট কর্ম্মানুকূল এই অপূর্ব্ব ভাগ্য প্রাপ্তি দ্বারা ঋণযুক্ত হইয়াছি।

ঋষিগণ জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তাঁহাদের অসীম জ্ঞানরাশি দান করিয়া আমায় এই উন্নতাবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহারাই জ্ঞানরাজ্যের অধিপতি, এই কারণ তাঁহাদের নিকট আমি সেই জ্ঞান-প্রাপ্তি-জনিত ঋণযুক্ত হইয়াছি।

এইরূপ পিতৃগণ জন্মজন্মান্তর ধরিয়া আমার ভাগ্য ও জ্ঞানাদির অবলম্বনে ভোগানুকূল দেহ পরে এই অন্তিম দেহ দান করিয়া

সহায়তা করিয়াছেন। এই কারণ তাঁহাদের নিকটও আমি এই দেহ-প্রাপ্তির দ্বারা ঋণযুক্ত হইয়াছি। অতএব তাঁহাদের সকলের দয়া ব্যতীত আমার এই আধিদৈব, আধ্যাত্মিক ও আধিভূতরূপে ত্রিবিধ ঋণ মুক্তির উপায়ান্তর নাই।

"পরাশর মাধবে" সন্ন্যাস প্রকরণের মধ্যে উক্ত হইয়াছে :—

"ঋণত্রয় মপাকৃত্য নির্ম্মমোনিরহঙ্কৃতিঃ
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবাথ বৈশ্যো বা প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া অহঙ্কার মমতা বর্জ্জিত হইয়া প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন।

শ্রীমন্মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥"

এই ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ করিয়া মোক্ষ-সাধনরূপ সন্ন্যাস-আশ্রমে মনোনিবেশ করা উচিত। কিন্তু এই ঋণসকল পরিশোধ না করিয়া মোক্ষধর্ম্মের সেবা করিলে নরক-প্রাপ্তি হয়।

এইরূপ শ্রীমন্মহর্ষি হারিতাদি মহাত্মাগণও তাঁহাদের সংহিতা-শাস্ত্রে এক বাক্যে বলিয়াছেন :—

"দত্বা পিতৃভ্যো দেবেভ্যো মানুষেভ্যশ্চ যত্নতঃ।
দত্বা শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যশ্চ মানুষেভ্যস্তু আত্মনঃ ॥"

অর্থাৎ পিতৃগণ দেবগণ ও ঋষি বা আধ্যাত্মিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত মনুষ্যগণের উদ্দেশ্যে দান ও শ্রাদ্ধ করিয়া, অনন্তর আত্মশ্রাদ্ধ সম্পাদনপূর্ব্বক সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিবে।

এই ক্রিয়া উপলক্ষে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের মধ্যে কাহার

কাহার নিকট ঋণ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে, শ্রীসদাশিব তাহা বলিয়াছেন :—

দেবতাপক্ষে—

"দেবা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স্বগণৈঃ সহ।"

অর্থাৎ আপনার আপনার গণ বা অনুচর অথবা তাঁহাদেরই অঙ্গজাত কিম্বা আবরণ দেবতাদের সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র ইহাঁরাই দেবগণের মধ্যে গণ্য। ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনায় ইহাঁরাই প্রথমস্তরের দেবতা। সৎ-চিৎরূপী পরব্রহ্ম যখন এক হইতে দ্বিধাভূত হইলেন, অর্থাৎ মূলবীজ চণকসদৃশরূপে এক অদ্বিতীয় ভাবে অবস্থিতির পর তাঁহার স্ব ইচ্ছায় সেই চণকাচ্ছাদিত ত্বকের ন্যায় তাঁহার আবরণ উন্মোচন করিলেন, তখন তিনি চণকান্তর্গত দুইটী দলের ন্যায় একের মধ্যেই দ্বিধারূপে প্রথম প্রকট হইলেন। সে দ্বয়-ভাব তখনও ওতপ্রোতভাবে জড়িত বা একাধারে পুরুষ-প্রকৃতি। তাঁহার সেই দক্ষিণাংশ যেন পুরুষ এবং বামাংশ যেন প্রকৃতি, কিন্তু তাহাও তাঁহার অবিচ্ছিন্ন অবস্থা, সে পুরুষাংশ গুণাতীত এবং প্রকৃতি-অংশ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাসমন্বিতা। পরে ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তির উন্মেষণায় সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে প্রথমেই রজোগুণের আধিক্য ফলে ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্কুর বা "ওঁকুর" উদ্গত হইল, সেই সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড প্রতিপালন জন্য ত্রিগুণের পৃথক পৃথক ত্রিধাশক্তির মধ্যে শক্তি-বিশেষের প্রধান্য লইয়া প্রথমস্তরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপ যে মূল-দেবতাত্রয় প্রকট হইলেন, যাঁহারা আমাকে জন্মজন্মান্তরের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আবর্ত্তমধ্যে পরিচালিত করিয়া আজ এই অপূর্ব্ব উন্নততম স্তরে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই স্ব-গণ সহিত সেই দেবতাত্রয়ের নিকটেই সাধক ঋণমুক্তির প্রার্থনা করিবেন।

ঋষিগণের মধ্যে :—

ঋষয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ দেবব্রহ্মর্ষয়স্তথা ॥”

অর্থাৎ সনক, সনন্দ ও সনৎকুমার আদি ঋষিগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ ও ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ এই তিন শ্রেণীর ঋষিদিগের নিকট ঋণত্রয় মুক্তির প্রার্থনা করিতে হইবে।

পিতৃগণের মধ্যে—

“অত্র যে পিতরঃ পূজ্যা বক্ষ্যামি শৃণু তানপি।
পিতা পিতামহশ্চৈব প্রপিতামহ এব চ ॥
মাতা পিতামহী দেবী তথৈব প্রপিতামহী।
মাতামহাদয়োপ্যেবং মাতামহ্যাদয়োঽপি চ ॥”

অনন্তর সেই সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় যে যে পিতৃগণের পূজা করিতে হইবে, তাহাও তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী; মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহী ইঁহারাই এস্থলে পিতৃগণের অন্তর্গত। ইঁহাদের মধ্যে যদি কেহ কৃতশ্রাদ্ধ পিণ্ড হইয়া সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে বাদ দিয়া সেই পক্ষের উচ্চতর আর এক পুরুষের পূজা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান আরও বলিয়াছেন :—

“প্রাচ্যামৃষীন্ যজেদ্দেবান্ দক্ষিণস্যাং পিতৄন্ যজেৎ।
মাতামহান্ প্রতীচ্যান্তু পূজয়েন্ন্যাসকর্ম্মণি ॥”

সন্ন্যাস-গ্রহণ-সময়ে পূর্ব্বদিকে দেবতা ও ঋষিগণের অর্চ্চনা করিতে হয়, দক্ষিণ দিকে পিতৃ-পক্ষের এবং পশ্চিম দিকে মাতামহ-পক্ষের পূজা ও প্রার্থনা করিতে হইবে। পূর্ব্বদিক হইতে দক্ষিণ

ও পশ্চিম পর্য্যন্ত যথাক্রমে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক দুইটী করিয়া আসন স্থাপনা করিয়া সন্ন্যাসাভিলাষী সাধক মধ্যস্থলে উপবেশন করিবেন। সাধারণতঃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে যেমন "কলার পেটো" ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ আসনের ব্যবহারই অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দুইটী আসনের এক একটীতে পূর্ব্বোক্ত দেবতা, ঋষি ও পিতৃদিগকে একে একে আহ্বানপূর্ব্বক যথাবিধি পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও দীপ সহযোগে যথাবিধি তাঁহাদের বাহ্য-পূজা সমাপন করিতে হইবে। তৎপরে অবশিষ্ট অন্য অন্য আসনে তত্তদ্ দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের যথাক্রমে পিণ্ডদান করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, সাধক পূর্ব্বাহ্নে আতপ তণ্ডুল, গব্যঘৃত, দুগ্ধ, শর্করা, মধু ও দধি সংযোগে পবিত্র চরু অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। এক্ষণে পিণ্ডদানের বিধানানুসারে তাঁহাদের প্রত্যেকের নামাদির উল্লেখ করিয়া যথাক্রমে এক একটী পিণ্ড প্রদান করিবেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিবেন :—

"তৃপ্যধ্বং পিতরো দেবা দেবর্ষিমাতৃকাগণাঃ।
গুণাতীতপদে যুয়মনৃণীকুরুতাচিরাৎ।"

হে পিতৃগণ, হে দেবগণ, হে দেবর্ষি প্রভৃতি ঋষিগণ আপনারা সকলে তৃপ্ত হউন, আমি গুণাতীত পদে গমন করিতেছি, আপনারা অচিরে আমাকে আপনাদের স্ব স্ব ঋণ হইতে মুক্ত করুন। এই বাক্যে তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্ব্বক ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া আত্ম-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন।

আত্মশ্রাদ্ধ-উপলক্ষে শাস্ত্রাদেশ আছে যে, আমিই সকলের আত্ম-স্বরূপ, অর্থাৎ পিতৃ-পিতামহগণ, ঋষিগণ ও দেবতাবৃন্দ

আত্মশ্রাদ্ধ। হইতে এই আত্মা ভিন্ন নহেন, অতএব পরমা-ত্মায় আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আত্মশ্রাদ্ধ উপলক্ষে আত্মস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের প্রত্যেক-কেই পূর্ব্ববৎ পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে স্বতন্ত্র কুশ বিস্তার করিয়া তাহার উপর যথাক্রমে পিণ্ডদান করিতে হইবে। অনন্তর উত্তরাভিমুখে বসিয়া কুশ বিস্তার পূর্ব্বক আত্মকুল, গোত্র ও নামাদির যথাবিধি উল্লেখসহ মুমুক্ষু ব্যক্তি শ্রীগুরুর প্রদর্শিত বিধানানুসারে পিণ্ডদানাদি শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিবেন। সন্ন্যাস-পদ্ধতির মধ্যে এই শ্রাদ্ধবিধান বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

কোন কোন পদ্ধতিতে নিম্নলিখিতভাবে অষ্ট-শ্রাদ্ধের বিধি আছে। ১ম দেবতাশ্রাদ্ধে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ, ২য় ঋষিশ্রাদ্ধে দেবতাত্রয়ং ব্রহ্মর্ষি, বিষ্ণুঋষি, রুদ্রঋষি; ৩য় দেবশ্রাদ্ধে দেবতাত্রয়ং বসু-রুদ্রাদিত্য; ৪র্থ মনুষ্যশ্রাদ্ধে দেবতাত্রয়ং সনক সনন্দন সনৎকুমারাঃ; ৫ম ভূতশ্রাদ্ধে দেবতাত্রয়ং পৃথিব্যাদিভূতেভ্যঃ; ৬ষ্ঠ পিতৃশ্রাদ্ধে দেবতাত্রয়ং পিতৃ পিতামহ, প্রপিতামহ; ৭ম মাতৃশ্রাদ্ধে দেবতাত্রয়ং মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ; ৮ম আত্মশ্রাদ্ধে দেবতাত্রয়ং ওঁ আত্মপিতুঃ ওঁ আত্মপ্রপিতুঃ, ওঁ আত্মবৃদ্ধপ্রপিতুঃ। ইয়ং ভূমিরিয়ংগয়া ইদমুদকং ফল্গুতীর্থস্য পিণ্ডঃ প্রেতশিলাং গচ্ছেৎ। ইত্যাদি।

শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে সাধক নিম্নলিখিত ত্র্যম্বক মন্ত্র

ত্র্যম্বকমন্ত্রোপাসনা। একশতবার একাগ্রভাবে মন্ত্ররহস্য চিন্তা-সহযোগে জপ করিবেন।

"ও ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।

উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মা মৃতাৎ॥

যিনি সুগন্ধ অর্থাৎ যাঁহার কীর্ত্তি বা চৈতন্যশক্তি চতুর্দ্দিকে ব্যাপকভাবে বিস্তারিত রহিয়াছে, যিনি পুষ্টিবর্দ্ধন বা জগতের বীজস্বরূপ অথবা যিনি উপাসকদিগের দেহ-মনাদি সমস্ত বিষয়েরই পরিবর্দ্ধন করেন, আমি সেই শব্দব্রহ্ম প্রণবস্বরূপ ত্র্যম্বকের (ত্রি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রেরও অম্বক অর্থাৎ পিতা বা পরম পুরুষের) উপাসনা করিতেছি। উর্ব্বারুক অর্থাৎ কর্কোটী ফল (পক্ব কাঁকুড় বা ফুটী) যেমন আপনি ফাটিয়া বা বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ ভাবে যে পর্য্যন্ত আমার অবিদ্যা বা অজ্ঞান-মায়া বিশ্লিষ্ট না হয় অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য অবস্থা না হয়, সেই পর্য্যন্ত তিনি আমাকে সংসারবন্ধন ও জনন-মরণ হইতে মুক্ত করুন। অর্থাৎ আত্মরূপী ঘটস্থ তিনিই এই মায়াময় ঘট বা জীবরূপ বন্ধন হইতে স্বয়ং বিমুক্ত হউন। এইরূপ চিন্তাসহ একাগ্র হইয়া একশতবার জপ করিবেন।

অনন্তর গুরু স্বয়ং বা গুরুর আজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন উপযুক্ত সাধু শিষ্য বেদীতে মণ্ডল রচনা করিয়া তদুপরি ঘটস্থাপনা করিবেন ও উপাস্য দেবতা ভেদে অর্থাৎ সৎ, চিৎ, শক্তি, ধী অথবা তেজোরূপ যে সগুণ ব্রহ্ম-ধারা ধরিয়া সন্ন্যাসাভিলাষী শিষ্য নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় উপস্থিত হইয়াছেন, যথাবিহিত-পদ্ধতি অনুসারে যথাক্রমে সেই ঘটে তাঁহাদের পূজা করিবেন। সাধারণ দীক্ষা হইতে শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, ক্রমদীক্ষা, সাম্রাজ্য, মহাসাম্রাজ্য এবং যোগদীক্ষান্তর্গত স্থূল ও সূক্ষ্ম-ধ্যান, পরে পূর্ণদীক্ষায় উপদিষ্ট সূক্ষ্মতর ধ্যান এবং পরিশেষে মহাপূর্ণদীক্ষা প্রাপ্ত নির্গুণ পরব্রহ্মের ধ্যান সহযোগে সেই ঘটেই শ্রীসদাশিব-নির্ণীত বিধান-ক্রমে সকলের অর্চ্চনা করিবেন।

ব্রহ্মার্চ্চনা।

পরব্রহ্মের ধ্যান সম্বন্ধে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—

দশশতকমলস্থং নির্ব্বিশেষং নিরীহং।
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্ ॥
জনন-মরণ-ভীতি-ভ্রংশি-সচ্চিৎ-স্বরূপং
সকল-ভুবন-বীজং ব্রহ্ম-চৈতন্য মীড়ে ॥”

যিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ বিবর্জ্জিত, যিনি নিরীহ অর্থাৎ সকল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি সুতরাং কামনাদি রহিত, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর কর্ত্তৃক জ্ঞেয়, যিনি যোগিগণের ধ্যানলভ্য, যাহাকে ধ্যান করিলে জন্ম ও মৃত্যুর ভয় বিদূরিত হয়, যিনি সৎ ও চিৎ স্বরূপ অর্থাৎ নিত্য ও জ্ঞান-স্বরূপ বা ওতপ্রোতজড়িত পরাপ্রকৃতি ও পরমপুরুষের স্বরূপ এবং যিনি নিখিল ভুবনের একমাত্র কারণস্বরূপ, সেই চিন্ময় পরব্রহ্মকে আমি দশশতকমল বা সহস্রারস্থিত ব্রহ্মস্থানেই ধ্যান করি।

শ্রীসদাশিব কুলার্ণব তন্ত্রে সগুণ ব্রহ্মার্চ্চনার বিষয়ে নিম্নলিখিত-রূপ ধ্যান বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

“বিন্দু রূপং পরং ব্রহ্ম সহস্র-দল-সংস্থিতম্।
সর্ব্বমন্ত্রময়ং সর্ব্ব দেবতাময়রূপিণম্ ॥
কোটী সূর্য্য প্রতিকাশং চন্দ্র কোটী সুশীতলম্।
কর্ণিকান্তস্ত্রিকোণান্তর্মণ্ডলত্রয় মণ্ডিতম্।
গুণাতীতং গুণৈর্যুক্তং সৃষ্টি স্থিতি লয়াত্মকম্ ॥
সর্ব্বকামপ্রদং ধ্যায়েৎ কুলকুণ্ডলিনীযুতম্ ॥”

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম বা সগুণ বিন্দু-ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া স্বাধিকার অনুসারে মানস পূজাদি সম্পন্ন করিবেন।

"শঙ্খ আদি" মহর্ষিগণ তত্তৎকৃত সংহিতা শাস্ত্রে উপদেশ করিয়াছেন :—

কৃত্বেষ্টিং বিধিবৎ পশ্চাৎ সর্ব্ববেদ সদক্ষিণম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য দ্বিজো ব্রহ্মাশ্রমী ভবেৎ ॥

দ্বিজগণ পূর্ব্বাশ্রমের সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিয়া বা ব্রহ্মার্পণং করিয়া বিধি-বোধিতরূপে যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মাশ্রমী হইবে। অতএব সন্ন্যাসাভিলাষী সাধক নিম্নলিখিতভাবে যথারীতি বহ্নি-স্থাপনপূর্ব্বক বিরজা ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুসারে সাধক স্বীয় দক্ষিণভাগে বালুকা দ্বারা চারিদিকে এক হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিয়া "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিবে এবং 'ফট্' মন্ত্র বলিয়া কুশদ্বারা তাড়না করিবে ও প্রোক্ষিত হইলে পর 'হুঁ' মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রাদ্বারা অবগুণ্ঠিত করিবে।

বিরজাবহ্নি স্থাপন।

"ওঁ সচ্চিদেক ব্রহ্মাগ্নিদেবতা স্থণ্ডিলায় নমঃ।" এই মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প দ্বারা স্থণ্ডিলের পূজা করিবে। অনন্তর স্থণ্ডিল মধ্যে প্রাদেশ পরিমাণ অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী বিস্তার করিয়া একের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ পরিমিত কুশদ্বারা স্থণ্ডিলের উত্তর ভাগ পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনটী প্রাগাগ্র রেখা এবং পূর্ব্বভাগে দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর পর্য্যন্ত দীর্ঘ তিনটী উদগাগ্ররেখা অঙ্কিত করিয়া তদুপরি নিম্নলিখিত দেবতার পূজা করিবে।

প্রাগাগ্র রেখাত্রয়ের উপরি "ওঁ এতে গন্ধ পুষ্পে মুকুন্দায় নম," এই ভাবে ক্রমান্বয়ে মুকুন্দ, ঈশ, পুরন্দরের এবং উদগাগ্র রেখা

দ্বারা যথাক্রমে ব্রহ্মা, বৈবস্বৎ ও ইন্দুর পূজা করিবে। পরে উক্ত স্থণ্ডিল মধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল রচনা করিয়া তাহার গর্ভে ওঁ এই প্রণব বীজ লিখিবে। ত্রিকোণ মণ্ডলের বহির্ভাগে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তদ্বহিঃপ্রদেশে অষ্টদলপদ্ম এবং তাহারও বাহিরে চতুষ্কোণ ভূপুর অঙ্কিত করিবে। "ওঁ ব্রহ্মাগ্নৌ" এই মন্ত্র পাঠ সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থণ্ডিলের পূজা করিয়া প্রণবমন্ত্রে হোমদ্রব্যাদি প্রোক্ষিত করিবে। অনন্তর অষ্টদলপদ্মের কর্ণিকায় "ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধ পুষ্পে আধার শক্ত্যাদিভ্যোঃ নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে।

যন্ত্রের অগ্নিকোণে ধর্ম্মের, নৈঋতে জ্ঞানের, বায়ুতে বৈরাগ্যের, ও ঈশানে ঐশ্বর্য্যের, পূর্ব্বদিকে অধর্ম্মের, দক্ষিণদিকে অজ্ঞানের, পশ্চিমে অবৈরাগ্যের ও উত্তরদিকে অনৈশ্বর্য্যের পূজা করিবে।

অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ বলিয়া যন্ত্র মধ্যে কলাসহিত সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিবে।

তাহার পর পূর্ব্বে "ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীতায়ৈ নমঃ" অগ্নি-কোণে "ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্বেতায়ৈ নমঃ, এইরূপে ওঁ এতে গন্ধ-পুষ্পে" ও পরে "নমঃ" শব্দ বলিয়া ক্রমান্বয়ে দক্ষিণে "অরুণায়ৈ" নৈঋতে "কৃষ্ণায়ৈ" পশ্চিমে "ধূম্রায়ৈ" বায়ুকোণে "তীব্রায়ৈ", উত্তরে "স্ফুলিঙ্গিন্যৈ" ঈশানকোণে "রুধিরায়ৈ" এবং মধ্যে "জ্বালিন্যৈ"এর পূজা করিবে। অনন্তর নীলেন্দীবর-লোচনা ঋতুস্নাতা বাগীশ্বরী ব্রহ্মার সহিত সংযুক্তা রহিয়াছেন এইরূপ ধ্যান করিয়া তাঁহার পূজা করিবে। বাগীশ্বরীর ধ্যান যথা :—

"ওঁ বাগীশ্বরী মৃতুস্নাতাং নীলেন্দিবরসন্নিভাং।
বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমন্বিতাং ॥"

ধ্যানান্তে বহ্নি পীঠে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাগীশ্বরায় নমঃ।" এই মন্ত্রে তাঁহাদের পূজা করিতে হইবে।

এইবার নূতন শরাব অথবা তাম্রপাত্রে অগ্নি আনয়ন করিয়া কিম্বা দীপশিখার উপর কুশ ও তৃণ দ্বারা প্রথমে অগ্নি উৎপাদন করিতে হইবে। সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে অন্য এক গুচ্ছ কুশ-তৃণ সহযোগে দ্বিতীয় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে, তাহা হইতে পুনরায় আর এক গুচ্ছ কুশ সহযোগে তৃতীয় অগ্নি অনন্তর সেই তৃতীয় অগ্নি হইতে শেষ অন্য এক গুচ্ছ কুশ উত্তপ্ত করিয়া যে পরিশোধিত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে, তাহাতেই "ওঁ" মন্ত্রে অগ্নি-বীক্ষণ এবং ফট্‌মন্ত্রে অগ্নির আবাহন করিতে হইবে। কোন কোন মঠে সূর্য্যকান্তমণি বা আতসীকাচ সহযোগে সূর্য্যের কিরণ-জাল কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহা হইতেই অগ্নি উৎপাদন করিবার বিধি আছে। তাহাও অতি পবিত্র দৈবাগ্নি।

অনন্তর "ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ" মন্ত্রে মণ্ডলমধ্যে বহ্নিপীঠের পূজা করিয়া পূর্ব্ব হইতে ক্রমান্বয়ে তাহার চতুর্দ্দিকে, পূর্ব্বে "ওঁ বামায়ৈ নমঃ" দক্ষিণে "ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ", এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। পরে "ওঁ ব্রহ্মাগ্নি দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ", মন্ত্রে স্থণ্ডিল পূজা করণান্তর "রং" উচ্চারণ করিয়া সেই পরিশোধিত অগ্নিকে উদ্ধৃত করিবার এবং তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অগ্নি লইয়া "ওঁ হুঁ ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা" মন্ত্রে নৈঋতকোণে ঐ রাক্ষসদিগের দেয় অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তদনন্তর "ফট্" বলিয়া অগ্নি নিরীক্ষণ

পূর্ব্বক হূঁ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রাদ্বারা অগ্নি বেষ্টন করিবেন। ধেনু মুদ্রা সহযোগে অমৃতীকরণ পূর্ব্বক হস্তদ্বয় দ্বারা সেই পরিশোধিত অগ্নি উত্তোলন করিয়া স্থণ্ডিলের উপরিভাগে তিনবার প্রদক্ষিণ করাইবেন। সাধক এইবার জানুদ্বয় ভূমিতলে সংলগ্ন করিয়া ঐ অগ্নিকে ব্রহ্মবীর্য্য-স্বরূপ চিন্তা করিয়া স্থণ্ডিলের সম্মুখে বা পশ্চিমদিকে ত্রিকোণ-মণ্ডল যন্ত্রের উপর নিক্ষেপ করিবেন। পরে "রং বহ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া বহ্নিমূর্ত্তির, "ওঁ রং চৈতন্যায় নমঃ" মন্ত্রে বহ্নি-চৈতন্যের পূজাপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার সময় "ওঁ চিৎ পিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাপয় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিবেন ও জ্বালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। তাহার পর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিতরূপে অগ্নির বন্দনা করিবেন।

"অগ্নিং প্রজ্জ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ব্বতোমুখম্॥"

অর্থাৎ আমি সুবর্ণ কান্তিবিশিষ্ট নির্ম্মল ও প্রদীপ্ত এবং সর্ব্বতো-মুখ, জাতবেদ হুতাশন অগ্নির বন্দনা করিতেছি। "ওঁ অগ্নেত্বম্ ব্রহ্মনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিবেন ও আবাহন-মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে অগ্নির আবাহন করিবেন।

"ওঁ ব্রহ্মাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিরুদ্ধোভব ইহসন্নিরুদ্ধোভব ইহসম্মুখীভব ইহ-সম্মুখীভব মম পূজাং গৃহাণ।" "ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা।" "এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীমদ্-ব্রহ্মাগ্নয়ে নমঃ।" এইবার হিরণ্যাদি সপ্ত জিহ্বার পূজা করিতে হইবে। মন্ত্র যথা :—

"ওঁ বহ্নেঃর্হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ॥"

হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বার নাম যথা ঃ—

১। হিরণ্যা, ২। কণকা, ৩। রক্তা, ৪। সুকৃষ্ণা, ৫। সুপ্রভা ৬। বহুরূপা, ৭। অতিরিক্তা। সাধক ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবেও বহ্নির এই সপ্তজিহ্বার অর্চ্চনা করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ১। কালী, ২। করালী, ৩। মনোজবা, ৪। সুলোহিতা, ৫। ধুম্র-বর্ণা, ৬। উগ্রা, ৭। প্রদীপ্তা কৃপীটযোনি নামক অগ্নির সপ্তজিহ্বার নাম তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে।

হৃদয়াদি অগ্নির ষড়ঙ্গের পূজায় "ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ স্বস্তি পূর্ণায় শিরসে স্বাহা, ওঁ উত্তিষ্ঠ পুরুষায় শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ধূমব্যাপিনে কবচায় হুঁ, ওঁ সপ্তজিহ্বায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ধনুর্দ্ধরায় অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে পূজা করিবেন। সংক্ষেপে করিতে হইলে "ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদ্যগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ" বলিয়া একেবারেই পুজা হইতে পারে।

পরে বহ্নির জাতবেদ প্রভৃতি অষ্টমূর্ত্তির নিম্নলিখিতভাবে পূর্ব্বাদি ঈশান পর্য্যন্ত অষ্টদলে পূজা করিতে হইবে। ১। (পূর্ব্বে) ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ। ২। (অগ্নিকোণে) ওঁ অগ্নয়ে সপ্ত-জিহ্বায় নমঃ। ৩। (দক্ষিণে) ওঁ অগ্নয়ে হব্যবাহনায় নমঃ। ৪। (নৈঋতে) ওঁ অগ্নয়ে অশ্বোদরজায় নমঃ। ৫। (পশ্চিমে) ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় নমঃ। ৬। (বায়ুকোণে) ওঁ অগ্নয়ে কৌমারতেজসে নমঃ। ৭। (উত্তরে) ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ। ৮। (ঈশান কোণে) ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ।" অথবা, "এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ" বলিয়া সংক্ষেপে পূজাও হইতে পারে।

তৎপরে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট শক্তি, পদ্মাদি অষ্টনিধি, ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিবেন।

অষ্টশক্তি যথা :—ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা, কৌমারী, অপরাজিতা, বারাহী ও নারসিংহী। ইঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ পূজা হইতে পারে অথবা সংক্ষেপে "ওঁ ব্রাহ্মীত্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে পূজাও হইতে পারে।

এইভাবে পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কুর্ম্ম, মুকুন্দ, নীল, নন্দ, ও শঙ্খ এই অষ্ট নিধির পৃথক্ পৃথক্ পূজা অথবা সংক্ষেপ পূজা যথা :— "ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ।" এই মন্ত্রে হইতে পারে। ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পাল যথা :—

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋ্ম‌তি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশ, অনন্ত ও ব্রহ্মা; ইহাদেরও হয় পৃথক্ পৃথক, না হয় সংক্ষেপে পূজা যথা :— "ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ।" দিকপালগণের বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের "ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা হইবে।

অনন্তর প্রাদেশ পরিমিত কুশ-পত্রদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতের উপর এরূপভাবে স্থাপন করিবে, যাহাতে ঐ পাত্রস্থ ঘৃত দুইটী কুশরূপ রেখা দ্বারা সমান তিনভাগে বিভক্ত হয়। সেই তিন-ভাগে বিভক্ত ঘৃত বামভাগ ইড়া, দক্ষিণভাগ পিঙ্গলা এবং মধ্যভাগ সুষুম্নারূপ ধ্যান করিয়া সমাহিত চিত্তে দক্ষিণ বা পিঙ্গলা ভাগ হইতে ঘৃত লইয়া অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে দুইটী আহুতি প্রদান করিবেন।

এস্থলে অগ্নির নেত্রাদি অঙ্গে হোম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। শাস্ত্রে উক্ত আছে :—

"কর্ণ হোমে ভবেদ্ব্যাধির্নেত্রেঽন্ধত্বং সমীরিতম্।
নাসিকায়াং মনঃপীড়া মস্তকে ধনসংক্ষয়ঃ॥
যতঃ কাষ্ঠং ততঃ শ্রোত্রং যতোধূমোঽত্র নাসিকা।
যত্রাল্পজ্বলনং নেত্রং যতোঽঙ্গারস্ততঃ শিরঃ।
যত্র প্রজ্বলিতা জ্বালা সাজিহ্বা জাতবেদসঃ॥"

অর্থাৎ হোমকুণ্ডস্থিত প্রজ্বলিত কাষ্ঠগুলি অগ্নির কর্ণ, ধূমাংশময় স্থান অগ্নির নাসিকা, যেস্থানে অগ্নি অল্প মাত্র প্রজ্বলিত, সেই স্থান চক্ষু, যেস্থানে অঙ্গার, তাহাই অগ্নির মস্তক এবং যেস্থানে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা বিদ্যমান থাকে তাহাই অগ্নির মুখমণ্ডল। ইহা জ্ঞাত না হইয়া হোম করিলে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। অগ্নির কর্ণ-হোম করিলে ব্যাধি, নেত্র-হোম করিলে অন্ধতা, নাসিকায় হোম করিলে মনঃপীড়া, মস্তকে হোম করিলে ধনক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব অগ্নির জিহ্বায় হোম করাই সর্ব্বথা বিধেয়। হোম কর্ত্তার এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

যাহা হউক এইবার সেই ঘৃতপাত্রের বামভাগ ইড়া অংশ হইতে ঘৃত লইয়া "ওঁ সোমায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির বাম নেত্রে বা অগ্নিকুণ্ডের বামদিকস্থিত সামান্য প্রজ্বলিত অংশে একটা আহুতি দিবেন। পরে অগ্নির মধ্য বা সুষুম্না ভাগ হইতে ঘৃত উদ্ধৃত করিয়া অগ্নির ললাট নেত্রে বা সম্মুখস্থ অল্প প্রজ্বলিত অংশে "ওঁ অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা" মন্ত্রে একটী আহুতি দিবেন। তাহার পর "ওঁ নমঃ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া পুনর্ব্বার ঘৃতপাত্রের দক্ষিণ অংশ হইতে ঘৃত লইয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" বলিয়া অগ্নি মুখে বা জিহ্বায় অর্থাৎ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় আহুতি প্রদান করিবেন।

এইবার ব্যাহৃতি হোম করিতে হইবে যথা :—

"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা।" মহাব্যাহৃতি হোম যথা :—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ মহঃ স্বাহা, ওঁ জনঃ স্বাহা, ওঁ তপঃ স্বাহা, ওঁ সত্যং স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবস্বমহর্জনতপসত্যংস্বাহা।"

ব্যাহৃতি ও মহা-ব্যাহৃতি হোম।

অনন্তর প্রাণ হোমের সময় প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর হোম করিতে হইবে। দেহ আত্মায় অধ্যাস বিনিবৃত্তির নিমিত্ত পৃথ্যাদি পঞ্চভূত, গন্ধাদি পঞ্চগুণ, বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই দেহজ সমুদায় কার্য্য বা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের হোম করিতে হইবে।

প্রাণাদি ও তত্ত্বহোম।

স্থূল বা সূক্ষ্মদেহই আত্মা, এইরূপ সংস্কার শাস্ত্রে দেহাত্মাধ্যাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দেহের উপাদানরূপ উক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও দৈহিক ক্রিয়াসমূহের আহুতি প্রদান করিলেই দেহের নাশ হেতু দেহাত্মাধ্যাসেরও নিরাস বা নিবৃত্তি হয়। তখন কেবলমাত্র এক আত্মা-স্বরূপে অবস্থিতিরূপ সন্ন্যাস হইল। সেই কারণ নিম্ন-লিখিত মন্ত্রে উক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও সমুদায় দৈহিক কর্ম্ম প্রভৃতি অগ্নিতে একে একে হোম করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করিতে হইবে যেন আমি ক্রমেই ক্রিয়াহীন হইয়া যাইতেছি, আমার এক এক তত্ত্ব আহুতির সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে, যেন আমার পরিত্যক্ত শবরূপ দেহও এইভাবে ক্রমে ভস্মীভূত হইতেছে। সাধক এইরূপ চিন্তায় তন্ময় হইয়া হোম কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

তত্ত্ব হোম জন্য প্রথম আহুতি যথা :—

১। "ওঁ প্রাণাপান ব্যানোদানসমানানি এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্
হ্রীং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।"

ইহার অর্থ এই যে, আমার প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু শোধিত অর্থাৎ উন্মুলিত হউক, আমি হ্রীং অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্যস্বরূপ, জ্যোতিস্বরূপ বা রজোগুণাতীত হই, অতএব অবিদ্যারূপ মলিনতা বিনির্ম্মুক্ত হইবার জন্য এই পঞ্চ-প্রাণকে একে একে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছি।

এইরূপ দ্বিতীয় অন্যান্য আহুতি যথা :—

২। "ওঁ পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশানি এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্
হ্রীং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।"

৩। "ওঁ গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দা এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাং
হ্রীং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।"

৪। "ওঁ বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থা এতানি মে শুদ্ধন্তাম্
হ্রীং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।"

৫। "ওঁ শ্রোত্রত্বঙ্‌নয়নজিহ্বা ঘ্রাণানি এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাং
হ্রীং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।"

৬। "ওঁ মনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারানি এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাং
হ্রীং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।"

৭। "ওঁ দেহস্তাঃ ক্রিয়া সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণ কর্ম্মাণি
যানিচ এতানি শুদ্ধ্যন্তাং হ্রীং জ্যোতিরহং বিরজা
বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।"

এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও সমুদায় দৈহিক কর্ম্ম প্রভৃতি অগ্নিতে হোম করিয়া আপনি নিস্ক্রিয় বা কর্ম্মবিরহিত হইয়া আপনাকে মৃতবৎ ভাবনা করিবেন ও পরব্রহ্ম স্মরণ করিতে থাকিবেন।

অনন্তর যজ্ঞসূত্র ও শিখাহুতির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। দেশে এক প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, "পৈতে নিয়ে ব্রহ্মচারী আর পৈতে পুড়িয়ে সন্ন্যাসী।" আজ সাধকের সেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সাধক তদ্গত ভাবে ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে "ওঁ ঐঁ ক্লীং হুং" মন্ত্রে গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র উন্মোচন করিবেন। পরে সূত্র করমধ্যে ঘৃতসিক্ত করিয়া ধারণ করিবেন ও প্রার্থনা করিবেন :—

যজ্ঞসূত্র ও শিখাহুতি।

"ওঁ ব্রহ্মসূত্র নমস্তেঽস্তু নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে।
নবদেবস্বরূপায় নবগুণযুতায় চ॥
ত্রিদণ্ডিরূপিণে তুভ্যং নমোনিত্যস্বরূপিণে।
ত্রিধাভূতায় নবভিঃ সূত্রৈস্তুভ্যং নমোনমঃ।
রক্ষিতবাংশ্চ মাং নিত্যং স্কন্ধদেশে বিরাজিত।
নিরন্তরং ত্বয়া চাহং চালিতো ব্রহ্মবর্ত্মনি॥
সময়াহূয়তে বহ্নৌ সমিদ্ধে মন্ত্রসংস্কৃতে।
ময়ি প্রসন্নো ব্রহ্মাগ্নৌ প্রবিশ ত্বং যথাবিধি॥
সন্ন্যাসাশ্রমমাস্থায় পরং পদমবাপ্নুয়াম্।
গুণাতীত পদং লব্ধা ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াম্॥"

হে ব্রহ্মস্বরূপ নবদেবতাযুক্ত নবগুণ সমন্বিত ও নবসূত্রে ত্রিধাভূত ত্রিদণ্ডিরূপী ব্রহ্মসূত্র, এতদিন আমার স্কন্ধে বিরাজিত থাকিয়া তুমি আমায় সর্ব্ববিষয়ে রক্ষা করিয়াছ, আমায় ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারে অগ্রসর করিয়াছ। আজ আমি গুণাতীত পদরূপ ব্রহ্মে লীন হইবার জন্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতেছি, অতএব তোমায় নমস্কার করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মাগ্নিতে প্রবিষ্ট হও।

এই বলিয়া 'ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা" মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন।

অনন্তর শ্রীগুরুদেব অথবা তদাজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন সন্ন্যাসী সাধক "ক্লীং" এই মন্ত্র উচ্চারণ সহ সন্ন্যাসার্থির শিখা ছেদন করিয়া তাহার হস্তে প্রদান করিবেন। তখন তিনি ঘৃতমধ্যে সেই শিখা নিমজ্জিত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

"ব্রহ্মপুত্রি শিখে ত্বং হি বাণীরূপা সনাতনী।
দীয়তে পাবকে স্থানং গচ্ছ দেবি নমোঽস্তু তে ॥"

হে ব্রহ্মপুত্রি শিখে, তুমি বাণীরূপা সনাতনী, তোমাকে পাবকে স্থান দান করিতেছি; হে দেবি, এক্ষণে তুমি গমন কর; অর্থাৎ ব্রহ্মাগ্নিতে বিলীন হও, আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি। এই বলিয়া সেই ঘৃতসিক্ত শিখাকে নমস্কার করিবেন ও সুসংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন।

এই সময় কোন মতে নিম্নলিখিত পূর্ণাহুতি মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি আছে।

"ওঁ ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহ ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তাবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যদুক্তং যৎস্মৃতং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীমদ্‌ব্রহ্মাগ্নৌ সমর্পতে।"

শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন এই শিখা ও যজ্ঞসূত্র আশ্রয় করিয়াই পিতৃগণ, দেবগণ ও দেবর্ষি আদি ঋষিগণ সকল আশ্রমের কার্য্যসমূহে অবস্থান করেন, অতএব দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণাদি সকলকেই সন্তর্পিত করিয়া বিরজা যজ্ঞে শিখা ও যজ্ঞসূত্র হোম করিলে সাধক ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন:—

"যজ্ঞসূত্রশিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসঃ স্যাদ্দ্বিজন্মনাম্।"

দ্বিজগণ শিখা ও যজ্ঞসূত্ররূপ বর্ণ চিহ্ন উক্তভাবে ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন।

আরুণেয়োপনিষদাদির মতে কোন কোন মঠে প্রচলন আছে যে, ঃ—

"উপবীতং শিখাং ভূমাবপ্সু বা বিসৃজেৎ॥"

অর্থাৎ শিখা ও উপবীতকে শুদ্ধ জলে, তদপ্রাপ্তিতে শুদ্ধ ভূমিতে এবং শুদ্ধ জললাভে সেই শুদ্ধ জলে "ওঁ ভূঃ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। হয় অগ্নি না হয় জল, এ বিষয় গুরুপরম্পরা-প্রচলিত বিধানই সর্ব্বত্র গ্রহণীয়।

শূদ্র ও অন্যান্য সামান্য জাতীয়গণ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সাধন-সমন্বিত হইয়া যথাবিধি শিখা-হোম করিলেই সাধু বা অবধুতাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন।

অনন্তর শিখাসূত্র হোমকৃত সাধক শ্রীগুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। গুরুদেব তখন সেই নবীন সন্ন্যাসীকে যুগলকরে উত্থাপন করিয়া দক্ষিণ কর্ণে নিম্নলিখিতরূপ সন্ন্যাস মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন। মত ভেদে এই মন্ত্রের সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তিত বিধান আছে।

অন্তিম দীক্ষা ও সর্ব্বত্যাগানুষ্ঠান।

"তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর॥"

হে মহাপ্রাজ্ঞ "তত্ত্বমসি" * অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম, তুমি আপনাকে "হংসঃ" ও "সোঽহং" এরূপ চিন্তা কর এবং স্বভাবে

* তত্ত্বমসি আদি মহাবাক্যরহস্য দেখ।

অর্থাৎ আত্মভাবে বা ব্রহ্মভাবে তদ্গত হইয়া সুখে বিচরণ কর।

তাহার পর সন্ন্যাসী সেই ব্রহ্মঘট ও অগ্নি বিসর্জ্জন করিবেন। সংহার-মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক "অগ্নে ক্ষমস্ব" এই মন্ত্র বলিবেন। আর তিনি অগ্নি স্পর্শ করিবেন না অর্থাৎ তাঁহার দেহ আর অগ্নিদ্বারা সংস্কৃত হইবে না। তিনি স্বয়ং আর অগ্নির আবাহন করিয়া কোন হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন না। এই কারণ অনেক স্থলে আহার প্রস্তুতের জন্যও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার ব্যবস্থা নাই। তাহাও যে নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠান! সুতরাং তাহাও আর সন্ন্যাসীর আপন হস্তে করিবার প্রয়োজন নাই। এখন হইতে রাজযোগ-নির্দ্দিষ্ট সন্ন্যাসোচিত প্রকৃত হবন বা আত্মযজ্ঞই জ্ঞানীর একমাত্র অবলম্বনীয়। তাই "জ্ঞানসঙ্কলিনী"তে শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"নহোমং হোম ইত্যাহুঃ সমাধৌ তত্তু ভূয়তে।
ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণো হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে॥"

সাধক সেই ব্রহ্মচর্য্যাধিকার বা পূর্ণাভিষেকের সময় হইতেই শ্রীগুরুর উপদেশক্রমে নিত্যাহুতির অনুষ্ঠান মাত্র করিয়া আসিতেছেন, এইবার প্রকৃত ব্রহ্মযজ্ঞানুষ্ঠানরূপ তাঁহারই নিত্য আহার-বিহার শয়ন উপবেশন সর্ব্ব কর্ম্মেই অহরহঃ অনুভব করুন :—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥"

যাহাহউক এইবার সাধকপ্রবর পুনরায় গুরুদেবকে প্রণাম করিলে, ব্রহ্মজ্ঞ-গুরু শিষ্যকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তিনিও যুক্তকরে অবনত মস্তকে নিম্নলিখিত মন্ত্র-পাঠসহ শিষ্যকে যথাবিধি প্রণাম করিবেন।

"নমস্তুভ্যং নমোমহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
ত্বমেব তদহমেব বিশ্বরূপং নমোঽস্তু তে॥"

অর্থাৎ তোমাকে নমস্কার আমাকেও নমস্কার, তোমাকে ও আমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। হে বিশ্বরূপ, তুমি সেই তৎপদ-বাচ্য পরমব্রহ্ম, সেই পরব্রহ্মই তুমি, অতএব তোমাকে পুনরায় নমস্কার করি।

শ্রীগুরুদেব তাঁহার অধিকার অনুসারে শিষ্যকে এই ভাবে নমস্কার করিলেও গুরু শিষ্যের চিরবন্দনীয়। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

গুরুর্ব্রহ্ম স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যোমুমুক্ষুভিঃ।
নোদ্‌বেজনায় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা॥
যাবদায়ুস্তাবদ্ বন্দ্যো বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ।
ভাবাঽদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াঽদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ॥"

গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, মোক্ষাভিলাষীদিগের সেবনীয় ও বন্দনীয়, কৃতজ্ঞ ও আত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী জন কখন তাঁহার উদ্বেগ জন্মাইবে না। যে পর্য্যন্ত আয়ু বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত বেদান্তবাক্য, গুরু ও ঈশ্বর এই তিনই বন্দনীয় জানিবে। কর্ম্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা বন্দনা করিবে। শ্রুতির ইহাই স্থির-সিদ্ধান্ত। সর্ব্বদা অদ্বৈত ভাব অবলম্বন করিবেন, ক্রিয়া সম্বন্ধে অদ্বৈত ভাব থাকিবে না। তিন লোকেই অদ্বৈত ভাব করিবেন, কিন্তু শ্রীগুরুর সহিত শিষ্য অদ্বৈত ভাব করিবেন না। সুতরাং শিষ্য পুনঃ পুনঃ গুরুদেবকে প্রণাম করিবেন। এ অবস্থায় গুরুদেবও অবশ্য শিষ্যের প্রণাম গ্রহণ করিবেন না। তিনি প্রতিপ্রণাম

প্রদর্শন করিবেন। তাই সাধারণ ভাবে এক প্রবচন প্রচলিত আছে যে,—

"এ বড় বিষম ঠাঁই গুরু শিষ্য ভেদ নাই।"

তবে শিষ্য যখন প্রকৃত এমন অবস্থায় উপনীত হইবেন যে, তাঁহার লৌকিক বা বহির্জ্ঞান আদৌ থাকিবে না, অর্থাৎ পূর্ণ সমাধিস্থ হইবেন, তখন বাস্তবিক কে বা গুরু কে বা শিষ্য! তখন ভাবাতীত অবস্থায় আপনা আপনি সমস্তই 'শিবোহং' ভাবে একাকার হইয়া যাইবে।

"ন শত্রুঃ ন মিত্রং গুরু নৈব শিষ্য
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।"

এই কারণেই গুরুদেবের কোনও ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বা বানপ্রস্থাবলম্বী শিষ্য থাকিলে, তাঁহারা উক্ত চতুর্থাশ্রম প্রাপ্ত কোনও সন্ন্যাসী শিষ্যকে আর গুরু ভাই বা দাদা বলিয়া পূর্ব্বভাবে সম্বোধন করেন না। শাস্ত্রেও এরূপ সম্বন্ধযুক্ত সম্বোধন নিষিদ্ধ আছে। যিনি মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও সংসারের সকল আত্মীয়কে ত্যাগ করিয়া বা ভুলিয়া আপনার পূর্ব্ব আশ্রম-সুলভ চিহ্ন ও ধর্ম্মাদি এমন কি নাম,গোত্র ও পরিচ্ছদাদি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া যথাবিধি আত্মশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সম্পন্ন করণান্তর গুণাতীত পদে যাইতেছেন, তাঁহাকে আর পূর্ব্বভাবে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সন্ন্যাস-আশ্রমের বিঘ্ন উৎপাদন করা যেমন শাস্ত্র নিষিদ্ধ, তেমনি পূর্ব্বাশ্রমীয়গণের স্বস্ব আত্মোন্নতিরও তাহা বিঘ্নকর। ইহাতে তাঁহাদের গার্হস্থ্যাদি আশ্রম-ধর্ম্মের হানি হইয়া থাকে। ফলে তাহাদের বৃথা পাপ-সঞ্চয় হয়। অতএব সন্ন্যাসীর পুর্ব্বাশ্রমের ব্যবহারিক তুচ্ছ পরিচয় প্রদান করাও কোন পূর্ব্ব পরিচিতের

কর্ত্তব্য নহে। তখন সেই সন্ন্যাসীকে সম্বোধন সূচক, স্বামীজী, গুরুর সম্মুখে কেবল গুরুর সহিত ভিন্নতা বোধক ছোট-স্বামীজী মহারাজ বা ছোট-মহারাজ, পরিব্রাজক মহাশয়, প্রভু, বাবাজী, বাবা অথবা সম্মানের সহিত তাঁহার সন্ন্যাস-আশ্রমের নামই যেমন "রামানন্দজী" বা "রামানন্দ মহারাজ" বা "ভাস্করানন্দজী"রূপে সম্বোধন করা হইয়া থাকে। খৃষ্টান পাদরীদের মধ্যেও "ব্রাদার" ও "ফাদার" সম্বোধন শব্দ বোধ হয় কতকটা এই ভাবেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গৃহস্থ পাদরীদের "ফাদার"বলে। ফলকথা এ সময় সন্ন্যাস-আশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের সাংসারিক ও লৌকিক সকল সম্বন্ধই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন তিনি গুরুশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন।

যাহাহউক সন্ন্যাস গ্রহণের সহিত শিষ্য তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ * করিবেন, তাহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। এ অবস্থায় নিজ পরিধেয়বস্ত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তিনি নগ্ন ভাবেই গুরুদেবের দিকে পৃষ্ঠ করিয়া চলিয়া যাইবেন। শ্রীগুরু শিষ্যের এই ভাব দেখিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিবেন :—

---

* যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও অনেক সাধু পূর্ব্বগৌরব সূচক তুচ্ছ উপাধি পুচ্ছটী পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ইহা যে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ চিত্তদৌর্ব্বল্যের লক্ষণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাস্তবিক সাধু-সন্ন্যাসি-সূচক আনন্দযুক্ত নামের পশ্চাতে বি-এ, এম-এ, ইত্যাদি টাইটেল্ অতি বিসদৃশ বোধ হয়। প্রকৃত সাধু অবস্থায় উহা যে অতি তুচ্ছ, তাহা যথার্থ সাধু না হইলে, কেহ বুঝিতে পারেন না। বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দজী প্রভৃতি অনেকে তাহা বুঝিয়াই উহার স্মৃতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন (ভক্তেরাও সেই কারণ তাঁহাদের নামের পিছনে উহা জুড়িয়া তাঁহাদিগকে বিকৃত করিয়া

"তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাবাহো মাং ত্যক্ত্বা ন হি গচ্ছতু।
শিষ্য পরমহংসস্ত্বং ত্বৎসমো নাস্তি ভূতলে॥
ত্বমেব জগতাং বন্ধু স্ত্বমেব সর্ব্ব পুজিতঃ।
ত্বমেব পরমোহংস স্তিষ্ঠ তিষ্ঠতু মাব্রজ॥"

হে মহাবাহো, দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও না। হে শিষ্য তুমি পরমহংস, তোমার তুল্য আর কেহ ভূতলে নাই, তুমিই জগতের বন্ধু, তুমি সর্ব্বলোকের পূজিত তুমি পরমহংস, অতএব তিষ্ঠ তিষ্ঠ, তুমি চলিয়া যাইও না। অনন্তর শিষ্য শ্রীগুরুর আজ্ঞায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার প্রতি ব্রহ্মমন্ত্রের ফুৎকার দিয়া তাঁহাতে পুনঃ প্রাণযোগ করিয়া দিবেন ও বলিবেন—"তোমার জন্মান্তরের এই মৃতদেহেই প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিয়া সামাবর্ত্ত করিয়া দিতেছি। তুমি ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্ক অন্ন গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচিন্তনসহ প্রারব্ধকাল ক্ষয় জন্য জীবন্মুক্তভাবে ভূতলে বিচরণ কর। সর্ব্বদা তাঁহাতে তন্ময় থাকিয়া বিশ্বের কল্যাণ বিধান কর। মানস-ভোগও যত্নসহকারে পরিত্যাগ কর। ষড়্‌বর্গ

দেন নাই,) কিন্তু আজকাল অনেক নবীন, অনভিজ্ঞ সাধু এইরূপ আচরণে আত্মাভিমান-পুষ্টির সহিত যে একটী লৌকিক নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যও করিয়া ফেলিতেছেন, তাহাও তাঁহারা ভাবিতে পারেন কি? কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে এইরূপ আচরণের ফলে তাঁহাদের প্রতি হয় ত কোনরূপ দণ্ড বিধানও করিতে পারেন: কারণ সরকারী কাগজ পত্রে অনুসন্ধান করিলে উক্ত বি-এ এম-এ, ডিগ্রিধারীদিগের তালিকা মধ্যে কোথাও কোনও আনন্দযুক্ত নাম পরিদৃষ্ট হইবে না। অতএব লোকতঃ ধর্ম্মতঃ ইহা যে অতি অসাধু কর্ম্ম, ইহা স্মরণ করিয়া যেন তাঁহাদের শ্রদ্ধেয় সাধু গুরুজনের নামের পশ্চাতে উক্তরূপ উপাধি সংযোগ না করেন।

জয় করিয়া তুমি এখন নর-নারায়ণ বা শিবস্বরূপ হইয়াছ। দণ্ডধারণ বা সন্ন্যাস-গ্রহণ-মাত্রেই তুমি নিঃসন্দেহ জীব শিব বা নর-নারায়ণ হইয়াছ। তোমার পিতৃবংশে সপ্তদশ পুরুষ, মাতৃবংশে ত্রয়োদশ পুরুষ এবং কান্তারও পিতৃবংশে সপ্তপুরুষ আজ লক্ষ্মী-নারায়ণ বা হরগৌরী স্বরূপ হইলেন।"*

"কুলং পবিত্রং জননীকৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতীচ তেন।
অপারসম্বিত্ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পর ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—যিনি পরব্রহ্মে চিত্ত লীন করিবার জন্য সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার কুল পবিত্র হইল, জননী কৃতার্থা হইলেন এবং তাঁহার প্রভাবে বসুন্ধরাও পুণ্যবতী হইলেন। অতএব হে নবীন-সন্ন্যাসী তুমিও আজ ধন্য হইলে, এক্ষণে তুমি বহু শিষ্য-সেবক-পরিবৃত দণ্ডী ও পরমহংসদিগের মধ্যে বা তত্ত্বজ্ঞানী গৃহস্থের নিকট যাইয়া ভিক্ষায় জীবন ধারণ কর। তোমাকে লোকালয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, অতএব এই কৌপীন গ্রহণ কর ও আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি নিকটবর্ত্তী সাধু গৃহস্থগণের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়াই হউক, অথবা তাঁহাদের

---

* শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে :—

"ত্রিংশৎপরাং স্ত্রিংশদ্‌বরাং স্ত্রিংশচ্চপরতঃ পরান্।
সদ্য সন্ন্যাসনাদেব নরকাৎ ত্রায়তে পিতৃন্।"
"কুলানাঞ্চ শতং পূর্ব্বমপরঞ্চ শত ত্রয়ম।
এতৎ স্যাৎ সুকৃতে লোকে সন্ন্যাস্তস্য কুলেঃস্থিষৎ॥"

সন্ন্যাসগ্রহণ মাত্রেই সন্ন্যাসীর পরবর্ত্তী ষট্‌পুরুষ এবং পুর্ব্ববর্ত্তী ত্রিশ পুরুষের নরক হইতে উদ্ধারকর পুণ্যলাভ হয়। সন্ন্যস্ত ব্যক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী শতকুল এবং পরবর্ত্তী তিনশত কুলের স্বর্গ লাভ হয়।

নিকট উপস্থিত হইয়া উপস্থিত ঋণগ্রহণ করিয়াই হউক শীতাতপ নিবারণোপযোগী ও সমাজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য বহির্ব্বাস এবং প্রয়োজন মত বস্ত্রাদি গ্রহণ কর।

শিষ্য তখন সমাগত সাধুব্যক্তিদিগের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুদেবের হস্তে তাহা অর্পণ করিবেন। গুরুদেব তাহা কাঞ্চন মূল্যরূপে পাইয়া বস্ত্রাদি কিছু কিছু ব্যবহারোপযোগী বস্তুর সংগ্রহ করিয়া বা তাহার অধিকার দিবেন।

এই সময় শিষ্যের ধন ও অধিকার অনুসারে গুরুদেব কাহাকেও দণ্ড কমণ্ডলু বা কেবলই কমণ্ডলু গ্রহণের অধিকার দিয়া থাকেন, তাঁহারা শিখা ছেদনের সঙ্গে সঙ্গে মস্তক মুণ্ডন করিয়া দণ্ডী বা সন্ন্যাসীরূপে চলিয়া যান।

সন্ন্যাস গ্রহণ।

আবার কাহাকেও দণ্ড গ্রহণাধিকার দিয়াও তাহা ব্যবহার করিবার আজ্ঞা না দিয়া গুপ্তাবধূতরূপে সংসারের মধ্যেই থাকিয়া কোন কোন বিশেষ কর্ত্তব্য সাধনে নিয়োজিত করেন।

কলিতে দণ্ডধারণের নিষেধ ও বিধি।

দণ্ডধারণ ক্রিয়া কলিকালে এক প্রকার নিষিদ্ধ বলিয়াই বিভিন্ন শাস্ত্রের আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত আছে :—

"কলৌচ দণ্ডগ্রহণং নৈব নির্ব্বাণকারণম্।
পরং বেদবিরুদ্ধঞ্চ বিপরীতায় কল্প্যতে॥"

অর্থাৎ কলিকালে দণ্ডগ্রহণ নির্ব্বাণের কারণ হইতে পারে না।*

* অনেক গুরু-সম্প্রদায় কাশী কাঞ্চি ও মায়া আদি কাল-প্রভাব-বর্জ্জিত সপ্ত মুক্তি-তীর্থে দণ্ড গ্রহণের অধিকার আছে বলিয়া দণ্ড গ্রহণের আজ্ঞা প্রদান করেন।

শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"ভৈক্ষকেঽপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তং দণ্ডধারণম্।

কলৌ নাস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞে যত স্তৎ শ্রৌতসংস্কৃতিঃ॥"

হে দেবি! তুমি তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্না; অতএব বুঝিতেই পারিতেছ যে, কলিযুগে ভিক্ষুক বা সন্ন্যাস-আশ্রমে বেদোক্ত দণ্ড-ধারণের বিধি নাই. কারণ তাঁহা যে সম্পূর্ণ বৈদিক সংস্কার।

পুরাণ শাস্ত্রমধ্যেও কথিত আছে :—

"দেবরেণ স্থতোৎপত্তি র্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।

ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ ন চ কমণ্ডলুঃ॥"

অর্থাৎ কলিকালে দেবর কর্ত্তৃক ভ্রাতৃজায়ার গর্ভে পুত্রোৎপাদন, বিবাহিতা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ, যজ্ঞে গোবধ এবং সন্ন্যাসাশ্রমে দণ্ড-কমণ্ডলুধারণ নিষিদ্ধ।

এই সকল কারণে বহু পরমহংস সন্ন্যাসী দণ্ড-ধারণের বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের অভিমত—কলিকালে দণ্ডের যথাযথ মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে না। বোধ হয় এই হেতু কোন কোন মঠের আচার্য্য, বৈদিক বিধানানুসারে শিষ্যকে দণ্ড প্রদান করিয়াও দ্বাদশ বর্ষের পরিবর্ত্তে এক বৎসর বা দ্বাদশ মাস, তদভাবে দ্বাদশ দিবস অন্ততঃ পক্ষে ত্রিরাত্রি অথবা সদ্য সদ্য ত্রিদণ্ড কালের মধ্যেই তাহা বিসর্জ্জন করাইয়া দেন। অধুনা যজ্ঞোপবীত সংস্কারের সময়েও বোধ হয় এই কারণেই দ্বাদশ বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সহিত গুরু বা আচার্য্য-গৃহে অবস্থানের পরিবর্ত্তে দ্বাদশ দিবস, ত্রিরাত্রি, পঞ্চরাত্রি অথবা সদ্য সদ্যই কাশী, কালীঘাট কিম্বা কোন মহাপীঠে সেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম-সুলভ গৃহীতদণ্ড বিসর্জ্জিত হইয়া থাকে। শ্রীসদাশিব পূর্ব্ব হইতেই সুস্পষ্ট ভাবে উপদেশ দিয়াছেন যে—

"পুরৈব কথিতস্তাবৎ কলিসম্ভবচেষ্টিতাম।
তপঃ স্বাধ্যায় হীনানাংনৃণামল্লায়ুষামপি॥
ক্লেশপ্রয়াসশক্তানাং কুতো দেহ পরিশ্রমঃ।
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি সন্ন্যাসশ্চাঽপি ন প্রিয়ে॥

হে প্রিয়ে! পূর্ব্বেই আমি তোমায় কলিসম্ভূত মানবগণের কার্য্য ও ব্যবহার বিষয়ে কীর্ত্তন করিয়াছি। তাহারা তপোবর্জ্জিত, বেদপাঠবিরত ও স্বল্লায়ু হইবে; তাহারা দুর্ব্বলতা বশতঃ তাদৃশ ক্লেশ ও পরিশ্রম সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং তাহাদের বৈদিক আচারের সুকঠিন পরিশ্রমসাধ্য বিধান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? হে প্রিয়ে, এই জন্য কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই, সন্ন্যাস আশ্রমও নাই।

বাস্তবিক বৈদিক বিধানমত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পালন করা যেমন কঠিন, সেইরূপ বৈদিক-বিধি-বিহিত দণ্ডী-সন্ন্যাসীরূপে আচার রক্ষা করাও অতীব দুষ্কর। তাহা প্রকৃত সন্ন্যাসীমাত্রেই অন্তরে অন্তরে বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। এই সকল হেতু-বিধায় সর্ব্বজ্ঞ শ্রীসদাশিব কলিকালে সন্ন্যাসীর দণ্ড ধারণ বিধানে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। আবার কেহ সমর্থ হইলে তাহাকে দ্বাদশ বর্ষ মাত্র দণ্ড ধারণ করিয়া পরে বিসর্জ্জন করিবার বিধানও নির্ব্বাণাদি তন্ত্রান্তরে প্রদান করিয়াছেন। যথা—

"গৈরিকং কৌপীনং বস্ত্রং যত্নেন পরিধাপয়েৎ।
দণ্ডধারণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ॥

সাধক সন্ন্যাসাবস্থায় গৈরিক ও কৌপীন বস্ত্র পরিধান করিয়া দণ্ড ধারণ করিলেই নর নারায়ণ হইয়া থাকেন। তাহার পরই পুনরায় বলিয়াছেন :—

"দ্বাদশাব্দস্য মধ্যেচ যদি মৃত্যুর্নজায়তে।
দণ্ডং তোয়ে বিনিক্ষিপ্য ভবেৎ পরমহংসকঃ ॥

অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যদি দণ্ডী-স্বামীর মৃত্যু না হয়, তবে সেই দণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়া পরমহংস অবস্থা গ্রহণ করিবে। শ্রীগুরুদেব ইচ্ছা করিয়া দ্বাদশ বৎসরের পরিবর্ত্তে ত্রিরাত্রি বা দ্বাদশ দণ্ডের পরেই যাঁহাদের দণ্ড বিসর্জ্জন করাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা প্রথম হইতেই পরব্রহ্মময় হইয়া তৎচিন্তায় পরমানন্দে অবধূতাচাররত পরমহংসাশ্রমী হইয়া থাকেন।

"নির্ণয়সিন্ধুতে" উক্ত আছে :—

পরমহংসস্যৈক দণ্ড এব সোহপ্যবিদুষঃ।
বিদুষাস্তু সোহপি নাস্তি।"

জ্ঞানকৃশ পরমহংসেরাই একটী দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন, জ্ঞানপুষ্ট পরমহংসের তাহাও থাকেনা। পরমহংস উপনিষদে আছে যে :—

"জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ মনের বিক্ষেপনিমিত্ত যিনি জ্ঞানদণ্ড বা ব্রহ্মদণ্ড ধারণ করেন, তিনি একদণ্ডী, পরমহংস সন্ন্যাসী। বৈদিক বা তান্ত্রিক উভয় বিধানানুসারে দ্বাদশাব্দমাত্র দণ্ড-ধারণ-রীতি থাকিলেও আজকাল অনেকেই শঙ্করাদেশ বলিয়া আজীবন দণ্ডধারণ করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে দণ্ডধারণ সন্ন্যাসাবস্থার এক প্রাথমিক

---

*ব্রহ্মদণ্ডরূপ একদণ্ড জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের অন্তরে অনুভাব্য বিষয়। তাহাই সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট প্রণবরূপ দণ্ড, পরমহংসবৃন্দের মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত বিস্তৃত সরল বংশদণ্ডের অনুরূপ সপ্তগ্রন্থি বিশিষ্ট জ্ঞানদণ্ড বা ব্রহ্মদণ্ড।

সপ্তাঙ্গ "প্রণব রহস্য" দেখ।

চিহ্ন মাত্র। যতক্ষণ চিত্ত বিধি-নিষেধের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে, ততক্ষণই সন্ন্যাসীর দণ্ডধারণ রীতি। ইহাকেই ভগবান শঙ্করাচার্য্যদেব "বিবিদিষা" সন্ন্যাস বিধান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু "বিদ্বৎ" সন্ন্যাসীর কোনও লিঙ্গ চিহ্ন থাকে না। ইহা কতকটা প্রাচীন কালের হংসদিগের অনুকরণে কর্ম্ম-কাণ্ডে রত থাকিয়া জাতীয় অভিমান-যুক্ত এক সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা মাত্র। পরমহংস অবস্থার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহু সাধকের পূর্ব্বানুষ্ঠিত সগুণ ব্রহ্মোপাসনালব্ধ শাক্ত-বৈষ্ণবাদির লৌকিক ভেদ-ভাব বিদ্যমান থাকে, সেই কারণ তাঁহারা পরম শান্তিময় অদ্বৈত-ভাবের অনুকূল সকল বিধি-নিষেধ বর্জ্জন করা সহসা সঙ্গত মনে করেন না। আবার কেহ কেহ এই দণ্ড ধারণকে পরম পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যদেবের প্রবর্ত্তিত সনাতন বিজয় পতাকা বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন। অধুনা দশনামী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী ও অর্দ্ধাংশ ভারতী নামা সন্ন্যাসীগণ দণ্ড ধারণে বিশেষ পক্ষপাতী। শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসীদিগের চিহ্ন ত্রিদণ্ডের অনুরূপ। ইহাঁরাও যজ্ঞসূত্র-জড়িত একটী বংশ-দণ্ড সাম্প্রদায়িক লিঙ্গরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাও বৈদিক-দণ্ড হইতে বিভিন্ন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কলিকালে দণ্ড ধারণ শিবাজ্ঞায় নিষিদ্ধ। উপনিষদোক্ত বৈদিক দণ্ডধারণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "আরুণেয়োপনিষদে" দণ্ডধারণ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"সখাসি মা গোপায় ওজঃ সখাসি ইন্দ্রস্য বজ্র॥"

হে দণ্ড, মি আমার সখা, আমাকে গোসর্পাদি হইতে রক্ষা

কর। (টীকাকার বলিয়াছেন, মা মাং গোসর্পাদিভ্যো গোপায় ইতি।) দণ্ডধারণান্তে দণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন, তুমি শরীর-শক্তিরূপ মদীয় সখা, আমাকে গোসর্পাদি হইতে পরিত্রাণ কর। তুমি দেবশক্তি-রূপ সখা এবং ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় শত্রুভয় বিনাশক, তুমি আমার পাপ সকল বিনাশ কর। এই প্রকারে বারত্রয় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বেণব দণ্ডের উপরিভাগ দক্ষিণ করে স্থাপন করিবেন।

বর্ত্তমান প্রচলিত দণ্ডোপরি মহাকালীর মানসীপূজার নিম্ন-লিখিত শিবোক্ত ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

"অদ্যাবধি মহামায়াং দণ্ডোপরি বিভাবয়।
কুরু পূজাং মহাকাল্যা দণ্ডোপরি হৃদাততঃ॥"

যাহাহউক পূর্ব্বকথিত বিধানানুসারে দ্বাদশ অব্দ অতীত হইলে হংস অবস্থা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ দণ্ড বিসর্জ্জন করিয়া পরমহংস অবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন। অথবা প্রথম হইতেই দণ্ড ত্যাগ করিলেও অবধূতাচারে দ্বাদশাব্দ অতিক্রম করি-বার পর সাধকশ্রেষ্ঠ পরমহংস-সরস্বতী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পরমহংস সরস্বতী

শ্রীভগবান সদাশিব বলিয়াছেন :—

"অবধূতাচাররতঃ হংসঃ পরমপূর্ব্বকঃ।
সৈব সানন্দ বিখ্যাত দ্বাদশাব্দে সরস্বতী॥"

এই স্থলে বলা বাহুল্য যে, এই "পরমহংস সরস্বতী" দশনামী সম্প্রদায়-নির্দ্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক উপাধি নহে। ইহা সকল পরম-হংসেরই পরিণতাবস্থার পরিচায়ক নামান্তর মাত্র। ইহা দশনামী সম্প্রদায় গঠনের বহু পূর্ব্ব হইতেই শিব-প্রোক্ত বিধানে সর্ব্ব-

*দণ্ড ও দণ্ডী সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা পরে "দণ্ডী-রহস্যে" দেখুন।

জন পরিচিত পরমহংসের অন্তিম অবস্থার পরিচায়ক বিধানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এক্ষণে সাধারণ ভাবে সন্ন্যাসাশ্রমের লক্ষণ, ভেদ ও অধিকার-বিধি বিষয়ে বর্ণন করিব। গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল

সন্ন্যাসির আচার ও অধিকার।

ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্ত ও সংকল্প-বিকল্প-বর্জ্জিত হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে বিরজান্তে গৈরিক-রঞ্জিত কৌপীনাচ্ছাদন ও দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণাদি সহ মুণ্ডিত-মুণ্ড বা জটা-মুকুট-সমন্বিত অথবা পঞ্চকেশী ভাবে যিনি ভিক্ষাদ্বারা জীবন রক্ষা করেন ও নির্জ্জনে বা তীর্থে বাস করিয়া সদা ব্রহ্মচিন্তায় কালাতিপাত করেন, তিনিই সন্ন্যাসী। শ্রীসদাশিব সন্ন্যাসাশ্রমীদিগের উপদেশক্রমে আজ্ঞা করিয়াছেন :—

"ততো নির্দ্বন্দ্বরূপোঽসৌ নিষ্কামঃ স্থিরমানসঃ।
বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া শিষ্যঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো ভুবি॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সদ্রূপেন বিভাবয়ন্।
বিস্মরেন্নামরূপাণি ধ্যায়ন্নাত্মানমাত্মনি॥
অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
মুক্তো বিধিনিষেধাভ্যাং নির্য্যোগ-ক্ষেম-আত্মবিৎ।
সুখদুঃখসমো ধীরো জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ॥
সদানন্দঃ শুচিঃ শান্তো নিরপেক্ষো নিরাকুলঃ।
নোদ্বেজকঃ স্যাজ্জীবানাং সদা প্রাণিহিতে রতঃ॥
বিগতামর্ষভীর্দ্দান্তো নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ।
শোকদ্বেষবিমুক্ত স্যাচ্ছত্রৌ মিত্রে সমো ভবেৎ॥
শীতবাতাতপসহঃ সমো মানাপমানয়োঃ।
সম শুভাশুভে তুষ্টো যদৃচ্ছা প্রাপ্তবস্তুনা॥

নিস্ত্রৈগুণ্যো নির্ব্বিকল্পো নির্লোভঃস্যাত্মসঞ্চয়ী ॥”

সন্ন্যাসীর সাধারণ লক্ষণ এই যে, তিনি সুখ-দুঃখাদি-রূপ দ্বন্দ্বরহিত, কামনা পরিশূন্য, স্থিরচিত্ত ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইয়া ভূতলে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিবেন। তিনি আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম দেবতা ব্রহ্মাদি হইতে নিকৃষ্টতম জীব-দৃষ্টির অগোচর উদ্ভিজ্জাণু শৈবাল ও তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় বিশ্ব সৎস্বরূপ ব্রহ্মময় বিবেচনা করিবেন। আপনার নামরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাতে আত্মার অর্থাৎ পরব্রহ্মের ধ্যান করিবেন। তিনি আবাস বা গৃহবিহীন, ক্ষমাশীল, নিঃশঙ্কহৃদয়, সংসর্গবর্জ্জিত, নির্ম্মম ও অহঙ্কারশূন্য সন্ন্যাসী হইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন। তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া লব্ধ-বিষয়ের রক্ষা করিবেন না। তিনি সুখে দুঃখে সমজ্ঞানী, ধীর, জিতেন্দ্রিয় এবং স্পৃহাশূন্য হইয়া আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানে নিরত থাকিবেন। দুঃখ উপস্থিত হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ স্থিরতর থাকিবে, বিচলিত হইবে না এবং সুখের উপস্থিতিতে তিনি তাহাতে স্পৃহা করিবেন না। তিনি সর্ব্বদা আনন্দযুক্ত বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ-সম্পন্ন, শান্ত, নিরপেক্ষ ও নিরাকুল থাকিবেন। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বশ্রেণীর হিতানুষ্ঠানে রত থাকিবেন, কোন প্রকারে কাহারও মনে উদ্বেগ জন্মাইয়া দিবেন না। তিনি ক্রোধরহিত ভয়রহিত ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন। তিনি সংকল্পরহিত, উদ্যম-বিহীন, শোক-দ্বেষ-বর্জ্জিত এবং শত্রু-মিত্র-সমদর্শী হইবেন। তিনি মান ও অপমান উভয়কেই তুল্য জ্ঞান করিবেন। তিনি শীত, বাত ও আতপ প্রভৃতির কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন এবং যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতে পরিতুষ্ট থাকিয়া শুভ হউক অথবা

অশুভ হউক, উভয় বিষয়ই তুল্য জ্ঞান করিবেন ও ত্রিগুণাতীত, নির্ব্বিকল্প, লোভশূন্য ও সঞ্চয়রহিত হইবেন।

শাস্ত্রান্তরে সন্ন্যাসীর সাধারণ কর্ত্তব্য বিষয়ে নির্দ্দেশ আছে :—

"তপস্তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়াতীর্থং ধ্যানং তীর্থ মনুত্তমম্॥
স্নানং মনোমলত্যাগো দানঞ্চাভয় দক্ষিণা।
জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধো ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ পরম্॥
ক্ষমা দয়াচ সন্তোষো ব্রতান্যস্য বিশেষতঃ॥
ন তীর্থ সেবী নিত্যং স্যান্নোপবাসপরো যতিঃ।
ন চাধ্যায়নশীলঃ স্যান্ন ব্যাখ্যান পরোভবেৎ॥
ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্য মেকান্তশীলতা।
যতে শ্চত্বারি কর্ম্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে॥"

তপস্যা, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জীবগণের প্রতি মোক্ষার্থ দয়া এবং ধ্যানাভ্যাসই সন্ন্যাসীর পক্ষে তীর্থ। মনের মলিনতা ত্যাগই তাঁহার স্নান, জীবকুলকে অভয়রূপ আত্মতত্ত্বোপাসনা বা মোক্ষোপদেশই তাঁহার দান, আত্মতত্ত্বোপলব্ধিই তাঁহার জ্ঞান, এবং মনের বিষয়-শূন্যতাই তাঁহার ধ্যান। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, মনঃসংযম, ক্ষমা, দয়া ও সন্তোষই সন্ন্যাসীর বিশেষ ব্রত। সন্ন্যাসী নিয়ত তীর্থ ভ্রমণ বা উপবাস-পরায়ণ হইবেন না এবং সদৈব অধ্যয়নশীল বা ব্যাখ্যানাদি দানে রত হইবেন না। পূর্ব্বোক্তরূপ ধ্যান, শৌচ ও ভিক্ষা এবং একান্তবাস এই চারিটী ব্যতীত সন্ন্যাসীর পক্ষে পঞ্চম বলিয়া কোনও কার্য্য নাই।

"যথা সত্য মুপাশ্রিত্য মৃষা বিশ্বং প্রতিষ্ঠতি।
আত্মাশ্রিত স্তথা দেহো জানন্নেবং সুখী ভবেৎ॥
ইন্দ্রিয়াণ্যেব কুর্ব্বন্তি স্বংস্বং কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্।
আত্মা সাক্ষী বিনির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈতৎ মোক্ষভাগ্‌ভবেৎ॥

যেমন এই বিরাট বিশ্ব-জগৎ মিথ্যাস্বরূপ হইয়াও একমাত্র পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, সেইরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যাভূত এই ক্ষুদ্র জগৎ পিণ্ডস্বরূপ দেহও আত্মবৎ প্রতীত হইতেছে।

সন্ন্যাসী ইহা জানিয়াই সুখী হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়গণ পৃথক্ পৃথক ভাবে আপনার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে,—আত্মা সাক্ষী ও নির্লিপ্ত। অর্থাৎ আত্মা সেই সেই কর্ম্মে আবদ্ধ হয়েন না, যিনি ইহা জানিতে পারেন, তিনিই মোক্ষ-ভাগী প্রকৃতসন্ন্যাসী হইতে পারেন। পূর্ব্বে বৈরাগ্য অংশেও এই কথা বলা হইয়াছে। পাঠকের অবশ্যই তাহা স্মরণ আছে।

"ধাতু প্রতিগ্রহং নিন্দাম্ অনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া।
রেতস্ত্যাগ মসূয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

ধাতুদ্রব্য অর্থাৎ মুদ্রাদি গ্রহণ, পরনিন্দা, মিথ্যাবাক্য ব্যবহার, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া, শুক্রত্যাগ ও অসূয়াদি সন্ন্যাসী পরিবর্জ্জন করিবেন।

"সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃস্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

তিনি দেবতা, মনুষ্য বা কীটে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইবেন এবং সমুদায়কার্য্যেই তাঁহার সর্ব্বদা এরূপ ধারণা থাকিবে যে, ইন্দ্রিয়-গোচর যাহা কিছু বস্তু সমুদায়ই পরব্রহ্মের রূপ, তিনিই পরিব্রাজক।

"অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ ।
অবধূতো নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ ॥"

অবধূত ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইলেও বেদান্ত ও তন্ত্র প্রভৃতি অধ্যাত্ম-শাস্ত্র সদা আলোচনা এবং অধ্যয়ন আদি দ্বারা আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া কালাতিপাত করিবেন। শ্রীসদাশিব সাধারণ ভাবে সকল সন্ন্যাসীর পক্ষেই-এইরূপ লক্ষণসমূহ বর্ণন করিয়াছেন।

"সদন্নেবা কদন্নেবা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনেঽপি বা।
সমবুদ্ধি র্ভবেৎ যস্য স সন্ন্যাসী প্রকীর্ত্তিতঃ।"

যিনি উত্তমান্ন ও নিকৃষ্টান্নে সমজ্ঞান করেন, যিনি মৃত্তিকা খণ্ড বা ঢেলা ও স্বর্ণখণ্ডকে সমজ্ঞান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন।

প্রাথমিক সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীসদাশিব "নিরুত্তরে" বলিয়াছেন—

"দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ॥"

যিনি দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ ও রক্তবস্ত্র পরিধান করেন, যিনি নিত্য প্রবাসী অর্থাৎ এক স্থানে যিনি অবস্থান করেন না, তিনিই সন্ন্যাসী বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

"শুদ্ধাচারদ্বিজান্নঞ্চ ভুঙক্তে লোভাদিবর্জ্জিতঃ।
কিন্তু কিঞ্চিন্ন যাচেত স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ॥"

যিনি শুদ্ধাচারী লোভবর্জ্জিত হইয়া কেবল দ্বিজান্নই ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করেন কিন্তু কিছুই যাচঞা করেন না তিনি সন্ন্যাসী শব্দে প্রকীর্ত্তিত হন।

"শশ্বন্মৌনী ব্রহ্মচারী সম্ভাষালাপবর্জ্জিতঃ।

সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং পশ্যেৎ স সন্ন্যাসী প্রকীর্ত্তিতঃ ॥”

যিনি সতত ব্রহ্মভাবে তন্ময় হইয়া মৌনী হইয়াছেন, যিনি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী, সম্ভাষণ ও আলাপাদি বর্জ্জিত হইয়া সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় উপলব্ধি করেন, তিনিই সন্ন্যাসী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

“সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিশ্চ হিংসামায়াবিবর্জ্জিতঃ।
ক্রোধাহঙ্কাররহিতঃ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ॥”

যিনি সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন, হিংসা মায়াদি বর্জ্জিত, ক্রোধ ও অহঙ্কারশূন্য, তিনিই সন্ন্যাসী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

“অযাচিতোপস্থিতঞ্চ মিষ্টামিষ্টঞ্চ ভুক্তবান্।
ন যাচেত ভক্ষণার্থী স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ॥”

অযাচিতভাবে মিষ্টামিষ্ট যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহাই যিনি পরমানন্দে ভোজন করিয়া তৃপ্ত হন, ভোজনের জন্য যিনি যাচ্ঞা করেন না, তিনিই সন্ন্যাসী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহর্ষি হারিত প্রভৃতি সংহিতাকারগণ সন্ন্যাসীর ভোজনাদিসম্বন্ধে বলিয়াছেন।—

“স্থিত্যর্থ মাত্মনো নিত্যং ভিক্ষাটনমথাচরেৎ।
সায়ংকালে তু বিপ্রাণাং গৃহান্যভ্যবপদ্য তু ॥
সম্যগ্ যাচেচ্চ কবলং দক্ষিণেন করেণ বৈ।
পাত্রং বামকরে স্থাপ্য দক্ষিণেন তু শেষয়েৎ।
যাবতান্নেন তৃপ্তিঃ স্যাত্তাবদ্ভৈক্ষ্যং সমাচরেৎ ॥”

সন্ন্যাসী প্রতি দিবস কেবল আপন প্রাণধারণ করিবার জন্যই ভিক্ষার্থে ভ্রমণ করিতে পারিবেন। সায়ংকালে বিপ্রগৃহে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সম্যক কবল প্রার্থনা করিবেন,

বামকরে পাত্র স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা সংগ্রহ করিবেন। যতগুলি অন্নদ্বারা নিজের তৃপ্তি সম্ভাবনা, তৎপরিমাণ ভিক্ষাই সংগ্রহ করিবেন।

"ততো নিবৃত্য তৎপাত্রং সংস্থাপ্যান্যত্র সংযমী।
চতুর্ভিরঙ্গুলৈঃস্থাপ্য গ্রাসমাত্রং সমাহিতঃ॥
সর্ব্বব্যঞ্জনসংযুক্তং পৃথক্‌পাত্রে নিযোজয়েৎ।
সূর্য্যাদিভূতদেবেভ্যো দত্বা সংপ্রোক্ষ্য বারিণা॥
ভুঞ্জীত পাত্র পুটকে পাত্রে বারভ্যতে যতিঃ।
বটকাশ্বত্থপর্ণেষু কুম্ভীতৈন্দুক পাত্রকে॥
কোবিদার-কদম্বেষু ন ভুঞ্জীয়াৎ কদাচন।
মলাক্তাঃ সর্ব্ব উচ্যন্তে যতয়ঃ কাংস্য-ভোজিনঃ॥
কাংস্য ভাণ্ডেষু যৎপাকো গৃহস্থস্য তথৈব চ।
কাংস্যে ভোজয়তঃ সর্ব্বাং কিল্বিষং প্রাপ্নুয়াত্ততঃ॥
ভুক্তা পাত্রে যতির্নিত্যং ক্ষালয়েদ্ যত্নপূর্ব্বকম্।
ন দুষ্যতে চ তৎপাত্রং যজ্ঞেষু চমসা ইব॥"

তৎপরে সংযমী সেই পাত্র অন্যত্র শুচিদেশে স্থাপন করিয়া সমাহিত চিত্তে চতুরঙ্গুল দ্বারা সর্ব্ব-ব্যঞ্জনযুক্ত গ্রাসমাত্র অন্ন আচ্ছাদন করিয়া পৃথক পাত্রে রাখিবেন। পরে তাহা সূর্য্যাদি ভূত দেবতাগণকে প্রদান করিয়া পাত্রদ্বয়ে বা একপাত্রেই যতি ভোজনারম্ভ করিবেন। বট কিম্বা অশ্বত্থ পত্রে অথবা কুম্ভী ও তিন্দুক নির্ম্মিত পাত্রে যতি কখনই ভোজন করিবেন না। কাংস্য-পাত্রে ভোজনকারী যতিগণ মলাক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হন; এই জন্য কদাচ কাংস্যপাত্রে যতিগণের ভোজন বিহিত নহে। যে ব্যক্তি কাংস্যপাত্রে পাক করে ও যে কাংস্যপাত্রে ভোজন করে, তাহার যে

পাপ হয়, সে সমুদায় পাপ কাংস্যপাত্রে ভোজনকারী যতিরাই প্রাপ্ত হন। যতি ভোজনান্তে নিজ পাত্রদ্বয় যত্ন করিয়া ধৌত করিবেন, সে পাত্র যজ্ঞের চমসের ন্যায় কখনই দূষিত হয় না। শ্রীমন্মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাসীর পাত্র-নির্ণয় ও শুদ্ধি-সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"যতিপাত্রাণি মৃদ্বেণুদার্ব্বলাবুময়ানি চ।
সলিলৈঃ শুদ্ধিরেতেষাং গোবালৈশ্চাবঘর্ষণাৎ॥"

মৃন্ময় বা প্রস্তরাদিময়, বেনুময়, দারুময় ও অলাবু আদির পাত্র যতিগণের ব্যবহার্য্য। গোপুচ্ছলোম ও জলে এই সকল পাত্র পবিত্র হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্ববর্ণিত নিষিদ্ধ পাত্রের পরিবর্ত্তে এইরূপ যে কোন পাত্র সন্ন্যাসীগণ ব্যবহার করিবেন। প্রসঙ্গক্রমে সন্ন্যাসীদিগের ভিক্ষাদান কালে গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা উক্ত আছে, এস্থলে সংক্ষেপে তাহাও কিছু উদ্ধৃত হইতেছে। গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনাদি বিধান কুটীচক সন্ন্যাস-বিধির মধ্যে দ্রষ্টব্য।

পরাশরাদি ঋষিগণ বলিয়াছেন—গৃহস্থগণ সন্ন্যাসীকে ভোজন ভিক্ষা দিবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর হস্তে একগণ্ডূষ জল দিবেন, পরে ভিক্ষাদ্রব্য সমুদায় দিবেন, অনন্তর সন্ন্যাসীর হস্তে পুনরায় আর এক গণ্ডূষ জল দিবেন। এইরূপ করিলে গৃহস্থের ভিক্ষা-দান সার্থক হয়। ভিক্ষা মেরুতুল্য ও জল সাগর তুল্য হয়। সন্ন্যাসীকে যাহা কিছু ভিক্ষা দিতে হইবে, তাহা এক কালেই সমস্ত সাজাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ভিক্ষা অর্থাৎ সন্ন্যাসীর ভোজনের মধ্যে

* এই নিয়মাভ্যাসে সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা গ্রহণ কালে প্রায় চারি অঙ্গুলিতেই গ্রাস উত্থাপন করিয়া থাকেন।

পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া অন্নাদি দিবার ব্যবস্থা নাই। গৃহস্থের পক্ষে এসকল বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আজকাল যেমন জ্ঞান-পুষ্ট ত্যাগী সন্ন্যাসীর অভাব, তেমনি প্রকৃত গৃহস্থও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম অনেকেই প্রায় ভুলিয়া গিযাছেন।

যাহা হউক সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য ও লক্ষণ সম্বন্ধে আরও কিছু যাহা বলিবার বাকী আছে, তাহাই এক্ষণে বলিয়া এই অংশ শেষ করিব।

"নচ পশ্যেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেত্তৎসমীপতঃ।
দারবীমপি যোষাঞ্চ ন স্পৃশেদ্ যঃ স ভিক্ষুকঃ॥"

যিনি স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন করেন না, তাঁহাদের নিকটে অবস্থান করেন না, পত্নী বা বনিতা স্পর্শ পর্য্যন্ত ও করেন না অর্থাৎ যিনি কাম রহিত, তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীপদবাচ্য।

"অয়ং সন্ন্যাসিনাং ধর্ম্ম ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ।
যদা মনসি সম্পন্নং বৈতৃষ্ণং সর্ব্ববস্তুষু।
তদাসন্ন্যাসমিচ্ছেত্তু পতিতঃ স্যাদ্বিপর্য্যয়ে॥"

কমলোদ্ভব সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে বলিয়াছন যে পর্য্যন্ত সাধকের মন সর্ব্বপ্রকার বিষয় ভোগে বিতৃষ্ণা বা পূর্ণ-বৈরাগ্যযুক্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা হইলে পতিত বা পাতকগ্রস্ত হইতে হইবে।

শ্রীসদাশিব স্থানান্তরে তাই বলিয়াছেন:—

"অপ্রাপ্ত যোগ মর্ত্ত্যানাং সদা কামাভিলাষিণাম্।
স্বভাবাজ্জাযতে দেবি প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মসংকুলে॥

অত্রাপি তে সানুরক্তা ধ্যানার্চ্চাজপসাধনে।
শ্রেয়স্তদেব জানন্ত স্তত্রৈব দৃঢ়নিশ্চয়াঃ॥
অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে।
নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া॥
ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কর্ম্মসংন্যসনং বিনা।
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেন্মুক্তিভাজনঃ॥”

হে দেবি, যাহারা প্রকৃত যোগ প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ যাহাদের জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ অনুভব হয় নাই, তাহাদের সর্ব্বদাই ভোগ বিলাসে অভিলাষ হয়, সুতরাং তাহাদের স্বভাবতই কর্ম্ম কাণ্ডে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তি কর্ম্ম-কাণ্ডে অনুরক্ত হইয়া ধ্যান পূজা জপ প্রভৃতি সাধন করিয়া থাকে। তাহারা সেই সেই সাধনেই দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া তাহাই তাহাদের শ্রেয়স্কর বলিয়া জানিবে। এই কারণে আমি সেই সমুদায় অপ্রাপ্ত-যোগ সাধকদিগের চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম-কাণ্ডের নানা বিধান বলিয়াছি এবং এই কারণেই আমি বহুবিধ নাম ও রূপ কল্পনাকরিয়াছি। হে দেবি, যদি কেহ শত শত কল্প পূজা জপ হোম প্রভৃতি কর্ম্ম করে, তথাপি শেষ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে এবং সেই কর্ম্ম-সন্ন্যাস ব্যতিরেকে কদাপি মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। অতএব আশ্রম-নির্দ্দিষ্ট সন্ন্যাসধর্ম্ম সকলেরই অনায়াস-সেব্য নহে। সুতরাং সন্ন্যাসী হওয়া কেবল মুখের কথা নহে। সদাশিব সেই কারণ পুনঃ পুনঃ সাধককে ক্রমোন্নত সাধন পন্থার, এত করিয়া উপদেশ দিয়াছেন।

সন্ন্যাসীর দেহ সমাধি

সন্ন্যাসীর দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইলে, সাধারণ ভাবে দাহ করা কর্ত্তব্য নহে।* শ্রীসদাশিব তদ্বিষয়ে বলিয়াছেন:—

"সন্ন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈ নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ ॥"

সন্ন্যাসীদিগের মৃত দেহ কদাচ দাহ করিবে না, পরন্তু ঐ দেহ গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চন করিয়া (পরিশুদ্ধ) ভূমিতে সমাধি বা নিখাত করিবে। অথবা জলে নিমগ্ন করিয়া দিবে। কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে জল সমাধিরই অধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। সমাধির পূর্ব্বে সেই অর্চ্চিত দেহ লবণ ও মৃত্তিকা সহযোগে কাষ্ঠ বা প্রস্তরাদি নির্ম্মিত কোন আবরণ মধ্যে পুরিয়া ভক্তগণ কর্ত্তৃক শঙ্খ ঘণ্টাদি বিবিধ বাদ্যসহ শোভাযাত্রার বিধিও সর্ব্বত্র দেখা যায়। বিশিষ্ট মহাত্মার স্মৃতি-সম্মানার্থে সমাধিস্তূপ বা মন্দিরও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। মন্দিরাদির মধ্যে শিব প্রতিষ্ঠা বা সমাধিস্থ সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠারও বিধান শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। সকল স্থলেই গুরু-পরম্পরায় শ্রুত বিধানেই কার্য্য হইয়া থাকে।

সন্ন্যাসীর ভেদ

এক্ষণে দেখা যাউক সন্ন্যাসী কত প্রকার। অধুনা নানা শ্রেণীর সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক আধুনিক সন্ন্যাসীদিগের আচার, ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ দেখিলে মনে হয়, ইহাঁরা বুঝি অনন্ত-সংখ্যক শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক সাধুই যেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন, কাহারও সহিত কাহারও মতের প্রায় একতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও শিক্ষারই সম্পূর্ণ অভাব বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ সন্ন্যাসীদিগের বিশেষ কোনও সাধারণ শিক্ষা পাঠ নাই,

---

* নিম্ন অধিকারীর সাধক সাধু হইলে, তাঁহাদের অবস্থা-ভেদে অর্থাৎ কুটীচক, বহূদক, অথবা পরিব্রাজক অবধূত আদির দেহ মৃত্তিকার মধ্যে কখনই সমাধিস্থ করিবে না, তবে সকল সাধুর দেহই জলে সমাধি দেওয়া যায়। হংস পরমহংস অথবা পূর্ণাবধূত অবস্থার সাধুর দেহ ব্যতীত অন্য সকল সাধুর দেহ দাহ করাও যাইতে পারে। এসম্বন্ধে গুরুপরম্পরা প্রচলিত বিধান সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য।

তদ্ব্যতীত শিক্ষিত সমদর্শী যোগ-চতুষ্টয়ের ক্রিয়াভিজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী গুরুরও যথেষ্ট অভাব হইয়াছে। এই হেতুই কেহ কাহাকেও মানিত চাহেন না, সকলেই স্বয়ংসিদ্ধ বা স্ব স্ব প্রধান মতাবলম্বী মহাপুরুষ। ফলে সন্ন্যাস আশ্রমের ঘোর দীনতা ও হীনতা উপস্থিত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলেই যে কেহ গৈরিক বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া লইবেন তাহাতে কাহারও আজ্ঞা বা উপদেশের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না; তাহাতে কেহ বাধা দিবার বা শাসন তিরস্কার করিবারও কেহ নাই। ধর্ম্মান্তর-বিশ্বাসী বা সামান্য বৈষয়িক কর্ম্মচারী শাসক সম্প্রদায়ের তাহাতে লক্ষ্য করা অসম্ভব ও অসঙ্গতও বটে, পক্ষান্তরে আচার্য্যগণও গুরু-পরম্পরায় কালধর্ম্মে বিষম বিষয়-মোহে যেন অন্ধপ্রায়, ফলে তাঁহারা নিষ্প্রভ, শক্তিহীন, ক্রিয়াহীন বা জীবনবিহীন মৃন্ময়-পুত্তলিকা-সদৃশ হইয়া রহিয়াছেন। অতএব স্বেচ্ছাকৃত সন্ন্যাসীর সর্ব্বত্রই নিষ্কণ্টক নির্ব্বিরোধ গতি চলিয়া গিয়াছে। শাস্ত্র, ঋষিবাক্য ও উপদেশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এখন যথেচ্ছাই শাস্ত্র, আচারহীনতাই ধর্ম্ম; সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে ইহাই বিশেষত্বের কারণ বলিয়া অনেকে আবার গর্ব্বও অনুভব করিয়া থাকেন। এখন বর্ণসঙ্কর ও কর্ম্ম-সঙ্কর প্রজা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান-কালোচিত আশ্রম সঙ্করতাও এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, তাহারও গণনা করা দুঃসাধ্য। প্রাচীন কালে সত্য বা বৈদিক যুগে কেবল ব্রহ্মতেজ প্রধান ব্রাহ্মণেরই চতুর্থাশ্রম গ্রহণের বিধি ছিল। সুতরাং তাঁহারাই তখন ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রমের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অন্তে সন্ন্যাসাধিকার গ্রহণ করিতেন।

ইহাই প্রাচীন সাধারণ বিধি ছিল। এখন সে বিধি প্রায়

পরিলক্ষিত হয় না। এই ভাবে ক্ষাত্র-তেজ-প্রধান ক্ষত্রিয়ের বান-প্রস্থ পর্য্যন্ত তিন আশ্রম এবং বিত্ত-তেজ-প্রধান বৈশ্যের পক্ষে গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং শূদ্রের পক্ষে কেবলই গৃহস্থাশ্রম বিধিবদ্ধ ছিল, কিন্তু কর্ম্মসঙ্করতাবশে এখন আর তাহা যথাযথ-ভাবে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং সকল বর্ণের মনুষ্যের মধ্যেই অনেকের পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্মের ফলেই সন্ন্যাসভাবাপন্ন বিভিন্ন প্রকৃতি-যুক্ত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণ কেহ অন্তরে, কেহ বাহিরে, কেহ বা অন্তর-বাহির উভয়ভাবে, আবার কেহ কেবল নামেই সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন, ইতিপূর্ব্বেও তাহা অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে, পাঠকগণের তাহা অবশ্যই স্মরণ আছে।

পরম পূজ্যপাদ সুদূরদর্শী আচার্য্যগণ ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়া এতদ্বিষয়ে বর্ত্তমান সময়োপযোগী আজ্ঞা ও উপদেশ পূর্ব্বাহ্নেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

"কালো দূরত্যয়ঃ প্রোক্তস্তস্মাদুপগতে কলৌ
তৎপ্রভাবাৎ প্রজাঃ সর্ব্বা বর্ণসঙ্করতাংতথা॥
কর্ম্ম সংকরতা চাঽপি প্রায়ো যাস্যন্তি ভূতলে।
ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্তা যে তত্তো বর্ণা কলৌ তদা।
প্রব্রজ্যাং ধারয়িষ্যন্তি নিবৃত্তেরিচ্ছুকাস্তথা।
পরিহারো নাস্তি যস্য কালিকী গতিরীদৃশী॥"

কালের গতি অতীব প্রবল কথিত হইরাছে। যখন কলিকাল সমাগত হইবে, তখন উহার প্রভাবে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রজাই বর্ণসঙ্কর ও কর্ম্মসঙ্কর হইয়া পড়িবে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল বর্ণই তখন নিবৃত্তিমার্গের ইচ্ছুক হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে থাকিবেন। কিছুতেই এই বাক্যের অন্যথা হইবে না। কারণ বর্ত্তমান কালের গতিই এইরূপ।

"যদি কালপ্রভাবেণ ব্রাহ্মণেরতরবর্ণকাঃ।
নিবৃত্তি মভিকাংক্ষেরণ্ তদাপালনতৎপরাঃ॥
কুটীচকস্য ধর্ম্মস্য ভবেয়ুস্তে নিরন্তরম্ ।
তথা বহূদকস্যাহপি ধর্ম্মস্যেতি বিনির্ণয়ঃ॥
ধর্ম্মো হংসস্য পরমহংসস্যাপি ন যুজ্যতে।
অন্যথা পতনং তেষাং ভবতি শাস্ত্রসম্মতম॥"

কলিকালের প্রভাব হেতু ব্রাহ্মণেতর বর্ণ যখন নিবৃত্তির ইচ্ছাসহ নিবৃত্তি ধর্ম্মের পালন করিতে তৎপর হইবেন, তখন তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী অংশে কথিত কুটীচক ও বহূদক ধর্ম্মযুক্ত সন্ন্যাস আশ্রম পালন করা কর্ত্তব্য। বেদাবিহিত হংস ও পরমহংস ধর্ম্ম তাঁহাদিগের যোগ্য নহে। যদি কেহ তাহা-ক রতে অভিলাষ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার পতন হইবে ইহা সনাতন শাস্ত্রেরই অনুশাসন বাক্য জানিবেন। অতএব তাঁহাদের লোকরক্ষাকারী বর্ণ-ধর্ম্মের মর্য্যাদা লক্ষ্য করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

সন্ন্যাসীর ভেদসম্বন্ধে সূত-সংহিতায় উক্ত আছে—

"চতুর্ব্বিধো ভিক্ষুকশ্চ কুটীচকবহূদকৌ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥

ভিক্ষুকাশ্রম চারি প্রকার, যথা—কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস। ইহাদের মধ্যে পরস্পর যথাক্রমে উত্তম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপ সন্ন্যাস-গীতার মধ্যে ও দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"কুটীচকস্তু প্রথমো দ্বিতীয়স্তু বহূদকঃ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ দ্বাবিমাবন্তিমৌ স্মৃতৌ॥

কুটীচক, সন্ন্যাস আশ্রমের প্রথম অবস্থা, বহূদক দ্বিতীয়, হংস তৃতীয় এবং পরমহংস চতুর্থ অবস্থা। ইহাদের মধ্যে শেষের দুইটীই অন্তিম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এক্ষণে কুটীচকাদি সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে পরস্পরের যে কিরূপ পার্থক্য তৎসম্বন্ধে স্থত সংহিতায় উক্ত আছে :—

"কুটীচকশ্চ সন্ন্যাসী স্বে স্বে বেশ্মনি নিত্যশঃ।
ভিক্ষামাদায় ভুঞ্জীত স্ববন্ধূনাং গৃহেঽথবা॥
শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
সপবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥
সর্ব্বাঙ্গোদ্ধূলনং কুর্য্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রঞ্চ ত্রিসন্ধিষু।
শিবলিঙ্গার্চ্চনাং কুর্য্যাৎ শ্রদ্ধয়ৈব দিনে দিনে॥"

কুটীচক সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় গৃহে বা স্ব-বন্ধুগৃহে অবস্থিতি করিবেন এবং ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিবেন। শিখাবিশিষ্ট, যজ্ঞোপবীতযুক্ত, ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলুধারী ও কাষায়-বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শুদ্ধাচারী থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রীজপ করিবেন। ত্রিসন্ধ্যা সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম বিলেপন ও ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন এবং প্রতিদিবস শ্রদ্ধা সহকারে শিব-লিঙ্গের পূজার্চ্চনা করিবেন।

শ্রী সন্ন্যাস গীতায় দেখিতে পাওয়া যায় :—

"সন্ন্যাস দীক্ষামাদায় কামিন্যাদি বিহায় চ।
কুটীচকঃ স সন্ন্যাসী নগরপ্রান্তসীমনি।
চিন্মনোরথেস্থানে কুটীংনির্ম্মায় সংবসেৎ।
যোগোপনিষদধ্যায়ৈঃ কুর্য্যাদাধ্যাত্মিকোন্নতিম্।

যে সাধক পূর্ব্ববর্ণিতরূপে ক্রমোন্নত সাধন পথে অগ্রসর হইয়া

সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিয়া স্ত্রী পুত্রাদি সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোনও নগর প্রান্তে নির্জ্জন মনোহর স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তথায় কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া অবস্থান করেন, যিনি যোগাভ্যাস ও জ্ঞান তন্ত্র উপনিষদাদি অধ্যয়ন দ্বারা আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করেন, তিনিই কুটীচক সন্ন্যাসী।

"কুটীচকস্তু সন্ন্যাসী যোগসাধনসংযমৌ।
অভ্যসেদ্ধি বিশেষেণ পঞ্চ সাকার ব্রহ্মসু॥
কস্মিংশ্চিত্তত্র মনসোরুচিরুপ্রান্তি তস্য বৈ।
তস্মিন্‌রূপে সদাধ্যায়ন্ ব্রহ্মোপাসনমাচরেৎ॥
আত্মীয়কুলজাতীনাং ত্যক্তা সম্বন্ধ মপ্যুত।
শরীরযাত্রাং নির্ব্বোঢ়ুং ধর্ম্মাত্মন্যাত্মজে সতি॥"

কুটীচক সন্ন্যাসীর পক্ষে বিশেষ করিয়া যোগ সাধন ও সংযম অভ্যাস করা বিধেয়। এবং পঞ্চ সাকার ব্রহ্মের বা পঞ্চবিধ সগুণ ব্রহ্মমূর্ত্তির মধ্যে যাহাতে সাধকের ঐকান্তিক রুচি থাকে, সেই রূপেরই সাধনায় বা তাঁহার ধ্যান করিয়া তাহাতেই ব্রহ্মোপাসনা করা কর্ত্তব্য। আত্মীয়, কুল ও জাতি হইতে সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য যদি ধর্ম্মাত্মা পুত্র বা তদ্‌স্থলাভিষিক্ত কেহ থাকে তবে তাহার নিকট হইতে কুটীচক সন্ন্যাসী অন্ন বস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত কুটীচক অবস্থায় প্রতিপাল্য নিয়ম সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরও আদেশ আছে যে, এই আশ্রমে অবস্থানকালে সাধক ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা বা ফলমূল খাইয়াও থাকিতে পারেন। দিবারাত্রির মধ্যে একবারই যথা প্রয়োজন ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। কারণ ভিক্ষায় আসক্তি হইলে পুনর্ব্বার বিষয়ের দিকে লক্ষ্য হইতে পারে। সাত

ঘর ভিক্ষা করিয়াও যদি ভিক্ষা না "জুঠে" তবে আরও দুই ঘর যাইয়া ভিক্ষা করিতে পারেন। নিত্য নূতন পাত্রে ভোজন করিয়া নির্লোভ হইয়া তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এরূপ-স্থলে পাতায় ভোজন করাই যুক্তিযুক্ত, তবে সুপরিষ্কৃত কাংস্য ব্যতীত ধাতুপাত্রেও ভোজন করিয়া তাহা পুনরায় ধুইয়া রাখিতে পারা যায়। ধাতু অপেক্ষা পাথরের পাত্র ব্যবহার করা ভাল। ভিক্ষাকালে সন্ন্যাসী প্রত্যেক গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া কেবল "ভিক্ষা" শব্দ মাত্রই উচ্চারণ পূর্ব্বক মৌনীভাব অবলম্বন করিয়া সতত ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। কৃত-শ্রাদ্ধ-পিণ্ড ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদিগের পক্ষেই ভিক্ষাকালে এইরূপ শব্দমাত্র উচ্চারণ করা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু বিরজা-সংস্কার-বিহীন কেবল সন্ন্যাসাচারী অথবা শিখাসূত্ররূপ পূর্ব্বাশ্রম চিহ্নধারী ব্রহ্মচারী সাধুর পক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভেদে নিম্ন লিখিতরূপ শব্দোচ্চারণে ভিক্ষা প্রার্থনার বিধি আছে।

"আদি মধ্যাবসানেষু ভবচ্ছব্দোপলক্ষিতম্।
ভৈক্ষস্য চরণং প্রোক্তং বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ॥"

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারী ভবৎশব্দ যথাক্রমে আদি, মধ্য ও অন্তে উল্লেখ করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন। অর্থাৎ পুরুষের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে হইলে, ব্রাহ্মণ—ভবান্ ভিক্ষাং দেহি ভবান্, এইরূপ ভাবে বলিবেন। এবং স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা প্রার্থা করিতে হইলে ব্রাহ্মণ—ভবতি ভিক্ষাং ভবতি দেহি, বৈশ্য—ভিক্ষাং দেহি ভবতি, এইরূপ শব্দোচ্চারণে ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে সন্ন্যাসীর পক্ষে তুম্বি, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা

অথবা বাঁশের পাত্রাদিই ব্যবহার করিবার বিধান মনু প্রজাপতি প্রভৃতি স্মৃতিকারদিগের আজ্ঞা। সন্ন্যাসীরা যাঁহার যেমন সুবিধা হইবে তিনি সেইরূপ পাত্রই ব্যবহার করিবেন। পূর্ব্ব-বর্ণিত নিষিদ্ধ পাত্র কেহই যেন ব্যবহার না করেন। যতক্ষণ পূর্ণ-পরমহংসাবস্থা বা জ্ঞান-পরিপুষ্ট-নির্ব্বিকার-ভাব না আইসে, ততক্ষণ শুধু পাত্র বলিয়া নহে, সন্ন্যাসীর সকল বিধানই যথাসাধ্য মানিয়া চলিতে হইবে। তাহার পর বিধি-নিষেধ আপনা আপনিই কোথায় সরিয়া যাইবে—কেহই বুঝিতে পারিবে না।

কুটীচক সন্ন্যাসীরা নিত্য প্রদোষ, পররাত্রি ও মধ্যরাত্রি এবং বিশেষ করিয়া দিবসেও ঈশ্বরচিন্তন করিবেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে এইরূপ বিবিধ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রীগুরুর নিকট বা অভিজ্ঞ সন্ন্যাসীর নিকট তাহা প্রয়োজন মত জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

বহূদক সন্ন্যাসী সম্বন্ধে সূতসংহিতায় বর্ণিত আছে যে ঃ

বহূদক "বহূদকশ্চ সন্ন্যাসী বন্ধুপুত্রাদিবর্জ্জিতঃ।
সপ্তাগারং চরেদভৈক্ষ্যম্ একান্নং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
গোবালরজ্জুসম্বদ্ধং ত্রিদণ্ডং শিক্যমদ্ভুতং।
পাত্রংজল পবিত্রঞ্চং কৌপীনঞ্চ কমণ্ডলুম্॥"

বহূদক সন্ন্যাসীরা বন্ধু-পুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন। ভিক্ষার জন্য অন্ন সাত-গৃহ হইতে পূর্ব্ব-কথিতরূপে সংগ্রহ করিবেন। এক গৃহস্থের অন্ন গ্রহণ করিবেন না। গোপুচ্ছ লোমের রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ত্রিদণ্ড, ঝুলি, পাত্র, জল, পবিত্র, কৌপীন ও কমণ্ডলু ব্যবহার করিবেন।

আচ্ছাদনং তথা কন্থাং পাদুকাংছত্রমেবচ।

পবিত্র মজিনং সূচীং পক্ষিণীমক্ষসূত্রকম্ ॥
যোগপট্টং বহির্বস্ত্রং মৃৎখনিত্রীং কৃপাণিকাম্ ॥"

তাঁহারা গাত্রাচ্ছাদন বস্ত্র, কন্থা, পাদুকা, ছত্র, পবিত্র, মৃগচর্ম্ম, সূচী, পক্ষিণী, অক্ষমালা, যোগপট্ট, বহির্বাস, খনিত্রী ও কৃপাণ এই সমুদায় গ্রহণ করিবেন।

"সর্ব্বাঙ্গোদ্ধূলনং তদ্বৎ ত্রিপুণ্ড্রঞ্চৈব ধারয়েৎ।
শিখী যজ্ঞোপবীতী চ দেবতারাধনে রতঃ ॥
স্বাধ্যায়ী সর্ব্বদা বাচমুৎসৃজেৎধ্যানতৎপরঃ।
সন্ধ্যাকালেষু সাবিত্রীং জপকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥"

সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন এবং ত্রিপুণ্ড্র, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন, বেদাধ্যয়ন ও দেবতারাধনায় রত হইয়া বাক্য পরিত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতার চিন্তায় তৎপর হইবেন। সন্ধ্যা-কালে গায়ত্রী জপ সহকারে স্বধর্ম্মোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিবেন।

শ্রী সন্ন্যাসগীতায় বহূদক সন্ন্যাসী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে—

বহূদকস্তু সন্ন্যাসী ন বসেদধিকং ক্বচিৎ।
দিনত্রয়ং প্রতিস্থানং স্থিত্বাহন্যত্র সুখং ব্রজেৎ ॥
তীর্থাদিকং পরিভ্রম্য যথাবৎ সাধনাদিভিঃ।
আত্মোপলব্ধৌ সততং যতেতায়ং মহামনা।

বহূদক সন্ন্যাসীদিগের কোথাও অধিক দিন থাকা উচিৎ নহে। প্রত্যেক স্থানে সাধারণতঃ তিন দিন থাকিয়া আনন্দের সহিত স্থানান্তরে চলিয়া যাইবেন। এই উদারচেতা সন্ন্যাসীদিগের তীর্থা-দিতে পরিভ্রমণ করিয়া যথাবিধি সাধনাদি দ্বারা আত্মায় আত্মার উপলব্ধি করিবার জন্য সতত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

উদক অর্থে জল এবং বহু অর্থে নানা, অর্থাৎ নানা জল বা নানা-স্থানের জল পান করিয়া সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে সন্ন্যাসী দিনাতিপাত করেন, তিনিই বহূদক সন্ন্যাসী। পূর্ব্ব-বর্ণিত কুটীচক সন্ন্যাসীরাই তিনবৎসর সাধনার পর বহূদক ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যদ্যপি তত্ত্বজ্ঞানে অগ্রসর না হইতে পারেন, তাহা হইলে তিন বৎসর অতিবাহিত হইলেও বহূদক হওয়া বিধেয় নহে। বহূদক ধর্ম্মের সর্ব্ব প্রধান ও বিশিষ্ট লক্ষ্য এই যে, বিশ্বাত্মার সহিত আপনার ঐক্য করিবার বিশেষরূপ যত্ন করা কর্ত্তব্য। জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া পবিত্রভাবের সহিত কেবল নিষ্কাম কর্ম্মের ব্রতে নিরন্তর নিরত থাকা কর্ত্তব্য। যত্ন-পূর্ব্বক ত্যাগ ও তপের পূর্ণতা লাভ করাও এই অবস্থার প্রধান কার্য্য। কোন বস্তুতে কোনরূপে আর যেন আসক্তি না থাকে। কামিনী কাঞ্চনে যদি পূর্ণ বৈরাগ্য না হইয়া থাকে, তবে বহূদক ধর্ম্ম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার জাতিকুল ও বন্ধুগণের সম্বন্ধ-মমতা-সংস্কার যদি হৃদয় হইতে উন্মূলিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এই বহূদক ধর্ম্ম আশ্রয় করা বিধেয় নহে। আত্মায় অবস্থিতি করিবার পূর্ণ ইচ্ছা না হইলে কখনই বহূদকী হইতে নাই।

কুটীচকের জন্য মানস পূজা, দেব-ঋষি ও পিতৃগণের যে অমন্ত্রক পূজার বিধি আছে, তাহা জগৎ-কল্যাণের বুদ্ধিতে মহাযজ্ঞ বিষয়ক জানিতে হইবে। এই সমস্তই ব্রহ্মাণ্ডের সহিত আত্মার ঐক্য-সম্বন্ধ বুদ্ধির জন্য জানিতে হইবে। কিন্তু সঙ্কল্প ও মোহরহিত বহূদকের পক্ষে এরূপ কোনও বিধিনিষেধ না থাকিলেও, আপনার আশ্রম বা আসনে সমাগত ধার্ম্মিকদিগের

প্রতি শিষ্টাচার সহ সৎকার করা কর্ত্তব্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা পালন করিবার জন্য সন্ন্যাসীদিগকেও জগৎকল্যাণের বুদ্ধিতে সতত শিষ্টাচারপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। আসনে সমাগত নিম্নবর্ণের সজ্জন-সাধুকেও মৌখিক নমস্কার অর্থাৎ "নারায়ণ" সম্বোধন করিবার বিধান শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

বহূদক সন্ন্যাসী যদি ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরব্রহ্মের স্থূলমূর্ত্তি-ধ্যানতৃপ্ত হইয়া থাকেন, তবেই জ্যোতির্ধ্যান ও পরে বিন্দুধ্যান করিবেন। ইহাই নির্গুণ ধারণার পরম সহায়ক। অনন্তর গুরু আজ্ঞা-নুসারে যথাবিধি ব্রহ্মধ্যান তৎপর হইবেন। অনেকেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তি আদি ধ্যানের উপলব্ধি না করিয়াই ব্রহ্মধ্যান করিতে তৎপর হইয়া থাকেন। তাহাতে সাধকের কোনও ফল হয় না, বৃথা সময় নষ্ট হইয়া থাকে মাত্র। যথাক্রম বিধিই মুক্তির সুগম পন্থা।

হংস সন্ন্যাসী সম্বন্ধে সূত সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

হংস "হংসঃ কমণ্ডলুং শিক্যং ভিক্ষাপাত্রং তথৈব চ।
কন্থাং কৌপীন মাচ্ছাদ্য মঙ্গবস্ত্রং বহিঃপটম্॥
একন্তু বৈণবং দণ্ডং ধারয়েন্নিত্য মাদরাৎ।
ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কনং কুর্য্যাৎ শিবলিঙ্গং সমর্চ্চয়েৎ॥

হংস সন্ন্যাসীরা কমণ্ডলু, ঝোলা, ভিক্ষাপাত্র, কন্থা, কৌপীন, আচ্ছাদন, অঙ্গবস্ত্র, বহির্ব্বাস এবং বংশদণ্ড সতত বিধিপূর্ব্বক যত্ন সহকারে ধারণ করিবেন। অঙ্গে ভস্ম বিলেপন, ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ ও শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিবেন।

"অষ্টগ্রাসং সকৃন্নিত্যমশ্নীয়াৎ সশিখং বপেৎ।
সন্ধ্যাকালেষু সাবিত্রীজপমধ্যাত্মচিন্তনম্॥

তীর্থসেবাং তথা কৃচ্ছ্রং তথা চান্দ্রায়নাদিকম্ ।
কুর্ব্বন্ গ্রামৈকরাত্রেণ ন্যায়েনৈব সমাচরেৎ ॥"

হংস সন্ন্যাসী প্রতিদিন একবার মাত্র অষ্টগ্রাস ভোজন করিবেন, শিখা সহিত সমস্ত কেশ মুণ্ডণ করিবেন, সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী জপ ও অধ্যাত্মচিন্তন করিবেন এবং তীর্থ-সেবা, কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়নাদি ব্রতানুষ্ঠান সহকারে একরাত্রি মাত্র গ্রামে অবস্থিতি করিবেন এবং বিধিবৎ আচরণে নিযুক্ত থাকিবেন।

সন্ন্যাস গীতায় উক্ত হইয়াছে:—

"সন্ন্যাসী জ্ঞানবান হংসো বিষয়ে ভ্রমণংমুদা ।
সংসারে জ্ঞানবিস্তারং কুর্য্যাদেবং প্রযত্নতঃ ॥"

জ্ঞানবান হংস সন্ন্যাসী সতত প্রসন্ন থাকিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন ও অতি যত্ন সহকারে সংসারে জ্ঞানবিস্তারে নিরত থাকিবেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানের যোগ্যতা হইলে সাধক আত্মোন্নতির নিমিত্ত বহূদক ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। সেই সাধনায় যখন সম্পূর্ণ মনোনাশ করিবার যোগ্যতা হইবে, তখনই সাধকবর আনন্দসহকারে হংসদশায় বিচরণ করিবেন। অন্যথা পূর্ব্ব অবস্থাতেই সন্ন্যাসীর থাকা কর্ত্তব্য। আজকাল অনেকেই হংস বা দণ্ডী সন্ন্যাসীর সাজে সজ্জিত ও অভিমান পুষ্ট, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাঁহাদের যথাযথ অধিকারী দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বে বিরজা যজ্ঞোপলক্ষে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ বা পূর্ণাহুতি দিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। সন্ন্যাসাবস্থায় সেই যজ্ঞোপবীতের পরিবর্ত্তেই দণ্ডধারণের বিষয় সে সময় উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে, সাধক শ্রীগুরুর আজ্ঞায় অবস্থা-

মুসারে ত্রিদণ্ড, দ্বিদণ্ড বা একদণ্ড ধারণ করিবেন। সে দণ্ড কি এবং কেনই বা তাহার প্রয়োজন এতৎসম্বন্ধে এস্থলে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কারণ হংসাবস্থাকেই অধুনা সর্ব্ব-সাধারণে দণ্ডীস্বামী বা সন্ন্যাসী বলিয়া জানেন। আধুনিক অধিকাংশ দণ্ডীস্বামী সাধুরাও লৌকিকভাবে আপনাদিগের শ্রেষ্ঠ সাম্প্রদায়িক গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্যও ঐ ভাবে আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। রীতিমত দীক্ষা ও শিক্ষার অভাবে দণ্ডধারণ করিয়াই সন্ন্যাসীভিমানে একেবারে আত্মহারা হইয়া যান। প্রকৃত সন্ন্যাসাচার ও জীবন্মুক্তির উপায়স্বরূপ জ্ঞানযোগাদির অভ্যাস-ক্রিয়া কিছুই তাঁহারা অবগত নহেন। অধিকন্তু তাঁহাদেরই ভ্রান্ত উপদেশক্রমে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যদেবের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত "দণ্ডীরহস্য" সাধারণে কিছুমাত্রই অবগত হইতে পারে না।

দণ্ডীরহস্য।

দণ্ড অর্থে শাসন বা সংযম। সেই শাসন দণ্ড যিনি ধারণ করেন তিনিই দণ্ডী। ব্রহ্মচারী হইতে দ্বিজ মাত্রেই দণ্ডী। প্রথমাবস্থায় দ্বিজ-জাতীয় ত্রিবর্ণের উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে দণ্ড ও যজ্ঞোপবীত দেওয়া হয়, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় অতি অল্পকালের মধ্যে সেই দণ্ডটী বিসর্জ্জিত হইলেও তাহারা দণ্ডী আখ্যা হইতে বিচ্যুত হয় না। কারণ ত্রিদণ্ডীতে গ্রথিত যজ্ঞসূত্রই সেই পদ সদা রক্ষা করিয়া সনাতন ধর্ম্মে দ্বিজত্বের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখেন। ত্রিদণ্ডীযুক্ত যজ্ঞসূত্রই দ্বিজের ত্রিবিধ সংযমসূচক চিহ্নমাত্র। অর্থাৎ দ্বিজসন্তান মাত্রেরই সর্ব্বদা কায়, বাক্য ও মনের সংযম-ক্রিয়া দ্বারা আত্মধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যা রক্ষা করিতে হয়। দ্বিজমাত্রেই যথাবিধি উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে

সেই পবিত্র শাসন বা সংযম রক্ষা করিয়া থাকেন ও বহিরঙ্গে তাহারই চিহ্ন বা স্মারক ত্রিদণ্ডীকৃত ব্রহ্মসূত্র ধারণ করিয়া থাকেন। অনন্তর যথাক্রমে আশ্রমত্রয়ে সাধনার পরিপুষ্টি হইলে অন্তিম সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যঅঙ্গে অবস্থিত সেই ব্রহ্মসূত্র পরিত্যাগ করিয়া বা ব্রহ্মাগ্নিতে তাহা আহুতি প্রদান করিয়া অন্তর-দেহে জ্ঞানযজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞানই তাঁহাদের পবিত্র যজ্ঞোপবীত। তাহাও ত্রিগুণ-বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী-স্বরূপ। অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত এই তিন ভাবেরই তিন গুণ অর্থাৎ রজ্জুরূপে ত্রিগুণীকৃত ভাবের ধারণাকে ত্রিদণ্ড-ধারণ কহে। ইহারই অনুকল্পে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ডী যজ্ঞ-সূত্রের পরিবর্ত্তে ত্রিদণ্ড-ধারণের বিধি নিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত গুণত্রয় বা তাহার ভাবত্রয়ের ধারণা মধ্যে বিশেষ করিয়া ভাবপ্রধান ত্রিদণ্ড-ধারণাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথম বা নিম্ন-শ্রেণীর সন্ন্যাসীর জন্যই এই ত্রিদণ্ড-ধারণ শাস্ত্রানুগত।

প্রকৃতি ও পুরুষ তথা দৃশ্য ও দ্রষ্টার ধারণাকে আত্মজ্ঞানী মহাত্মগণ দ্বিদণ্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই দ্বিতীয় বা মধ্য-শ্রেণীর সন্ন্যাসীর দুই দণ্ড ধারণ বলিয়া শাস্ত্রোক্ত। আর যাঁহার স্বরূপ, জ্ঞানমাত্রেই স্থিত হইয়াছে তাঁহাকেই একদণ্ডী জানিতে হইবে। ইহাই তৃতীয় বা উচ্চ শ্রেণীর দণ্ডী সন্ন্যাসী-দিগের শ্রেষ্ঠ অধিকার বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। এই অন্তর বা জ্ঞান-দণ্ডের স্মারক স্বরূপে স্থূল বা বাহ্যদণ্ডের ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "সন্ন্যাস-গ্রহণ অংশে আরুণেয়োপনিষদোক্ত দণ্ড-গ্রহণ মন্ত্রেও ইহার আংশিক তাৎপর্য্যার্থ প্রদত্ত হইয়াছে, পাঠকের তাহা অবশ্য স্মরণ আছে। যাহাহউক উক্ত সূক্ষ্ম বা অন্তর দণ্ডের

অনুকল্পে ও স্মারক রূপে নির্দ্দিষ্ট স্থূল বা বাহ্যদণ্ড সম্বন্ধেও শাস্ত্রের আদেশ এইরূপ যে :—বেণ সৌম্য-ত্বক-সহিত সম-পর্ব্ব-যুক্ত পুণ্য-স্থল-সমুৎপন্ন নানা-কল্মষ-শোধিত, কীটাদিদষ্ট ও ছিদ্রাদি-বিহীন এবং অদগ্ধ বংশদণ্ডই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা সাধকের নাসিকা ভ্রূ বা মস্তক পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইবে।

এই দণ্ড ধারণের সঙ্গে সঙ্গে সতত আত্মসংযম রক্ষা করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা গ্রহণ বিনা ভিক্ষা যাওয়া উচিৎ নহে; এতদ্‌সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মঠে নানাবিধ নিষেধ-নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহা স্ব স্ব সম্প্রদায় হইতেই গুরুপরম্পরা-ক্রমে সন্ন্যাসী সহজে অবগত হইতে পারিবেন।

কলিযুগে এইরূপ দণ্ডধারণ সম্বন্ধে স্মৃতি ও তন্ত্রের মধ্যে অনেক স্থলেই যে নিষেধাজ্ঞা আছে, তাহা পূর্ব্বেই বিস্তৃত করিয়া বলা হইয়াছে। কিছুকাল বিকৃত-বৌদ্ধ-প্রাধান্য হেতু সমাজ ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্তই উচ্ছৃঙ্খল হওয়ায় সনাতন অনুষ্ঠানের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যদেবের আবির্ভাব হয় এবং তাঁহারই আদেশানুক্রমে আধুনিক সন্ন্যাসী শ্রেণীর মধ্যে বাহ্যতঃ বৈদিকভাবে গূঢ়-তম অন্তর-সাধন-তন্ত্রের উপদেশ সহ দণ্ডধারণাদি অনুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজকাল অধিকাংশ সন্ন্যাসীই দণ্ডাধিকার সম্বন্ধে প্রকৃত বিধি-বিজ্ঞানাদি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। মাত্র দুই দশটী সন্ন্যাসী ব্যতীত অবশিষ্ট প্রায় সকল সাধুই ফৌজের সিপাহীর মত নিরক্ষর মূর্খ, ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন। তাঁহারা সঙ্গিন চড়ান বন্দুকের ন্যায় নিজ স্কন্ধে দণ্ডধারণ করিয়াই সন্ন্যাসাভিমানে উন্মত্ত হইয়া থাকেন এবং অনেকেরই আবার এই দণ্ড-চিহ্ন অনায়াসে উদর

পূবণের একযন্ত্র স্বরূপেও পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদের না আছে জ্ঞান, না আছে শাসন অথবা সাধনার ক্রমনির্দ্দিষ্ট কোনও অধিকার। যাহারা পণ্ডিত, বেদান্তশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়াই তাঁহারা পরিতৃপ্ত।

উপনিষদের "কামক্রোধলোভমোহ দম্ভদর্পাসূয়ামমত্বাহঙ্কারান্ তাদিপরিত্যজেৎ" এই গভীর আদেশ ও উপদেশ সত্বেও তাঁহারা কামক্রোধ, মোহদম্ভ, অসূয়া ও অহঙ্কারাদির বশবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডিত্যাভিমানে পরিপূর্ণ। তাহাতেই আদৌ তাঁহাদের লোক চিনিতে দেয় না। ব্রহ্মজ্ঞান ত বহু দূরের কথা! "ব্রহ্মই জগৎ," "জগতই ব্রহ্ম" তাহার পর "আমিই ব্রহ্ম" এ সকলের অনুভব কেবল তাঁহাদের ওষ্ঠ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত এবং তাহারই মধ্যে সেই বাক্যজাল পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত। কি করিয়া জগতের মধ্যে ব্রহ্মের অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার উপলব্ধি করিতে হয়, কি করিয়া আপনার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া লইতে হয়, তাহার বিন্দু বিসর্গও চিন্তা করিবার অবসর নাই; কেবল বাক্যজালপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠার লীলায় সমস্ত পরিপূর্ণ। কোনদিন সে পথে যাইবার ইচ্ছাও নাই; যোগীশ্রেষ্ঠ যোগযুক্ত মহাত্মারা বলেন ব্রহ্মাণ্ড কেন্দ্রপিণ্ডের মূলাধার ভূঃলোক বা পৃথ্বি-তত্ত্ব হইতে সপ্তব্যাহৃতিরূপ সপ্তলোকের মধ্যদিয়া অন্তিম সত্য-লোকরূপ সহস্রার পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মদণ্ড যখন সরল সুঠাম হইয়া যায়, তখনই ইড়া পিঙ্গলায়, পিঙ্গলা সুষুম্নায় সুষুম্না ব্রহ্মে একীভূত হইয়া ত্রিদণ্ড হইতে ক্রমে একদণ্ডে পরিণত হয়। তাহাই যোগীবরের প্রকৃত দণ্ড এবং সেই দণ্ডধারীই যথার্থ আধ্যা-ত্মিক দণ্ডী পদবাচ্য। তখন সন্ন্যাসীর তুমি আমির ভেদ কম হইতে

থাকে, বিচারের প্রগল্ভতা দূর হয়? সকলের মধ্যেই একতানে ব্রহ্মজ্ঞানের বিমল অদ্বিতীয় ধারা দেখিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। আহা! পরমারাধ্য শ্রীমদ্‌ঠাকুর, দণ্ডীদিগের মধ্যে সেই অনির্ব্বচনীয় এই ভাবদণ্ড প্রদান করুন!

এই হংসদণ্ডী সন্ন্যাসী সম্বন্ধে শ্রীসদাশিব প্রোক্ত বিশেষ ভেদ ও অনুষ্ঠানাবলীর অধিকতর আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পরমহংস ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিয়া পরে সন্ন্যাসীদিগের বর্ত্তমান কালোচিত শ্রেণী বিভাগ বিষয়ে আর ও যে সমুদায় ভেদ আছে তাহারও যথাক্রমে বর্ণনা করিব।

সূতসংহিতায় পরমহংসাশ্রম সম্বন্ধে বর্ণিত—
আছে ঃ—

"পরমহংস স্ত্রিদণ্ডঞ্চ রজ্জুং গোবালমিশ্রতম্।
পরমহংসা শিক্যং জল পবিত্রঞ্চ পবিত্রঞ্চ কমণ্ডলুম্॥
পক্ষিণীমজিনং সূচীং মৃৎখনিত্রীং কৃপাণিকাম্।
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ নিত্য কর্ম্ম পরিত্যজং॥"

পরমহংস সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ড, গোবাল মিশ্রিত রজ্জু, জল পবিত্র শিক্য, পবিত্র কমণ্ডলু, পক্ষিণী, অজিন, সূচী, মৃৎখানিত্রী, কৃপাণ, শিখা, যজ্ঞোপবীত ও পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সন্ন্যাস ধর্ম্মাচরিত নিত্য কর্ম্ম সমূহও পরিত্যাগ করিবেন। আর সংহিতা মধ্যেই অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

কৌপীনং চ্ছাদনং বস্ত্রং কন্থাং শীতনিবারিকাম্।
যোগপট্টং বহির্বস্ত্রং পাদুকাং ছত্রমদ্ভুতম্॥
অক্ষমালাঞ্চ গৃহ্নীয়াৎ বৈণবং দণ্ড মব্রণম্।
[illegible]গ্নবিত্যাদিভির্ম্মন্ত্রৈঃ কুর্য্যাদুদ্ধননং মুদা।

ওমিতি চ ত্রিভিঃ প্রোচ্য পরমহংসস্ত্রিপুণ্ড্রকম্ ॥”

কৌপীন, আচ্ছাদন-বস্ত্র, শীত-নিবারিকা কন্থা, যোগ-পট্ট, বহির্বাস, পাদুকা, অক্ষমালা, ছত্র ও বংশদণ্ড গ্রহণ করিবেন। “অগ্নি ইত্যাদি” মন্ত্রে অঙ্গে ভস্মলেপন করিবেন ও তিনবার (ওঁ) প্রণব উচ্চারণ করিয়া ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিবেন।

“ নির্ণয়সিন্ধুতে ” উক্ত আছে ঃ—

“ ন দণ্ডং ন শিখাং নাচ্ছাদনং চরতি পরমহংস ইতি ॥”

অর্থাৎ পরমহংস—দণ্ড, শিখা ও আচ্ছাদনাদি কিছুই ধারণ করিবেন না। এই সকল বিভিন্ন মতের সমাহারে ইহাই সাধারণ-ভাবে প্রচলিত আছে যে, পরমহংসাবস্থায় বিশেষ বিধি-নিষেধ কিছুই নাই। এ বিষয়ে শিবোক্ত বিধি পরে বর্ণিত হইবে। যাহাহউক সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে কুটীচক, বহূদক ও হংস বা যে কোন শ্রেণীর সন্ন্যাসীই মোক্ষ-লাভেচ্ছায় গায়ত্রীমাত্র উপাসনা করিবেন। “আরুণোপনিষদে” উক্ত হইয়াছে যে ঃ—“সন্ন্যাসীরা সন্ধ্যাত্রয়ের পূর্ব্বে মোষল অর্থাৎ স্নান করিবেন, কারণ তাঁহারা মোক্ষকামী, স্বর্গাদি বাসনা তাঁহাদের নাই। সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইলে, তাঁহারা ধ্যান-সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাতে পরমাত্ম-স্বরূপ চিন্তা করিবেন। সর্ব্ববেদের মধ্যে ‘আরণ্যক’ অর্থাৎ জ্ঞান-প্রতিপাদক অংশই যথানিয়মে পাঠ করিবেন ও তাহার অর্থ-চিন্তা করিবেন। যতক্ষণ জ্ঞানোপলব্ধি না হয়, ততক্ষণ জ্ঞানালোচনায় রত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন সন্ধ্যাসময়ে গায়ত্রী আরাধনা করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।”

বেদত্রয় প্রণবমূলক, এজন্য পরমহংস সন্ন্যাসীরা সর্ব্বদা প্রণব বা

* “প্রণব রহস্য” দেখ।

ওঁকার মাত্র জপ করিবেন। সন্ন্যাসী-শ্রেষ্ঠ পরমহংস, নির্জ্জন দেশে সমাহিত ও মনের সুখে সমাসীন হইয়া যথাশক্তি সমাধিস্থ হইতে যত্ন করিবেন।

অধুনা পরমহংসদিগের সম্প্রদায়কে মণ্ডলী বলে। পরমহংসেরা কখন গৃহ-বিশেষে, মঠে, কখন উদ্যানে, পীঠ স্থানে বা কোন পবিত্র তীর্থে অবস্থিতি করেন। কখনও বা তীর্থ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া থাকেন। যদিও ইঁহারা ওঁকার বা নির্গুণব্রহ্মোপাসক ও তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বী, তত্রাচ প্রয়োজন হইলে কেহ কেহ সগুণ-ব্রহ্মোপাসনাসহ দিব্য ও বীরাচার অবলম্বন করিয়াও থাকেন।

পরমহংস সাধারণতঃ দ্বিবিধ। যথা দণ্ডী-পরমহংস ও অবধূত পরমহংস। যাঁহারা দণ্ডত্যাগ করিয়া পরমহংসাশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহারা দণ্ডী-পরমহংস এবং যাঁহারা অবধূত-বৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়া পরে এই আশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহার অবধূত-পরমহংস বলিয়া কথিত হন।

দণ্ডীঅবধূত ও পরমহংসের ভেদ।

শ্রীসদাশিব বলিয়াছেনঃ—

"অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে।"

হে দেবি, কলিকালে অবধূতাশ্রমকেই সন্ন্যাসাশ্রম বলে। 'যোনিতন্ত্রে' শ্রীভগবান বলিয়াছেনঃ—

"চতুর্থাশ্রমিণাং মধ্যে অবধূতাশ্রমো মহান্।
তত্রাহং কুলযোগেন মহাদেবত্বমাগতঃ॥"

চতুর্থাশ্রমী বা ভিক্ষুক সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অর্থাৎ অবধূত ও দণ্ডীদিগের মধ্যে অবধূতাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। কারণ আমি কুলাবধূতরূপে বা শক্তি-সহযোগে সাধনা দ্বারাই মহাদেবত্ব লাভ করিয়াছি।

শ্রীভগবান "নির্ব্বাণতন্ত্রে" বলিয়াছেনঃ—

"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি অবধূতো যথা ভবেৎ।
বীরস্য মূর্ত্তিং জানীয়াৎ সদা তপঃপরায়ণঃ॥
দণ্ডিনাং মুণ্ডনঞ্চৈবামাবাস্যায়াং চরেদ্ যথা।
তথা নৈব প্রকুর্য্যাত্তু বীরস্য মুণ্ডনং প্রিয়ে॥"

হে দেবি, যেরূপে অবধূত হয়, তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর। অবধূত ব্যক্তি আপনাকে সাক্ষাৎ বীরের মূর্ত্তি বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদা বীরাচারী হইয়াই তপঃপরায়ণ হইবেন। দণ্ডিরা যেমন প্রতি অমাবস্যা তিথিতে মস্তক মুণ্ডন করেন, বীরাবধূত সেইরূপ মুণ্ডন করিবেন না। সন্ন্যাসীদের এই "মাসান্তর" মুণ্ডন ব্যাপারটী অতি প্রাচীন রীতি বলিয়া মনে হয় না, কারণ যিনি সর্ব্ব-কর্ম্মত্যাগী, সকল বিধি-নিষেধের অতীত, বিশেষ যিনি পরমহংস-বৃত্তি আশ্রয় করিয়াছেন, যিনি অযাচিত গ্রাসাচ্ছাদনে পরিতুষ্ট, অরণ্য তরুকোটর ও গিরিগুহাই যাঁহার আশ্রয়স্থল, তাঁহার পক্ষে এইরূপ নিয়মিতভাবে ক্ষৌর-কার্য্য করান অর্থাৎ মাসান্তে ক্ষৌরকার অনুসন্ধান করিয়া অমাবস্যায় মস্তকাদি মুণ্ডন করান, কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। বাস্তবিক প্রারব্ধ-কার্য্যের অবসানের জন্যই যিনি সতত একান্ত-বাসী, যিনি নামরূপের স্মৃতি পর্য্যন্ত ভুলিয়া পরমাত্মায় আত্ম-নিয়োগ-কার্য্যে অহরহঃ সচেষ্ট ও তন্ময়প্রায়, তাঁহার আবার বার-তিথি স্মরণে ব্রতানুষ্ঠানের ন্যায় মাসান্তে গ্রামে আসিয়া নাপিত ডাকিয়া মুণ্ডন করিবার অবসর-কোথায়? পক্ষান্তরে বর্ত্তমান সময়ে সন্ন্যাসীর সংখ্যা যত অধিক পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, প্রাচীন কালে এরূপ ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই, বরং সেই অতীত যুগে

নারদ, সূত, সনন্দনাদি কয়েকজনমাত্র সন্ন্যাসীরই নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস পুরাণাদির মধ্যে তাঁহাদের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহাতে শ্রীমন্মহর্ষি নারদাদির মুণ্ডিত মস্তকের কোথাও উল্লেখ নাই, অপিচ দীর্ঘ কেশ-শ্মশ্রুই তাঁহাদের সন্ন্যাসী-পরিচায়ক চিহ্ন বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই মুণ্ডন-ক্রিয়ার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, জৈন তথা শ্রীমৎ বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ভৈক্ষুক-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ইহা প্রথমে বিশেষভাবে পরিগৃহীত* হয়। অনন্তর সনাতন-ধর্ম্মাচার্য্য জগদ্গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ভগবান, সেই বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ ও সনাতনধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়-কালে তৎকাল-প্রচলিত বৌদ্ধ ভিক্ষুর অনুরূপ প্রাচীন সন্ন্যাসী-আচারের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার সহিত দেশ, কাল ও পাত্রের অনুকূল মুণ্ডিত কেশ-শ্মশ্রুর ও অন্যান্য বহির্বিধানের বিলয়-উপদেশ না দেওয়ায়, তদবধি এই মুণ্ডন-কার্য্য সনাতন-সন্ন্যাসীরও সাধারণ পরিচয়-চিহ্ন হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা দণ্ডী, মুণ্ডী, জটী আদি যে কোন বিধিই সন্ন্যাসীর পরিচায়ক-চিহ্ন বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে।

"অসংস্কৃতকেশজালো মুক্তালম্বিতমূর্দ্ধজঃ।
অস্থিমালাবিভূষশ্চ রুদ্রাক্ষান্ বাপি ধারয়েৎ॥
দিগম্বরো বীরেন্দ্রশ্চ অথবা কৌপিনী ভবেৎ।
রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গঃ কুর্য্যাৎ ভস্মবিভূষণং॥"

অবধূতাশ্রমে সর্ব্বদা অসংস্কৃত কুন্তলরাশি বা জটা-জুট এবং মুক্ত ও দীর্ঘ কেশসমূহ ধারণ করিবেন। অস্থিমালা অথবা রুদ্রাক্ষ-

*জৈনধর্ম্ম বর্ণনায়ঃ—"মুণ্ডংমলিনবস্ত্রঞ্চ কুণ্ডিপাত্র সমন্বিতম্ ইত্যাদি।"
শিবপুরাণম্-জ্ঞানসংহিতা ২২ অঃ।

মালাদি ধারণ করিবেন। বীরেন্দ্র অবধূত সম্পূর্ণ নগ্ন অথবা কৌপীন মাত্র ধারণ করিবেন। তিনি সর্ব্বাঙ্গে রক্তচন্দন বা ভস্ম বিলেপন করিবেন অর্থাৎ সর্ব্বাবয়বে শ্রীমদ্‌ভগবান্ ভোলানাথ শঙ্করের ন্যায়ই বেশভূষায় শোভিত হইয়া উচ্চতম যোগাদি ক্রিয়াশক্ত হইয়া তপশ্চরণ করিবেন।

আধুনিক, নিরঞ্জনী ও নির্ব্বাণী আদি নগ্ন বা নাগা সাধু-সন্ন্যাসিগণ বাহ্যতঃ এইরূপ আচরণই অবলম্বন করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ শিবাবতার শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের পর সন্ন্যাসাশ্রমের কিঞ্চিৎ অধিক প্রচার হইয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার শিষ্য-বর্গের প্রবর্ত্তিত দশনামী* সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীসদাশিব-প্রোক্ত এবং অবধূতপ্রবর শ্রীভগবান দত্তাত্রেয়-কথিত অবধূতাশ্রমের অনুষ্ঠানসমূহের সম্মিলন-ফলেই আধুনিক সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে নানা মিশ্রাচার দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাহউক শ্রীভগবান্ "মহানির্ব্বাণে" বলিয়াছেন :—

"এতত্তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষান্নির্ব্বাণকারণম্।
চতুর্ব্বিধাবধূতানাম্ এতদেব পরং ধনম্॥"

এই আমি তোমাকে সাক্ষাৎ নির্ব্বাণের কারণ জ্ঞানের উপ-দেশ-বিষয়ে বলিলাম। চতুর্ব্বিধ অবধূতের পক্ষে ইহাই পরমধন। এতদ্বিষয়ে শ্রীভগবানই পরে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন : —

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
গৃহাশ্রমে বসন্তোঽপি জ্ঞেয়াস্তে যতয়ঃ প্রিয়ে॥"

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের যে সকল সাধু ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেও, যতি বা ব্রহ্মাবধূত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।

*আম্নায়-নির্দ্দিষ্ট সন্ন্যাসীসম্প্রদায় বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

"পূর্ণাভিষেকবিধিনা সংস্কৃতা যে চ মানবাঃ।
শৈবা-ধৃতাস্তে জ্ঞেয়াঃ পূজনীয়া কুলার্চ্চিতে ॥"

হে কুলার্চ্চিতে, যে সকল মনুষ্য পূর্ণাভিষেকের বিধানাদির অনুসারে সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহারাই শৈবাবধূত। তাঁহারা সকলেরই পূজনীয়।

'উক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণ-বিভেদতঃ।
পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিব্রাড়পরঃ প্রিয়ে ॥"

হে প্রিয়ে, উক্ত শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূত আবার—পূর্ণ ও অপূর্ণ-ভেদে দুই প্রকার। পূর্ণ-শৈবাবধূত ও পূর্ণ-ব্রাহ্মাবধূতকে পরমহংস এবং অপূর্ণ-শৈবাবধূত বা অপূর্ণ-ব্রাহ্মাবধূতকে পরিব্রাট্ বা পরিব্রাজক বলে। অপূর্ণ-শৈবাধূতকে কৌলাবধূতও বলা যায়।

"ভৈরবডামরে" শ্রীভগবান এই চতুর্ব্বিধ অবধূতাশ্রমের নিম্ন-লিখিতরূপ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যথা ১ম। কৌলাবধূত, ২য়। শৈবাবধূত ৩য়। ব্রাহ্মাবধূত ও ৪র্থ হংসাবধূত। পূর্ব্বের সহিত ইহার নামমাত্রেই কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আচার ও ব্যবহারগত কোনও পার্থক্য নাই। যাহা-হউক শিবপ্রোক্ত বিধান ও সাধকসম্প্রদায়-মধ্যে গুরুপরম্পরায় প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে চতুর্ব্বিধ অবধূতের লক্ষণ ও ক্রিয়া-বিধি এক্ষণে বর্ণন করিতেছি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—পরিব্রাজক ও পরমহংস-ভেদে শৈবাবধূত এবং যতি বা, ব্রাহ্মাবধূতের দুইটী বিভাগ আছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেনঃ—

"কৃতাবধূতসংস্কারো যদি স্যাৎ জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
তদা লোকালয়ে তিষ্ঠন্ আত্মানং স তু শোধয়েৎ ॥

রক্ষন্ স্বজাতিচিহ্নঞ্চ কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি কৌলবৎ।
সদা ব্রহ্মপরো ভূত্বা সাধয়েৎ জ্ঞানমুত্তমম্ ॥"

যে মানব অবধূত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন, অথচ তিনি যদি জ্ঞান-বিষয়ে দুর্ব্বল থাকেন, অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান-বৈরাগ্য পূর্ণ-অদ্বৈতভাব যদি জন্মিয়া না থাকে, তবে তিনি স্বজাতি-চিহ্ন শিখা-সূত্রাদি রক্ষা করিবেন ; তিনি কৌলের ন্যায় সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন এবং সদা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া নিরন্তর জ্ঞান-সাধনায় তৎপর হইবেন। ইহাদ্বারা স্থির হইতেছে যে, শৈবাবধূত বা ব্রাহ্মাবধূত অপূর্ণ-অবস্থায় গৃহস্থভাবে দিনযাপন করিলেও পরিব্রাজকের মধ্যে গণ্য হইতেছেন। অতএব গৃহস্থ-অবধূতকে যদি পৃথক করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ অবধূত ছয় প্রকার বলিতে হইবে। যথাঃ—

১ম। শৈবাবধূত :—ইনি অপূর্ণাবস্থায় সংসারে থাকিলেও শিবসদৃশ মহাসন্ন্যাসীর ন্যায় আত্মোন্নতি-কার্য্যে রত রহিবেন। ইহাকেই তন্ত্রান্তরে কৌলাবধূত বলা হইয়াছে।

২য়। শৈবাবধূত-পরিব্রাজক :—ইহা শৈবাবধূতের দ্বিতীয় অপূর্ণাবস্থা। এই অবস্থায় সাধক সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থে-তীর্থে পীঠ-পরিভ্রমণপূর্ব্বক জপপূজাদি দ্বারা আত্মোন্নতি করিতে থাকিবেন। ইচ্ছা করিলে শক্তি-লইয়া নিয়মিত কুল-সাধনাদি করিতেও পারেন।

৩য়। শৈবাবধূত-পরমহংস :—ইহা শৈবাবধূতের পূর্ণ বা তৃতীয় অবস্থা। ইনি কর্ম্মত্যাগী কৌপীনধারী সন্ন্যাসী ; ইনি যোগ, ভোগ ও বিধি-অনুসারে উপযাচিকা-কামিনীর কামনা পূর্ণ করিতেও পারেন।

৪র্থ। যতি বা ব্রাহ্মাবধূত :—ইনি প্রথম শ্রেণীর শৈবাবধূতের ন্যায় অপূর্ণ-যতি বা অপূর্ণ-ব্রাহ্মাবধূত। ইনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও জিতেন্দ্রিয়ভাবে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিবেন ও পূর্ণ-জ্ঞান-বৈরাগ্য-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত গৃহস্থভাবেই দিনাতিপাত করিবেন। তবে স্বশক্তি ব্যতীত শৈবাবধূতের ন্যায় ইহাঁর শৈববিবাহ-কৃত বা পরশক্তি গ্রহণের অধিকার নাই।

৫ম। ব্রাহ্মাবধূত-পরিব্রাজক :—ইহার কার্য্য প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর শৈবাবধূতের ন্যায়; তীর্থে-তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া আত্মোন্নতিসহ বিশ্বের কল্যাণে নিয়োজিত হইবেন। কিন্তু উপযাচিকা কামিনী-সম্ভোগে ইঁহার অধিকার নাই। তবে গুরুর উপদেশ ও আজ্ঞা অনুসারে পূজ্যাশক্তি-সমন্বিত ব্রহ্মচক্রে শক্তিসাধনে অধিকার আছে। ইহাও যতি বা ব্রাহ্মাবধূতের অপূর্ণ অবস্থার লক্ষণ। পূর্ব্বকথিত হংস-সন্ন্যাসীদিগের অনুরূপ আচার পালনে ইঁহারা সতত নিয়োজিত থাকিয়া পরবর্ত্তী অবস্থা-প্রাপ্তির জন্য কায়মনে প্রযত্ন করিবেন।

৬ষ্ঠ। ব্রাহ্মাবধূত-পরমহংস :—পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় শ্রেণীর শৈবাবধূত পরমহংসেরই অনুরূপ। ইঁহারা যতি বা ব্রাহ্মাবধূতের পূর্ণাবস্থার লক্ষণযুক্ত, কিন্তু কোনরূপ কামিনী-সঙ্গ বা ধাতু-পরিগ্রহণাদি কোন কার্য্যেই ইহাঁদের অধিকার নাই। শ্রীভগবান ইহাঁদিগকেই হংস-সন্ন্যাসী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

"চতুর্নামবধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে।
ত্রয়োঽন্যে যোগভোগাঢ্যা মুক্তাঃ সর্ব্বে শিবোপমাঃ॥"

পূর্ব্বকথিত দুই প্রকার অপূর্ণ বা গৃহস্থ ব্যতীত চারিপ্রকার অবধূতের মধ্যে তুরীয় পরমহংস বা চতুর্থ পূর্ণ-ব্রাহ্মাবধূতকে হংস

বলা যায়। কিন্তু অন্য ত্রিবিধ অবধূত যোগ ও ভোগ করিলেও শিবসদৃশ মুক্তাবধূত জানিতে হইবে। এই পূর্ণ-ব্রাহ্মাবধূত পরমহংস বা শিবোক্ত হংস-সন্ন্যাসীর আচার সম্বন্ধে তাঁহার আজ্ঞা এই যে:—

"হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরিগ্রহম্।
প্রারব্ধমশ্নন্ বিহরেৎ নিষেধবিধিবর্জ্জিতঃ ॥"

হংস অর্থাৎ পূর্ণ-ব্রাহ্মাবধূত, তিনি স্ত্রীসংসর্গ ও ধাতু-পরিগ্রহণ করিতে পারিবেন না। তিনি বিধি-নিষেধ-বির্বর্জ্জিত হইয়া প্রারব্ধমাত্র ভোগপূর্ব্বক সংসারে বিহার করিবেন।

"ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্নানি কর্ম্মানিগৃহমেধিনাম্।
তুরীয়ো বিচরেৎ ক্ষৌণীং নিঃসঙ্কল্পো-নিরুদ্যমঃ ॥
সদাত্মভাবসন্তুষ্টঃ শোকমোহবিবর্জ্জিতঃ।
নির্নিকেতস্তিতিক্ষুঃ স্যাৎ নিঃশঙ্কোনিরুপদ্রবঃ ॥
নার্পণং ভক্ষ্যপেয়ানাং ন তস্য ধ্যানধারণা।
মুক্তো বিরক্তো নির্দ্বন্দ্বো হংসাচারপরো যতিঃ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি চতুর্ণাংকুলযোগিনাম্।
লক্ষণং সবিশেষেণ সাধুনাং মৎস্বরূপিণাম্ ॥"

এই তুরীয় পরমহংস বা হংসাবধূত স্বজাতি-চিহ্ন শিখাসূত্র-তিলকাদি পরিত্যাগ করিবেন। তিনি গৃহস্থ-কর্ম্ম করিবেন না, সংকল্পশূন্য ও শরীর পোষনার্থ উদ্যম-রহিত হইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন। তিনি সর্ব্বদা আত্মভাবেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। কখনও শোক ও মোহে অভিভূত হইবেন না। তাঁহার কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট আসন বা মঠাদি স্থান থাকিবে না। সদা ক্ষমাশীল, নিঃশঙ্ক ও নিরুপদ্রব হইবেন। তিনি ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য কাহাকেও অর্পণ করিবেন না। তাঁহার ধ্যান-ধারণা নাই। এই হংসাচার-পরায়ণ

যতিঃ মুক্ত, বিরাগযুক্ত ও শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইবেন। দেবি, এই তোমার নিকট চতুর্ব্বিধ পূর্ণ কুলযোগীর লক্ষণ বিশেষরূপে বলিলাম। ইহাঁরা সকলেই শিবস্বরূপ মহাপুরুষ। ইহাঁদের দর্শন করিলেও জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়।

"সন্ন্যাস গীতায়" শ্রীমন্মহর্ষি-যাজ্ঞবল্ক্যদেব বলিয়াছেনঃ—

"পূজ্যঃ পরমহংসঃ স সন্ন্যাসী বিগতজ্বরঃ।
কুর্ব্বন্নকুর্ব্বন্ বা কিঞ্চিদসৌ নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

যাঁহার সকল প্রকার তাপদূর হইয়া গিয়াছে, এইরূপ পরমহংস সন্ন্যাসী কিছু করেন বা না করেন, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ হইবার কারণ সকলেরই পূজ্য, শাস্ত্রে এইরূপই উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কুটীচক, বহূদক ও হংস আদি সন্ন্যাসীগণ কৌপীন, দণ্ড, কমণ্ডলু আদি যাহার যেরূপ চিহ্ন ধারণ করিবার বিধি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন। কিন্তু পরমহংসদিগের পক্ষে কোনও নিয়মই পালন করিবার প্রয়োজন হইবে না; কারণ বিধি-নিষেধাদি তাঁহাদেরই সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"ভেদঃ পরমহংসস্ত ব্রহ্মণাসহ কোঽপি ন।
অহমেবাঽস্মি ব্রহ্মেতি ভাবস্যাঽনুভববিনা॥
কশ্চিৎ পরমহংসস্য প্যদবীংলভতে নহি।
দ্বৈত ভানঃ দশায়াঞ্চাপ্যস্যাং নৈবাঽভিজায়তে॥"

ব্রহ্মের সহিত পরমহংসের কোনও ভেদ নাই। "অহং-ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এই ভাবের অনুভব বিনা কেহই পরমহংসপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। এই দশায় দ্বৈত ভাবের ভানও থাকে না। সুতরাং এই অন্তিম দশায় সচ্চিদানন্দরূপ উত্তম

অদ্বৈত-স্থিতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং সেই সময়েই সন্ন্যাসী সমাধিস্থ আত্মারাম হইয়া যান।

পূর্ব্বে ঈশকোটী ব্রহ্মকোটি ভেদে দুই প্রকার জীবনমুক্তের কথা বলা হইয়াছে। তাহা পাঠকের স্মরণ থাকা সম্ভব। পরমহংসাবস্থাতেও সেইরূপ ঈশকোটী ও ব্রহ্মকোটী পরমহংস-সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, এই জীবনমুক্ত মহাপুরুষই পরমহংস-পদবী-বাচ্য। যিনি আত্মারাম বা আত্ম-ব্রহ্মময় হইয়া নির্ব্বাক, স্তব্ধ, জড় বা বাল ভাবাপন্ন হইয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দে গদ গদ হইয়া থাকেন, তিনিই ব্রহ্মকোটী পরমহংস, আর যাঁহারা ঈশকোটীর জীবনমুক্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবানের প্রতিনিধিরূপে নিষ্কাম-ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীভগবানেরই—বিশ্বকল্যাণকর কার্য্যে সতত নিয়োজিত থাকেন, তাঁহারাই ঈশকোটী পরমহংস। ইঁহারাও সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। ইঁহারা দেবতা ও ঋষিদিগেরও শক্তি-সমন্বিত হইয়া সংসারের জ্ঞানদাতা ও ভয়ত্রাতা হইয়া থাকেন। যিনি এইরূপ জ্ঞানদণ্ডধারী তিনিই যথার্থ একদণ্ডী ও পরমহংস। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—যাঁহার আশা বিনষ্ট হয় নাই এবং যিনি ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন, তিনি কেবল বংশদণ্ড-ভারবাহী নামমাত্র দণ্ডী বা পরমহংস। তাঁহার মুক্তি ত নাই, অধিকন্তু তাঁহাকে তৎপরিবর্ত্তে মহারৌরব নামক নরক-ভোগ করিতে হইবে। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন :—

"কাষ্ঠ (বংশ) দণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশাজ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরব সংজ্ঞিতান্॥"

বাস্তবিক এরূপ দণ্ড ধারণে কোনও ফল নাই, কেবল আমি দণ্ডী সাধু বা পরমহংস এই অভিমান ও তাহাতে লোকসমাজে

আপনার প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার চেষ্টা মাত্র হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন:—

"সন্ন্যাসীর পরমহংস অবস্থায় আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা শূকরবিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়া কীটের ন্যায় পর্য্যটন করা কর্ত্তব্য। তখন বিনাপ্রার্থনায় যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাতেই গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন করিতে হইবে। কোনরূপ ইচ্ছা মনোমধ্যে স্থান পাইবে না। যদ্যপি আচ্ছাদনোপযোগী বস্ত্রাদি না পাওয়া যায়, তবে দিগম্বর হইয়াই থাকিতে হইবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় সন্ন্যাসী ভাবাভাব রহিত হইয়া যাইবেন। ইহা যে কেবল চেষ্টা দ্বারা হইয়া থাকে, তাহা নহে। উচ্চ পরমহংস-অবস্থায় আপনা আপনি তাঁহাদের বাহ্য লক্ষণ প্রায় এইরূপই হইয়া যায়। বাস্তাবিক বিষয় বা দৃশ্যাদি সম্পূর্ণ উপেক্ষাই এই সমস্ত লক্ষণের পরিচায়ক। ব্রহ্মানন্দরূপী দত্তাত্রেয়াবধূত পরমহংসদেব তদ্‌বিরচিত "অবধূতগীতায়" বলিয়াছেন—

"অবধূতলক্ষণং বর্ণৈর্জ্ঞাতব্যং ভগবত্তমৈঃ।
বেদবর্ণার্থতত্ত্বজ্ঞৈর্বেদবেদান্তবাদিভিঃ॥
আশাপাশবিনির্ম্মুক্ত আদিমধ্যান্তনির্ম্মলঃ।
আনন্দে বর্ত্ততে নিত্যমকারাস্তস্য লক্ষণম্॥
বাসনা বর্জ্জিতো যেন বক্তব্যং চ নিরাময়ম্।
বর্ত্তমানেষু বর্ত্তেত বকারস্তস্য লক্ষণম্॥
ধূলিধূসরগাত্রানি ধৃতচিত্তো নিরাময়ঃ।
ধারণাধ্যাননির্ম্মুক্তো-ধূকারস্তস্য লক্ষণম্॥
তত্ত্বচিন্তাধৃতা যেন চিন্তাচেষ্টাবিবর্জ্জিতঃ।
তমোহহঙ্কার নির্ম্মুক্তস্তকারস্তস্য লক্ষণম্॥"

বেদবাদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ভগবান বেদবেদান্তবাদীরা বর্ণে বর্ণে

অবধূতের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা অবধূতাশ্রমীর জানা উচিত। অবধূত শব্দের 'অ'কারে আশাপাশবিনির্ম্মুক্ত আদি-মধ্য ও অন্ত-নির্ম্মল এবং নিত্যানন্দে বর্ত্তমান থাকাকে বুঝায়। অবধূতশব্দের 'ব' কারে বাসনাবর্জ্জিত, নিরাময়-বস্তুতে-বর্ত্তমানকে বুঝায়।

অবধূতশব্দের 'ধূ'কারে ধূলিধূসরিতগাত্র, ধূতচিত্ত, নিরাময় এবং ধারণা-ধ্যান-বিনির্ম্মুক্তকে বুঝা যায়।

অবধূত শব্দের 'ত' কারে তত্ত্ব চিন্তাকারী, চিন্তা-চেষ্টা-বিবর্জ্জিত তমঃ বা অহঙ্কার বিনির্ম্মুক্তকে বুঝায়।

এই আশা-পাশাদি বর্জ্জিত, আদিমধ্যান্ত-নির্ম্মল, আনন্দময়, বাসনা-বিবর্জ্জিত, নিরাময়, ধূলি-ধূসরিতদেহ ধৃতচিত্ত, ধারণা ও ধ্যানাতীত ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তা-পরায়ণ সংসার-চিন্তা ও চেষ্টা বিরহিত এবং অহঙ্কার-বিনির্ম্মুক্ত মহাপুরুষই অবধূত পদবাচ্য প্রকৃত পরমহংস, সন্ন্যাসী বা মহাত্মা। সেই কারণ শ্রীমন্মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য-দেব পুনরায় বলিয়াছেন :—

"পাংশুনা চ প্রতিচ্ছন্নঃ শূন্যাগার প্রতিশ্রয়ঃ।
বৃক্ষমূল নিকেতো বা ত্যক্ত সর্ব্ব প্রিয়াঽপ্রিয়ঃ॥
যাত্রাস্তমিতশায়ী স্যান্নিরাগ্নির নিকেতনঃ।
যথালব্ধোপজীবী স্যান্মুনির্দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
নিষ্ক্রম্য বনমাস্থায় জ্ঞানযজ্ঞো গতস্পৃহঃ।
কালকাঙ্ক্ষীচরন্নেব ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"

ভস্ম বা ধূলি-ধূসর, শূন্যাগার যাঁহার আশ্রয়, অথবা বৃক্ষমূলই যাঁহার গৃহ, যিনি প্রিয় ও অপ্রিয় সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাত্রা করিতে করিতে যেস্থানে সূর্য্যাস্ত হয়, সেই স্থানেই যিনি শয়ন করিয়া থাকেন, যিনি অগ্নি ও গৃহ রহিত, যাহা কিছু পান তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট হইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, সেই দয়ালু-জিতেন্দ্রিয়, কর্ম্ম ও স্পৃহা-রহিত জ্ঞানযজ্ঞ-পরায়ণ মুনি বনে আসিয়া কালাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিচরণ করেন; তিনিই ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দদেব।

পরমপূজ্যপাদ পরমহংসপ্রবর আদিনাথ মঠ শ্রীমদ্ বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দদেব* এক দিন তদীয় প্রিয় শিষ্যবর্গের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধক্রমে এই ভাবেরই যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সাধু পাঠকগণের অবগতির জন্য এ স্থানে

---

*অনেকেই নিতান্ত ভ্রান্তবশে 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী' ও 'তারারহস্য'-প্রণেতা শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ গিরি ও আদিগুরু বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ দেবকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীকার 'ব্রহ্মানন্দ গিরি" দশনামী-সম্প্রদায়ভুক্ত 'গিরিনামা' সাধু, তিনি বামাচারী ও মহাযোগী সিদ্ধপুরুষ ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরের নিকট তাঁহার আসন এখনও বিদ্যমান আছে। তাঁহার শেষ জীবন সনাতন ধর্ম্মের প্রতিকূল-রহস্যপূর্ণ। কিন্তু আদিগুরু বৃদ্ধব্রহ্মানন্দদেব ভাবাতীত একাধারে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, তিনি শঙ্করাবতার প্রভু শঙ্করাচার্য্যেরও অনেক পূর্ব্বের লোক, সে কথা 'গুরুপ্রদীপে' উক্ত হইয়াছে। অতএব আদি গুরুদেবের সময় এখন হইতে প্রায় সপ্তদশশত-বৎসরেরও অনেক পূর্ব্বে। তাঁহার শিষ্য-পরম্পরায় পর্য্যায়াবলীর হিসাবে বর্ত্তমানকালে পরমহংসাশ্রমী যিনি শেষ ব্যক্তি, তিনি ১৪১ পর্য্যায়ে অবস্থিত জানিতে পারা যায়। আদিগুরু হইতে প্রত্যেক গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে প্রথম সন্ন্যাসদীক্ষার পর পরমহংস অবস্থা পর্য্যন্ত সাধনকাল ন্যূনকল্পে সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর নির্দ্ধারিত, এই স্থূল হিসাবেও বুঝিতে পারা যায় ১৪১ × ১২ = ১৬৯২। প্রায় সতের শত বৎসর। আবার প্রথম পর্য্যায়ের বা তাঁহার প্রত্যক্ষ শেষ শিষ্যেরাই সে সময় অতি বৃদ্ধ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বেও তিনি অতি বৃদ্ধ ছিলেন। শিষ্যপরম্পরায়-প্রাপ্ত গ্রন্থে প্রকাশ যে, সে সময় তাঁহার কত বয়ঃক্রম ছিল তাহার হিসাব না থাকিলেও, তিনি তখন শতবর্ষেরও অধিক বৃদ্ধ ছিলেন। তাহা হইলে তিনি এখন হইতে ১৭০০।১৮০০ বৎসরের পূর্ব্বেও যে স্থূল শরীরে বিরাজমান ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যদেবের সময়—যাহা সম্রাট সুধন্বা সার্ব্বভৌমের তাম্রশাসন হইতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাও প্রায় ১৭৫৬ বৎসর ; অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাব্দের ২৬৬৩, কার্ত্তিকী শুক্লা পূর্ণিমায় সুধন্বা সার্ব্বভৌমের তাম্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কলির ৬০০ বৎসর গত হইলে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ আরব্ধ হয়। বর্ত্তমান খৃষ্টীয় ১৯১৮ অব্দে কলিগতাব্দ ৫০১৯। ইহা হইতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞকাল ৬০০ বর্ষ বাদ দিলে, ৫০১৯—৬০০ = ৪৪১৯ হয়। আবার ইহা হইতে পূর্ব্বোক্ত ২৬৬৩ বর্ষ অর্থাৎ সুধন্বার তাম্রশাসনকাল বাদ দিলে ১৭৫৬ বৎসর হয়। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য প্রভু ও বৃদ্ধ-ব্রহ্মানন্দদেব এখন হইতে প্রায় সাড়ে সতেরশত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে । "গুরুপ্রদীপের" প্রথমেই "আদিগুরু শ্রীমদ্ বৃদ্ধব্রহ্মানন্দ ঠাকুর ও শঙ্করাবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য দেবের সম্মিলনপ্রসঙ্গে পাঠক উক্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি গঙ্গাসাগর-সম্মিলনের সন্নিকটে গঙ্গাগর্ভে এক দ্বীপের মধ্যে তখন অবস্থান করিতেন। সেই দ্বীপ অতি প্রাচীনকাল হইতে কাকদ্বীপ বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, যখন সূর্য্যবংশাবতংস মহারাজ-সগরের প্রপৌত্র রঘুকুলতিলক ভগীরথ কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া পতিতপাবনী শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীকে মর্ত্তবাসীর সম্পূর্ণ অগোচরে একরাত্রির মধ্যেই এই মর্ত্তধামে আনিয়াছিলেন। তখন ভাগিরথী মাতা তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া বলিয়াছিলেন, যথায় প্রভাত হইবে, সেই স্থান হইতেই আমি অন্তর্হিতা হইব। মহামতি ভগীরথ সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে অতি ব্যগ্র ভাবেই শঙ্খধ্বনিপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে মায়ের পথ-পদর্শকরূপে গমন করিতেছিলেন। উষা সমাগতপ্রায়, সাগর-সঙ্গমের তখনও কিছু বিলম্ব আছে, এমন সময় সাহসা প্রভাতসূচক কাককণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইল। মা জাহ্নবী অমনি পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞামত সেই স্থানেই একবার-প্রদক্ষিণ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তখন ভগীরথ মায়ের অদর্শনে ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া অবিরত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তিবান বালক-পুত্রের সেই করুণ ক্রন্দনে আর বুঝি মা গোপনে থাকিতে পারিলেন না, এইবার মাতৃহৃদয় বিগলিত হইল, সমস্ত দিবসের পর নিশা-সমাগমে মাতা পুনরায় তাঁহাকে সম্মুখে করিয়া সাগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অনতি দূরেই মহামুনি শ্রীমদ্ কপিলের পবিত্র আশ্রমপাদ বিধৌত করিয়া পতিতপাবনী মা আমার ভস্ম-

স্তূপে পরিণত পতিত সগর-সন্তানগণের উদ্ধার করিলেন এই প্রসঙ্গে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ আদিগুরুদেব বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের কৃপায় গঙ্গাসাগর-সঙ্গম ও মহর্ষি কপিলের আশ্রম সম্বন্ধে একটী গূঢ় জ্ঞানতত্ত্বের কথা মনে পড়িল। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের অবগতির জন্য এই স্থলেই তাহা বলিয়া রাখি।

কপিল ও গঙ্গাসাগর-প্রসঙ্গ।

মহর্ষি কপিল আদিজ্ঞানী, সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা ও প্রাচীন মহাপুরুষ। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি সনাতন সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেই তাঁহার জ্ঞান-সম্মানের প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"ঋষি-প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ॥"

স্মৃতিতেও আছে—

"আদৌ যো জায়মানঞ্চ কপিলং জনয়েদৃষিম্।
প্রসূতং বিভৃয়াজ্ জ্ঞানৈস্তং পশ্যেৎ পরমেশ্বরম্॥"

অর্থাৎ যিনি কপিল ঋষিকে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, মনুষ্য সেই পরমেশ্বরকে ধ্যান-যোগে দর্শন করুক। পুরাণেও এই ভাবে কপিলদেবকে আদিবিদ্বান বলিয়াছেন। মহাযোগী শ্রীমদ্ শুকদেবের শিষ্য শ্রীমদ্ গৌড়পূজ্যপাদাচার্য্যদেব বলিয়াছেন— "ব্রহ্মার পুত্র কপিলদেবই আদি সাংখ্য-প্রণেতা, তিনি দ্বাবিংশতি সূত্রাত্মক "তত্ত্বসমাস" নামক আদি সাংখ্যসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যও তাঁহার "শারীরক ভাষ্যে" প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন :—

"কপিলমিতিশ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ অন্যস্য চ কপিলস্য
সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তর্বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ॥"

কপিল সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা ও সগরসন্তানগণের দাহকর্ত্তা, এইরূপ প্রবাদ-বাক্যে মোহিত হইয়া সাধারণে তৎপ্রতি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে উক্ত হইয়া থাকে যে, "সাংখ্য ব্যতীত জ্ঞান নাই" অর্থাৎ সাংখ্যকার সেই আদি কপিল ঋষি হইতেই জ্ঞানের ধারা প্রথম আরব্ধ হইয়াছে। তাঁহার শেষ আশ্রম গঙ্গাসাগর-সঙ্গমেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও প্রতি বৎসর মকর-সংক্রান্তিতে তাঁহারই স্মরণ-পূজা-উপলক্ষে নিত্য-বার্ষিক-কুম্ভরূপে তিন দিবস তথায় এক বিরাট মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে প্রাচীনকাল অবধি নানা প্রদেশের সাধু সজ্জনের সমাগমে জ্ঞানের বিমল আলোচনা ও পরস্পর জ্ঞান-বিনিময়ে সেই পুণ্য-ভূমি কয়েক দিনের তরে তপোবনে পরিণত হইত। তাহার প্রভাব এখনও আংশিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। সাধু-সন্ন্যাসী ব্যতীত অসংখ্য গৃহস্থ নরনারীও সেই পবিত্র গঙ্গাসাগরের মেলায় সমবেত হইয়া একাধারে সাধুদর্শন ও মহাতীর্থ গঙ্গার সাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া পাপ-বিমুক্ত এবং ধন্য হইয়া থাকেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন :—"গঙ্গার পূর্ণ মাহাত্ম্য ও ফল গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বার, গঙ্গা-যমুনাসঙ্গম প্রয়াগ ও গঙ্গা-সাগরসঙ্গমেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

"গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।"

গঙ্গা যেমন পাপনাশিনী, পতিতোদ্ধারিণী, সেইরূপ জ্ঞান-স্বরূপিনী বা জ্ঞান-প্রবাহিনীও বটে।"

শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্যই বলিয়াছেন :—

"জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদি গঙ্গা।"

"* * * ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা॥"

এখন দেখা যাউক ভগীরথ কর্ত্তৃক মর্ত্ত্যে গঙ্গাবতরণের প্রধান কারণ কি?

পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিবরণে জানিতে পারা যায়, মহর্ষি কপিল কর্ত্তৃক ষষ্ঠিসহস্র সগরপুত্র ভস্মীভূত হওয়ায় তাহাদেরই উদ্ধারের জন্য পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ইহার দার্শনিক রহস্যে বা তাৎপর্য্যে বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবীতে কপিলই গঙ্গারূপিনী জ্ঞান-প্রবাহ আনয়নের মূল কারণ হইয়া ষষ্টিসহস্র অর্থাৎ অসংখ্য সগর-সন্তানকে ভস্ম করেন। সগর-সম্ভূত অর্থাৎ স + গর = গরলযুক্ত বা সংসার-মোহে বা পাপে বিমুগ্ধ, এইরূপ সন্তানের বা জীবের অজ্ঞানতা নাশ করিতে মহর্ষি কপিলই প্রথমে যত্ন করেন। স-গর-সঙ্কল্পিত অশ্বমেধ বা একছত্রী আধিপত্য প্রতিষ্ঠারূপ যজ্ঞের অশ্ব অর্থাৎ রজস্তমাত্মক ঘোর অহঙ্কার-পরিপুষ্ট ও সংসার-প্রবৃত্তির একমাত্র মুখপাত্র উদ্দাম অশ্ব-স্বরূপকে সম্মুখে করিয়া যাহারা প্রবল পরাক্রমে প্রধাবিত হইতেছিল, তাহারা ক্রমে এতই মোহান্ধ হইয়া যায় যে, ক্রমে জ্ঞানাধাররূপ কপিলকেও নির্যাতন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহারই ফলে অর্থাৎ জ্ঞানের সম্মুখীন হইয়াই সেসমস্ত অজ্ঞানতা ভস্মীভূত হয়। সেই কারণ কি তিনি সেই জ্ঞান-সঙ্গমে বসিয়া তাঁহার সাংখ্য বা জ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন? শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমংবলম্।
অত্র বঃ সংশয়ো মা ভূদ্ জ্ঞানং সাংখ্যং পরংমতম্॥"

সাংখ্যজ্ঞানের তুল্য জ্ঞান নাই এবং যোগবলের তুল্য বল নাই, এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবে না। সাংখ্যজ্ঞানই প্রধান জ্ঞান। জ্ঞানের অবিরত ধারা যাহা ভগীরথরূপ জ্ঞাতা বা পুরুষার্থ সহযোগে অসংখ্য তরঙ্গমালায় প্রধাবিত হইয়া জ্ঞায়রূপ

অনাদি ও অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রে (ব্রহ্মে) বিলীন হইতেছে, সেই সুপবিত্র সঙ্গমস্থল-সমীপবর্ত্তী নির্ব্বিকল্পপ্রায় সমাধি-ভূমিতেই তাঁহার অন্তিম আশ্রম। সেই স্থান হইতেই তাঁহার সাংখ্যশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়া লৌকিক গঙ্গাসাগর-সঙ্গমাশ্রমে তদীয় শিষ্যমণ্ডলীকর্ত্তৃক ক্রমে "ষষ্টিতন্ত্র" বা সাংখ্যশাস্ত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিল *। একথা দর্শন-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, কপিলদেব প্রকৃত্যাদি যে ষষ্টি অথবা চতুঃষষ্ট সংখ্যক তত্ত্ব বা পদার্থের নিশ্চয় করিয়াছিলেন, সেই ষাট বা চৌষট্টি প্রকার তত্ত্বই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার-রূপে ষাট অথবা চৌষট্টিখানি সাংখ্য-তন্ত্র। তাঁহার প্রশিষ্য পঞ্চশিখ মুনি (কপিলের দুই শিষ্য, আসুরি ও বঢ়ু এবং আসুরের শিষ্য পঞ্চশিখ। "কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা সপ্তৈতে মানসাঃ পুত্রা ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।") তাহা বিস্তৃত করিয়া প্রচার করেন। সেই ষাট্ খানি তত্ত্বোপদেশপূর্ণ অভ্রান্ত বিজ্ঞানালোকের প্রদীপ্ত রশ্মিসমূহের দ্বারাই ষাট হাজার অর্থাৎ অগণ্য-বিন্দুরূপ অন্ধকাররাশি বিনষ্ট হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্য-শাস্ত্র তন্ত্রশাস্ত্রেরই নামান্তর। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় :—

---

* "এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রম্॥ ৭০
শিষ্যপরম্পরাগতমীশ্বরকৃষ্ণেণ চৈতদার্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যক্ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্॥ ৭১
সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি॥ ৭২
সাংখ্যকারিকা।

"সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানা মতানি বৈ॥
সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বেত্তা নান্যঃ পুরাতনঃ॥
অপান্তরতমাশ্চৈব বেদাচার্য্যঃ স উচ্যতে।
প্রাচীনগর্ভং তমৃষিং প্রবদন্তীহ কেচন॥
উমাপতির্ভূতপতিঃ শ্রীকণ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
উক্তবানিদমব্যগ্রো জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ॥
পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বেত্তা তু ভগবান স্বয়ম্॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, বৈশম্পায়ন কহিলেন—হে রাজর্ষে, সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত বা তন্ত্র বিভিন্নমতবিশিষ্ট হইলেও জ্ঞানশাস্ত্র বলিয়াই কথিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সাংখ্যও তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত; কপিলদেব এই সাংখ্যের বা ষষ্ঠিতন্ত্রের বক্তা, পুরাতন পুরুষ ব্রহ্মা যোগবক্তা, অপান্তরতমা ঋষি (ইনি ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপে একজন, পরে ইনিই দ্বাপরের বেদব্যাস) বেদাচার্য্য, ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ মহাদেব (ইনি এক সময় ব্রহ্মাকে বর দিয়াছিলেন, "আমি তোমার পুত্র-রূপে প্রখ্যাত হইব") পাশুপত বা সম্পূর্ণ তন্ত্রশাস্ত্রের বক্তা, ইনিই উমাপতি শ্রীকণ্ঠ এবং ভগবান্ নারায়ণ পঞ্চরাত্রের বক্তা। যাহা হউক শিবোক্ত তন্ত্র-সাধনামূলক শাম্ভবীশাস্ত্র-সম্বন্ধে কথিত আছে যে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল বা যথাক্রমে ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত, ও দাক্ষিণাত্য অথবা বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা ভেদে তিনপ্রস্থ তন্ত্রের উপদেশ প্রচলিত আছে। তাহারও সংখ্যা প্রত্যেক ক্রান্তায় চৌষট্টিখানি করিয়া জানিতে পারা যায়। সেই

সকল সাংখ্যতন্ত্র বা জ্ঞানশাস্ত্র অধুনা প্রায় লুপ্ত অথবা গুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বোচ্চ চারিখানির ত কোন খোঁজই নাই, তাই পঞ্চশিখ মুনি ষাট খানি প্রকাশ করিয়াছেন, আর বাকি চারিখানি "গূঢ় সাধনশাস্ত্র" বলিয়া তাহা প্রকাশ করেন নাই। তাহা সম্পূর্ণ সমুন্নত-গুরুমুখগত হইয়াই আছে। উক্ত ষাটখানির মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষ-আদি মৌলিক জ্ঞান বিষয়ে দশখানি, তদ্বিপর্য্যয় অর্থাৎ অপ্রকৃতি বা অবিদ্যা বা অজ্ঞান বিষয়ে পাঁচখানি, সন্তোষ অর্থাৎ অলং বুদ্ধিবিষয়ে নয়খানি, ইন্দ্রিয়া সামর্থ্য বিষয়ে আটাশখানি, এবং সিদ্ধি অর্থাৎ ক্ষমতা বিষয়ে আটখানি, এই মোট ষাটখানি তন্ত্র* "ষষ্টিতন্ত্র-নামে" কপিলের পরবর্ত্তী সময়েও প্রচলিত ছিল। অবশিষ্ট চারি খানির বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি সম্পূর্ণ যে গুরুমুখী ভাবে গুপ্ত রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন। তাহা অব্যক্ত, শ্রীগুরুর আজ্ঞায় আজ্ঞাচক্রের উপরে অনুভাব্য। ফলকথা মহর্ষি কপিল বেদ-বিজ্ঞান-বক্তা ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে জগতের অসংখ্য অজ্ঞানতা বিনাশক জ্ঞানতন্ত্রের বা সাংখ্যের প্রথম প্রচারকরূপে প্রকৃতিকে অর্থাৎ মূল-ব্রহ্মশক্তিকে সম্যক্ প্রকারে জানিয়া পরমতত্ত্ব অর্থাৎ পরমপুরুষ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ "লীলোন্মুক্তি" নামক পূর্ব্ববর্ণিত রাজযোগের চতুর্থ জ্ঞানভূমির উপদেশমূলক পূর্ব্বকথিত ষষ্টি-সংখ্যক বা ষষ্টির সমাহারভূত সাংখ্য-সূত্রের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাংখ্যশাস্ত্র ষষ্টিতন্ত্র নামে প্রখ্যাত, তিনি ষষ্টিবিধ তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা, আবার ষষ্টিসহস্র সগর-পুত্রের নিধনকর্ত্তাও তিনিই।

---

*পুরুষঃপ্রকৃতির্ব্বুদ্ধিরহঙ্কারো গুণাস্ত্রয়ঃ।
তন্মাত্রমিন্দ্রিয়ং ভূতং মৌলিকার্থাঃস্মৃতাদশ॥
বিপর্য্যয়ঃ পঞ্চবিধ স্তথোক্তা নব তুষ্টয়ঃ।
করণানামসামর্থ্যমষ্টাবিংশতিধামতম্।
ইতিষষ্টিঃ পদার্থানামষ্টাভিঃ সহ সিদ্ধিভিঃ॥

অন্যদিকে ক্রান্তি-বিভাগ অনুসারেও তন্ত্রসংখ্যা প্রত্যেক ক্রান্তায় চতুঃষষ্টি*। এইরূপ সকল দিক হইতেই ষষ্টি-সংখ্যার মিলনও যে এক অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ ব্যপার তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার কৃপা হইলে সাধকের কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকিবে না।

শ্রীভগবান্ কপিলের সেই জ্ঞান প্রবাহের লৌকিক ভূমিই পূর্ব্বকথিত গঙ্গাসাগর সঙ্গম। প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভগীরথ জ্ঞাতারূপে পুরুষার্থ-সহযোগে মহর্ষির সাংখ্য বা তন্ত্রশাস্ত্ররূপ জ্ঞান-প্রবাহ মর্ত্ত্যে আধিদৈবিক ভাবে আনয়ন করিয়াছেন। গঙ্গাই যে জ্ঞানরূপে তন্ত্রস্বরূপিণী তাহা মহাতপা ভগীরথ তাঁহার কৃত গঙ্গাস্তবেই খুলিয়া বলিয়া দিয়াছেন—

"তন্ত্রময়ী তন্ত্ররূপা তন্ত্রজাপ্যা মহেশ্বরী।
বিষ্ণুভেদদ্রবাকারা শিবগানা মৃতোদ্ভবা॥
ইদং সহস্রনামাখ্যং পুরাভগীরথৈঃ কৃতং।
ভগবত্যা হি গঙ্গায়া মহাপুণ্যং জয়প্রদং॥"

যাহা হউক এই সাগর সঙ্গমের সমীপবর্ত্তী সেই দ্বীপাকার স্থানটী তন্ত্রময়ী ও তন্ত্ররূপা মাতা গঙ্গাদেবীর সহসা অন্তর্দ্ধ্যানের

---

*"ত্রিষষ্টি চতুরাস্তন্ত্রাঃ ক্রান্তি ভাগে প্রচারিতাঃ।"

ষড়াম্নায় তন্ত্র।

সিদ্ধসার, স্বতন্ত্র, মহাসিদ্ধসার ও শক্তিযামলাদি তন্ত্রে উক্ত ক্রান্তি-বিভাগ ও প্রত্যেক ক্রান্তায় বিভক্ত চতুঃষষ্টি তন্ত্রের বিস্তৃত উল্লেখ আছে।

শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যদেবও তাঁহার 'আনন্দলহরী' স্তোত্রে উক্ত চতুঃষষ্ট তন্ত্রের সমর্থন করিয়াছেন।

"চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ সকলমভিসন্ধায় ভুবনং।
স্থিতস্তত্তৎ সিদ্ধিপ্রসবপরতন্ত্রঃ পশুপতিঃ।

হে মাতঃ! ভগবান্ ভূতভাবন মহাদেব চতুঃষষ্টি সংখ্যক তন্ত্রের দ্বারা বিশ্বের সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, যাহা দ্বারা যাহা সিদ্ধ হইবে, তাহারই কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

স্মৃতিরক্ষাকল্পে এযাবৎ "কাকদ্বীপ" নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

পরম পূজ্যপাদ আনন্দরাজ্যের সেই আদিগুরুদেব চির প্রসিদ্ধ এই কাকদ্বীপেই সতত অবস্থান করিতেন; তাঁহার না ছিল গৃহ, না ছিল কোনও অবলম্বন! এক প্রাচীন বট বৃক্ষমূলে পতিত একখণ্ড অসমতল বিশাল শিলাসনের উপরেই তিনি সতত উপবিষ্ট থাকিতেন। তাহাই তাঁহার আশ্রম বা তাঁহার "আনন্দমঠ!" পার্শ্বে এক স্বচ্ছসলিল সরোবর। বৃদ্ধ ঠাকুর সেই স্থানে বসিয়াই আত্মারাম হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকিতেন। প্রাচীন কাল হইতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে মকরসংক্রান্তিতে সাধু ও গৃহস্থদিগের যে বিরাট মেলার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা বার্ষিক নিত্য কুম্ভ বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধ। তথায় সমাগত সাধুদিগের ধর্ম্মালোচনা শুনিয়া, তাঁহাদের সেবা করিয়া গৃহস্থগণও কৃতকৃতার্থ হন। মকরসংক্রান্তির সময় এই কাক-দ্বীপেও এক মেলা হয়, এখানেও গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগত বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। ইহা "বুড় বা বুড়ির মেলা" বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধ। 'বুড়া' বা 'বুড়ি' শব্দ শ্রীমদ্ বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দের সংক্ষেপ অপভ্রংশ মাত্র। লোকে সেই অতিবৃদ্ধ মহাপুরুষের এই শেষস্মৃতিমাত্র এখনও রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই মেলার মূল কারণস্বরূপ তাঁহাকে সকলেই একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। সে যাহাহউক, তাঁহার অন্তর্দ্ধানের অনেক পূর্ব্বেই শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্যদেব স্বীয় কর্ত্তব্য-সমাপন করিয়া নবীন বয়সে কৈলাসযাত্রা করেন। তৎপ্রবর্ত্তিত মঠ-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় উত্তরোত্তর ক্রমেই পুষ্ট হইতে লাগিল। গঙ্গা-সাগরের মেলায় বা নিত্য-কুম্ভে নবোদ্দীপ্ত উক্ত সন্ন্যাসির দলও

এবং প্রাচীন সন্ন্যাসীগণ পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। তাহাতে কে কোন মঠের শিষ্য, কাহার কি পরিচয়, কোন অধিকার, ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। সকলেই-নবোদ্যমে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মর্য্যাদা-বৃদ্ধিপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চারি মঠের কোন না কোনটীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া ক্রমে পরিপুষ্ট হইতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে এক দিন পূজ্যপাদ বৃদ্ধ ঠাকুরের কতিপয় উচ্চতর জ্ঞানাধিকারী শিষ্য ঠাকুরের নিকট সমবেত হইয়া তাঁহাদের মঠাদির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে বৃদ্ধঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দদেব ও মঠাম্নায় রহস্য।

তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর! আজকাল প্রায় সকল সন্ন্যাসী ও সাধুই এমন কি আমাদেরও শিষ্য বর্গ ভিন্ন ভিন্ন মঠাদির উল্লেখ করিয়া বেশ স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করে, কিন্তু আমরা কয়েকজন জিজ্ঞাসিত হইলে কোনও উত্তর দিতে পারি না—আমাদের আশ্রম-পরিচায়ক কি কোনও মঠ আছে? অথবা আমরা এখন কোন মঠের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিব?"

ঠাকুর বলিলেন—"তোদের শিষ্যেরা ঐরূপ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যে যে মঠের পরিচয় দেয় দিক্ ভালকথা! তবে তোরা—তোরা আনন্দমঠের শিষ্য।"

শিষ্যগণ তখন উৎকণ্ঠিত ভাবে নিবেদন করিলেন—"সে মঠ কোথায় প্রভো?"

ঠাকুর আজ্ঞা করিলেন—"আঃ তোরা ত ব্যাস্ত করে তুল্লি দেখ্ছি! এই, এই যে এমন মঠ দেখছিস্ না?" বলিয়া নিজ-দেহ

দেখাইয়া দিয়া পুনরায় বলিলেন—"তোদের ঘর বাড়ী সব ঘুচিয়ে, পিতা-মাতার কুল-পরিচয় পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে, বর্ণ-চিহ্নও বিনষ্ট করে সন্ন্যাসী করে দিয়েছি, নামরূপের অতীত বস্তুর উপদেশ দিয়েছি, আবার কি ইট, কাঠ, পাথরের মধ্যে তোদের পুর্‌তে পারি? তোদের মঠ নয় রে, তোদের পক্ষে মাঠ, তোদের মুক্ত ময়দান! বৃক্ষমূল তোদের আশ্রয়, ধূলি ধূসর তোদের শয্যা, অযাচিত-লব্ধ বস্তুই তোদের নির্ব্বিকার ভাবে সেব্য, ভাবাভাব পরিত্যাগ করে, যাহা কিছু তোদের প্রারব্ধে আছে, সব ভোগ করে যা! এই, এই দেহই তোদের মঠ, যে দিন তাঁর কৃপায় শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে অন্তর ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হয়ে যাবে, সেই দিনই তোদের "আনন্দমঠ" দর্শন হবে, সেই দিনই তোরা আপনার আপনার আনন্দমঠের অধীশ্বর হবি, জগদ্‌গুরু হবি! বুঝ্‌লি? তোদের আবার পরিচয় কি? তোরা যে পরমহংস-কোটীর মধ্যে এসে পড়েছিস্, তোরা যে পরিচয়ের অতীত অবস্থার পুরুষ! যেখানে পরিচয়, সেইখানেই সাম্প্রদায়িক ভাব, সেইখানেই অভিমানের সৃষ্টি, সেইখানেই অনাদি ও অনন্ত ছেড়ে ক্ষুদ্র গণ্ডির বেষ্টন, সেখানে ঢুক্‌লে যে তোদের বিরাট আদর্শ ক্রমে ক্ষুদ্র হয়ে যাবে? দেখছিস্ না! বর্ত্তমান সময়ে সাধকসমাজ ও সন্ন্যাসীদের কি প্রকার অধঃপতন আর দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়েছে? তাই তাদের কতকগুলা কঠিন বিধি-নিয়মের পাশে বন্ধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, তাই শ্রীমান্ শঙ্করের এই সব মঠের প্রতিষ্ঠা! নতুবা যে সব মঠের কথা তোম্‌রা আজ কাল শুনছ, সে গুলির প্রতিষ্ঠাতা হয়ে আমার "শঙ্কর বাবাজী" স্বয়ং তবে কোন্‌টীর শিষ্য হবে? আর আপূর্ব্ব গুরু-পরম্পরাই বা কোন্ মঠের

শিষ্য ছিলেন? এরা সকলেই যে সেই একমাত্র "আনন্দমঠেরই" শিষ্য ছিলেন বাবা! যখন তোম্‌রা একান্তই ব্যস্ত হয়ে পড়েছ, তবে আরও দুটো কথা বলি, মন দিয়ে শোন।

"সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট প্রণবের* কথা তোমাদের নিশ্চয় স্মরণ আছে। প্রণবের সেই সাত অঙ্গকেই অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে 'সপ্তাম্নায়' বলা হইয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞান ও যোগাদির উপদেশ দিবার কারণ এই সাত আম্নায়ই যথাক্রমে সাতটী মঠের পরিকল্পনা মাত্র। পরম প্রিয়তম শঙ্করাচার্য্য সেদিন ঐ আম্নায়-বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্যই শিবোক্ত প্রথম চারিটী মঠের অনুকল্প-স্বরূপ চারিটী স্থূল মঠের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাতে বর্ত্তমান সাধারণ সাধুমণ্ডলীর যথেষ্ট উপকার হইবে। কিন্তু অবশিষ্ট তিনটী মঠ অব্যক্তই আছে। শঙ্করাচার্য্য তাহা জানিয়াও অসময়ে তাহা স্পষ্ট বা প্রকাশ করিলেন না। এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে সাতটী মঠেরই আম্নায়-বৃত্তান্ত বা পরিচয় দিতেছি, শ্রবণ কর। প্রত্যেক মঠেই এক এক আম্নায়ের উপদেশ ও যোগাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম চারি আম্নায়ের উপদেশাদি ব্যক্ত; সেই উপদেশ-চতুষ্টয়ই শ্রীমান্ শঙ্কর-বাবাজী স্পষ্টতররূপে প্রকাশ করিয়া ও তাহার স্থূল প্রতিষ্ঠা করিয়া আচার্য্যরূপে পরিচিত হইলেন।

"ভারতে অনাদি কাল হইতে কল্প-কল্পান্তে আচার্য্য-পঙ্‌ক্তি চলিয়া আসিতেছে, তাঁহারাই যথাকালে আবির্ভূত হইয়া অদ্বৈত-তত্ত্ব-মূলক আম্নায়াদির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কারণ শ্রীমান্ শঙ্কর বর্ত্তমান সময়ের আচার্য্য হইয়াছেন। সত্যযুগে তিনজন আচার্য্য ছিলেন। প্রথম দেবাদিদেব বৃষভবাহন মহাদেব;

* 'প্রণবরহস্য" দেখ।

দ্বিতীয়, বেদবিধির আধার নীলকান্তমনিকান্তি বিষ্ণু; ও তৃতীয় বেদবক্তা চতুর্ব্বক্ত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা। এইরূপ ত্রেতাযুগেও তিন জন আচার্য্য হন। প্রথমে শ্রীমন্মহর্ষি বশিষ্ঠদেব, পিতামহ ব্রহ্মার নিকট এই গুহ্য বিষয়ের উপদেশ লাভ করিয়া আচার্য্য হন। তিনি মহর্ষি শক্তিকে উপদেশ দিয়া দ্বিতীয় আচার্য্য পদে স্থাপিত করেন; শক্তি আবার মাতৃগর্ভস্থিত পরাশরকে এই গূঢ় বিষয় শিক্ষা দিয়া তৃতীয় আচার্য্যের স্থানে তাঁহাকে স্থাপনা করিয়াছিলেন। অনন্তর দ্বাপরে দুইজন আচার্য্য হন। প্রথম মহর্ষি ব্যাস, মহর্ষি পরাশরের নিকট হইতে শিক্ষিত হইয়া আচার্য্য হন; তাহার পর তিনি শুকদেবকে উপদেশান্তে দ্বিতীয় আচার্য্য-পদে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পর এই কলিযুগে সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়-কল্পে শুকদেব-শিষ্য গৌড়পূজ্যপাদাচার্য্য প্রথম; গোবিন্দপূজ্যপাদাচার্য্য দ্বিতীয়; এবং বর্ত্তমান সময়ে শঙ্করাচার্য্য তৃতীয় আচার্য্য হইয়া দ্বিতীয়ের অনুরূপ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক সেই "গৌড়পূজ্যপাদীয় আগম" দর্শনকে আদর্শ করণান্তর "শারীরক সূত্রে" ভাষ্য রচনা করিয়া ও দ্বৈতমত খণ্ডনপূর্ব্বক "বেদান্তার্ক" নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত ব্যক্ত আম্নায়-চতুষ্টয়ের প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়া স্বীয় আচার্য্যপদের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সত্যযুগ হইতে আচার্য্য-পংক্তিতে ইনি একাদশ আচার্য্য হইলেন। অতঃপর শঙ্করাচার্য্যের চারি শিষ্য সেই আম্নায়-নির্দ্দিষ্ট স্থূল চারিটী মঠে উপবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব মঠের ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য বলিয়াই কীর্ত্তিত হইবেন। উহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও উপদেশ শিথিল হইয়া আসিলে, আশ্রম-কলঙ্করূপ নামধারী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে জগৎ ভরিয়া যাইবে, তখন পুনরায় জগদ্গুরুরূপে

দ্বাদশ আচার্য্যের আবির্ভাব হইবে। সেই প্রবল কলির প্রবৃত্তি-সময়ে অব্যক্ত বিষয়কে ব্যক্ত করিয়া তিনি শিবোক্ত আগমাদেশ প্রতিষ্ঠা করিবেন। "ব্যক্তির্ভবিষ্যদচিরাৎ সম্বৃত্তে প্রবলে কলৌ॥"

"যাহাহউক শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্যের এই স্থূল মঠাম্নায়-চতুষ্টয়-বিষয়ে তোমরা বোধ হয় সমস্তই জানিতে পারিয়াছ। কিন্তু উহার সূক্ষ্ম পরিচয় সম্বন্ধে তোমাদের ঠিক জানা নাই, আমি সংক্ষেপে সমস্তই বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্যক্ত-মঠের স্থূল পরিচয়গুলি প্রথমে বলিয়া উহাদের সূক্ষ্ম পরিচয়গুলি পরে পরে বলিতেছি। তাহার পর অব্যক্ত-মঠ তিনটীর স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় পরিচয়ই দিব।

"ব্যক্ত মঠাম্নায়-চতুষ্টয়ের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিচয়।

প্রথমাম্নায়।

স্থূল পরিচয়।	সূক্ষ্ম পরিচয়।
আশ্রম—পশ্চিম,	গুরু—ব্রহ্মা,
মঠ—সারদা,	ঋষি—তৎপুরুষ,
ক্ষেত্র—দ্বারকা,	উপদেশ—সৃষ্টি,
তীর্থ—গোমতী,	গম্য—কুণ্ডলিনী বা প্রকৃতি,
দেবতা—সিদ্ধেশ্বর,	যোগ—মন্ত্র ও হঠ,
দেবী—ভদ্রকালী,	সাত্ত্বিককরণ—নাসিকা,
আচার্য্য—বিশ্বরূপ বা হস্তামলক,	রাজসিককরণ—পাদ,
ব্রহ্মচারী—স্বরূপ,	চক্র—মূলাধার,
সম্প্রদায়—কীটবার,	মূর্ত্তি—পৃথিবী,
বেদ—সাম,	ব্রহ্মা—(অ),
গোত্র—অবগত,	অনুভূতি—ন্যায়-দর্শন,
মহাবাক্য—"তত্ত্বমসি",	জ্ঞানদা—প্রথম-জ্ঞানভূমি,
পদ*—তীর্থ ও আশ্রম।	কার্য্য—তত্ত্বমসি-বিচার।

* এই চারি আম্নায়েরই পদ-পরিচয়গুলি পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যদেবের শিষ্যানুশিষ্যগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে

দ্বিতীয়াম্নায়।

স্থূল পরিচয়।
আশ্রম—পূর্ব্ব,
মঠ—গোবর্দ্ধন,
ক্ষেত্র—পুরুষোত্তম,
তীর্থ—মহোদধি,
দেবতা—জগন্নাথ,
দেবী—বিমলা,
আচার্য্য—বলভদ্র, তুঙ্গ বা পদ্মপাদ,
ব্রহ্মচারী—প্রকাশ,
সম্প্রদায়—ভোগবার,
বেদ—ঋক্,
গোত্র—কাশ্যপ,
মহাবাক্য—"প্রজ্ঞানমানন্দব্রহ্ম,"
পদ*—বন ও অরণ্য।

সূক্ষ্ম পরিচয়।
গুরু—বিষ্ণু,
ঋষি—অঘোর,
উপদেশ—স্থিতি,
গম্য—পরমাত্মা,
যোগ—ভক্তি বা লয়,
সাত্ত্বিককরণ—জিহ্বা,
রাজসিককরণ—উপস্থ,
চক্র—স্বাধিষ্ঠান,
মূর্ত্তি—জল,
বিষ্ণু—(উ),
অনুভূতি—বৈশেষিক-দর্শন,
সন্ন্যাসদা—দ্বিতীয়-জ্ঞান-ভূমি,
কার্য্য—প্রজ্ঞানব্রহ্ম-চিন্তা।

তৃতীয়াম্নায়।

স্থূল পরিচয়।
আশ্রম—উত্তর বা বদরিকা,
মঠ—জ্যোতিঃ বা জোশি,
ক্ষেত্র—মুক্তি,
তীর্থ—অলকনন্দা,
দেবতা—নারায়ণ,
দেবী—পুণ্যাগিরি,
আচার্য্য-নরটক বা ত্রোটক
ব্রহ্মচারী—আনন্দ
সম্প্রদায়—আনন্দবার,

সূক্ষ্ম পরিচয়।
গুরু—রুদ্র,
ঋষি—সদ্যোজাত,
উপদেশ—সংহার,
গম্য—কাল,
যোগ—ক্রিয়া ও লক্ষ্য,
সাত্ত্বিককরণ—চক্ষু,
রাজসিককরণ—পাণি,
চক্র—মণিপুর,
মূর্ত্তি—তৈজস বা অগ্নি,

স্থূল পরিচয়।	সূক্ষ্ম পরিচয়।
বেদ—অথর্ব্ব,	রুদ্র—(ম),
গোত্র—ভৃগু,	অনুভূতি—যোগ-দর্শন,
মহাবাক্য "অয়মাত্মাব্রহ্ম"	যোগদা—তৃতীয় জ্ঞানভূমি,
পদ* —গিরি, পর্ব্বত ও সাগর।	কার্য্য—জ্ঞান-ধ্যান-প্রকাশ।

চতুর্থাম্নায়।

স্থূল পরিচয়।	সূক্ষ্ম পরিচয়।
আশ্রম—দক্ষিণ,	গুরু—ঈশ্বর,
মঠ—শৃঙ্গেরী,	ঋষি—বামদেব,
ক্ষেত্র—রামেশ্বর,	উপদেশ—অনুগ্রহ,
তীর্থ—তুঙ্গভদ্র,	গম্য—বিজ্ঞান,
দেবতা—আদিবরাহ,	যোগ—জ্ঞান ও উর বা রাজ,
দেবী—কাম্যাখ্যা,	সাত্ত্বিককরণ—ত্বক্,
আচার্য্য—পৃথীবর বা সুরেশ্বর,	রাজসিককরণ—পায়ু,
ব্রহ্মচারী—চৈতন্য,	চক্র—অনাহত,
সম্প্রদায়—ভুরিবার,	মূর্ত্তি—বায়ু,
বেদ—যজুঃ,	নাদরূপ ঈশ্বর—(৮)
গোত্র—ভূর্ভুব,	অনুভূতি—সাংখ্য-দর্শন,
মহাবাক্য—"অহং ব্রহ্মোস্মি	লীলোন্মুক্তি—চতুর্থ-জ্ঞান-ভূমি,
পদ*—সরস্বতী, ভারতী ও পুরী।	কার্য্য—জ্ঞানধর্ম্মাচরণ।

"অব্যক্ত" মঠাম্নায়-ত্রয়ের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিচয়।

পঞ্চমাম্নায়।

স্থূল পরিচয়।	সূক্ষ্ম পরিচয়।
আশ্রম—ঊর্দ্ধ,	গুরু—মহেশ্বর,
মঠ—সুমেরু,	ঋষি—ঈশান,
ক্ষেত্র—কৈলাস বা কৈবল্য,	উপদেশ—অনুভব,
তীর্থ—ত্রিবেণী বা সুমানস,	গম্য—শূন্য,
দেবতা—নিরঞ্জন,	যোগ—বাসনা, পরা ও সন্ন্যাস,
দেবী—মায়া,	সাত্ত্বিককরণ—কর্ণ,
আচার্য্য—ঈশ্বর,	রাজসিককরণ—বাক্,
অবস্থা—ব্রহ্মচর্য্যাতীত,	চক্র—বিশুদ্ধ,
সম্প্রদায়—কাশিকা,	মূর্ত্তি—আকাশ,
বেদ—বেদাতীত,	বিন্দুরূপ মহেশ্বর—(•),
গোত্র—পরব্রহ্ম,	অনুভূতি পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন,
সন্ন্যাস—সংহারক্রম,	সংপদা—পঞ্চম-জ্ঞানভূমি,
	স্বরূপ—পরমানন্দ,

ষষ্ঠাম্নায়।

স্থূল পরিচয়।	সূক্ষ্ম পরিচয়।
আশ্রম—গুপ্ত,	গুরু—পরশিব
মঠ—পরমাত্মা,	ঋষি—নীলকণ্ঠ,
ক্ষেত্র—মানস-সরোবর	উপদেশ—নিরনুভব,
তীর্থ—ত্রিপুটী বা ত্রিকোটী	গম্য—ব্রহ্ম,
দেবতা—পরমহংস,	যোগ—অমনস্ক,
দেবী—মানসীমায়া	সাত্ত্বিককরণ—মন,
আচার্য্য—অদ্বিতীয়চৈতন্য,	রাজসিককরণ—প্রাণ
অবস্থা—ব্রহ্মচর্য্যাতীত,	চক্র—আজ্ঞা

স্থূল পরিচয়।

সম্প্রদায়-সত্য বা সৎসন্তোষ,
বেদ—বেদাতীত,
গোত্র—পরব্রহ্ম,
মহাসন্ন্যাস।

সূক্ষ্ম পরিচয়।

মূর্ত্তি—মন,
কলা-স্বরূপ পরশিব,
অনুভূতি—মধ্য বা ভক্তি-
মীমংসা-দর্শন,
আনন্দপদা—ষষ্ঠ-জ্ঞানভূমি,
জীবন্মুক্ত মহাপূর্ণ পরমহংস।

সপ্তমাম্নায়।

স্থূল পরিচয়।

আশ্রম—নিষ্কল,
মঠ—আনন্দ,
ক্ষেত্র—অনুভূতি,
তীর্থ—নাদ,
দেবতা—বিশ্বরূপ,
দেবী—চিৎশক্তি,
আচার্য্য—সদ্‌গুরু,
অবস্থা—ব্রহ্মচর্য্যাতীত,
সম্প্রদায়—শ্রীব্রহ্মানন্দ,
বেদ—বেদাতীত,
গোত্র—পরব্রহ্ম,
মহাসন্ন্যাস—পূর্ণানন্দক্রম,

সূক্ষ্ম পরিচয়।

গুরু—পরমশিব,
ঋষি—চৈতন্য,
উপদেশ—পরমব্যোম,
গম্য—পরব্রহ্ম বা পরমব্যোম
যোগ—সহজ ও মোক্ষ,
সাত্বিককরণ—সমাধি,
রাজসিককরণ—মৃত্যু,
চক্র—সহস্রার,
মূর্ত্তি—তূরীয়,
কলাতীত বা ওতপ্রোত-
জড়িতপরব্রহ্ম ও পরমা-
অনুভূতি উত্তর-প্রকৃতি
বা ব্রহ্ম-মীমাংসা-দর্শন,
পরাৎপরা—সপ্তম জ্ঞানভূমি,
সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম মহাপুরুষ।

মঠাম্নায় সেতু।*

প্রথমাম্নায় :—

"প্রথমঃ পশ্চিমাম্নায়ঃ সারদা মঠ উচ্যতে।
কীটবারঃ সম্প্রদায়স্তীর্থাশ্রম পদে উভে॥
দ্বারিকাখ্যং হি ক্ষেত্রং স্যাদ্দেবঃ সিদ্ধেশ্বরঃ স্মৃতঃ।
ভদ্রকালী তু দেবী স্যাদাচার্য্যো বিশ্বরূপকঃ।
(দেবঃসিদ্ধেশ্বরঃ শক্তির্ভদ্রকালীতি বিশ্রুতা।)
বিখ্যাতং গোমতী তীর্থং ব্রহ্মচারী স্বরূপকঃ।
সামবেদঃ প্রপাঠ্যশ্চ তত্র ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥
জীবাত্মপরমাত্মৈক্য বোধো যত্র ভবিষ্যতি।
তত্ত্বমসি মহাবাক্যং গোত্রাবগত উচ্যতে॥"

দ্বিতীয়াম্নায় :—

"দ্বিত্রীয়ঃ পূর্ব্বদিগ্ ভাগে গোবর্দ্ধন মঠঃ স্মৃতঃ।
ভোগবারঃ সম্প্রদায়ো বনারণ্য পদে তথা॥
পুরুষোত্তমং তুক্ষেত্রং স্যাজ্জগন্নাথোঽস্য দেবতা।
বিমলাখ্যাহি দেবীস্যাদাচার্য্য পদ্মপাদকঃ॥
তীর্থং মহোদধিঃ প্রোক্তং ব্রহ্মচারী প্রকাশকঃ॥
মহাবাক্যং চ তৎপ্রোক্তং প্রজ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞকম্॥
ঋগ্ বেদপঠনং চৈব সদা গুরুসুসেবিতং।
কাশ্যপ গোত্র মাখ্যাতং তত্র ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥"

তৃতীয়াম্নায় :—

'তৃতীয়স্তুত্তরাম্নায়ো জ্যোতির্নাম মঠোভবেৎ।
আনন্দবারো বিজ্ঞেয়ঃ সম্প্রদায়োঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
পদানি তস্য নামানি গিরি পর্ব্বত সাগরাঃ।

---

* পরম পুজ্যপাদ গোবর্দ্ধন মঠের বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্য শ্রীমৎ মধুসূদন তীর্থ-স্বামী মহারাজের শ্রীমুখাৎ শ্রুত।

বদরিকাশ্রমঃ ক্ষেত্রং দেবো নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥
পুণ্যাগিরি চ দেবী স্যাদাচার্য্য স্ত্রোটকঃ স্মৃতঃ।
তীর্থং ত্বলকনন্দাখ্যানন্দাখ্যো ব্রহ্মচার্য্যভূৎ ॥
অয়মাত্মাব্রহ্মচেতি মহাবাক্য মুদাহৃতং।
অথর্ব্ব বেদ বক্তা চ ভৃগ্বাখ্যো গোত্র উচ্যতে ॥"

চতুর্থাম্নায় :—

"চতুর্থো দক্ষিণাম্নায়ঃ শৃঙ্গেরী তু মঠোভবেৎ।
ভূরিবারাহ্বয়স্তস্য সম্প্রদায়ঃ শুশোভনঃ ॥
সরস্বতী ভারতী চ পুরী ত্রিণি পদানিচ।
রামেশ্বরোহ্বয়ং ক্ষেত্রমাদিবরাহ (নারায়ণ) দেবতা।
কামাখ্যেতীসা দেবী স্যাৎ সর্ব্বকাম ফলপ্রদা।
পৃথীধরাখ্যস্তাচার্য্যস্তুঙ্গভদ্রেতিতীর্থকং ॥
চৈতন্যাখ্যো ব্রহ্মচারী যজুর্ব্বেদস্য পাঠকঃ।
অহংব্রহ্মাস্মি তত্রৈব মহাবাক্যং সমীরিতং ॥"

পঞ্চমাম্নায় :—

"পঞ্চম স্তূর্দ্ধ্ব আম্নায়ঃ সুমেরু মঠউচ্যতে।
সম্প্রদায়ো (পিণাকা) কাশিকস্যাৎ পদংনামাভিধং স্মৃতম্ ॥
(কৈবল্য) কৈলাসক্ষেত্রমিত্যুক্তং দেবতাঽস্য নিরঞ্জনঃ।
দেবীমায়া তথাচার্য্য ঈশ্বরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
তীর্থং (সুমানসং) ত্রিবেনীচ প্রোক্তং ত্রৈলোক্য শরণং মহৎ।
তত্র সংহারমার্গেণ সন্ন্যাসং মহদাশ্রয়েৎ ॥"

ষষ্ঠাম্নায় :—

"ষষ্ঠেত্বাত্মনিচাম্নায়ে পরমাত্মা মঠোমহান্।
(সত্য) সংসন্তোষঃসম্প্রদায়ঃ পদংযোগমনুস্মরন্ ॥

তস্মিন্ (মানস) সরোবরঃ প্রোক্তঃ পরমহংসোঽস্য দেবতা।
দেবী স্যান্মানসীমায়া প্যাচার্য্যশ্চেতনা হ্যয়ঃ।
ত্রিপুটী (ত্রিকোটী) তীর্থমিত্যুক্তং সর্ব্বপুণ্যপ্রদায়কম্।
ভবপাশ বিনাশায় সন্ন্যাসং মহদাশ্রয়েৎ॥"

সপ্তমাম্নায়ঃ—

"সপ্তমে নিষ্কলাম্নায়ে শুদ্ধশ্রী আনন্দমঠঃ।
সম্প্রদায়ো ব্রহ্মানন্দঃ শ্রীগুরোঃ পাদুকে তথা॥
তত্রানুভূতিঃ ক্ষেত্রং স্যাদ্বিশ্বরূপোঽস্য দেবতা।
দেবী চৈতন্যশক্তিঃ স্যাদাচার্য্যঃ সদ্‌গুরুস্ততঃ॥
নাদস্য শ্রবনং তীর্থং জন্মমৃত্যুবিনাশনম্॥
পূর্ণানন্দ ক্রমেনৈব সন্ন্যাসং তত্রচাশ্রয়েৎ॥"

পূজ্যপাদ বৃদ্ধঠাকুর এই সপ্তাম্নার বা সপ্তমঠের স্থূল ও সূক্ষ্ম সকল পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন—"এখন তোমাদের আনন্দমঠ কোথায়, বিচার করিয়া দেখ দেখি বাবা! এই সাত মঠের সূক্ষ্ম-সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলেই যে কোনও সাধক একদিন এই অন্তিম "আনন্দমঠের" অধিকারী হইতে পারে।"

শিষ্যগণ আদিগুরু ব্রহ্মানন্দদেবের এই অপূর্ব্ব উপদেশামৃত তদ্‌গত চিত্তে পান করিয়া পরম পুলকিত হৃদয়ে তদীয় চরণপ্রান্তে প্রণিপাত করিলেন। ঠাকুর সকলকে " ওঁ হংসঃ নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রতিনমস্কারপূর্ব্বক "স্বভাবেন সুখংচর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব উপদেশপূর্ণ আম্নায়-সপ্তকের বিষয় আলোচনা করিলে, মহাপূর্ণ-পরমহংস-আশ্রমের উচ্চতম অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। তখন বাস্তবিক সে সকল স্থূল ও আধিভৌতিক বিষয়যুক্ত সাম্প্রদায়িক দ্বেষ এবং

অভিমান-সমন্বিত মঠাদির প্রতি আর কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকিতে পারে না। সে সময় সেই সপ্তমাম্নায়োক্ত অন্তিম আনন্দমঠই পরমহংস-প্রবরের এক মাত্র আশ্রয়স্থল হয়।

সম্পূর্ণ কামনা-পরিশূন্য কেবল কৌপীনমাত্রধারী এইরূপ পরমহংস মহাত্মাই যে প্রকৃত আনন্দমঠের সেবক ও পরম ভাগ্যবান মহাপুরুষ, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যদেবও তাই বলিয়াছেন :—

বেদান্তবাক্যেষু সদারমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
মূলংতরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
ব্রহ্মক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তোব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

যিনি বেদান্তসিদ্ধ ব্রহ্মবাক্যে সতত রমণ করেন, যিনি শোক-বিকার-বিহীন হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে নিয়ত বিচরণ করেন, যিনি কেবল কোপীনধারী, তিনিই ভাগ্যবান পুরুষ। বৃক্ষমূল-মাত্র যাঁহার আশ্রয়স্থল, যাঁহার হস্তদ্বয় কেবল ভোজ্যবস্তু আহরণের জন্য নহে এবং বিলাস-লক্ষ্মীকে যিনি ছিন্ন কন্থার ন্যায় অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, সেই কৌপীনধারী মহাপুরুষই যথার্থ ভাগ্যবান। যিনি আত্মানন্দে সর্ব্বদা পরিতুষ্ট, ইন্দ্রিয়বৃত্তি-

সমূহ যাঁহার প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে, যিনি দিবানিশি ব্রহ্মসুখে রমণ করেন, এইরূপ কৌপীনধারী মহাত্মা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান মহাপুরুষ। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিষয় পরিবর্ত্তন করিয়া যিনি নিজ আত্মাতেই পরমাত্মা দর্শন লাভ করেন, যিনি অন্ত, মধ্য বাহির কিছুই চিন্তা করেন না, এরূপ কৌপীনধারী মহাপুরুষ যথার্থই ভাগ্যবান। সুপবিত্র ব্রহ্মনামাক্ষর যিনি প্রতিনিয়ত উচ্চারণ করেন, ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিয়া যিনি জীবন যাপন করেন ও সকল দিক পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান, এইরূপ কৌপীনমাত্রধারী জীবন্মুক্ত দেহী নিশ্চয়ই ভাগ্যবান মহাপুরুষ বলিয়া অভিহিত।

পূর্ব্বে অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে যে, পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড একই বস্তু। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, পিণ্ডেও তাহাই সম্পূর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই পঞ্চভূত ও তন্মাত্রাদি, সেই সপ্তলোক বা সপ্ত জ্ঞানভূমি;—সাধকশ্রেষ্ঠ বিরাটের মধ্যে যে ভাবে তাহা লক্ষ্য করিয়া "জগতই ব্রহ্ম" বিচার বা চিন্তা করিয়া থাকেন, আবার "ব্রহ্মই জগৎ" এবং পরিণামে সেই "ব্রহ্মই আমি," পরব্রহ্মের এই সর্ব্ব ব্যাপকতাযুক্ত অনন্ত সত্বা উপলব্ধি করিতে করিতে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডের একত্বে সপ্তম জ্ঞান-ভূমি আনন্দমঠে বা সহস্রারে কেন্দ্রীভূত হইয়া অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া মহাপূর্ণ পরমহংসরূপে জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাই জীবদেহে আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ অবস্থা। প্রকৃত পক্ষে ইহাই পূর্ণ জগদ্‌গুরুত্বের অবস্থা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, পরমপূজ্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দেবের প্রবর্ত্তিত স্থূল মঠচতুষ্টয়ে তাঁহার চারিজন উপযুক্ত শিষ্য জগদ্‌গুরু

আচার্য্যরূপে সমাসীন হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম—পদ্মপাদাচার্য্য, তাঁহার দুই শিষ্য, বন অরণ্য; দ্বিতীয়—সুরেশ্বরাচার্য্য, তাঁহার তিন শিষ্য, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী; তৃতীয়—হস্তামলকাচার্য্য, তাঁহার দুই শিষ্য, তীর্থ ও আশ্রম; চতুর্থ—ত্রোটকাচার্য্য, তাঁহার তিন শিষ্য, গিরি, পর্ব্বত, ও সাগর নামক এই দশটী পদে অভিহিত হইয়াছিলেন।

দশনামী সন্ন্যাসী।

এই চারিজন মঠাচার্য্যের দশনামী শিষ্য হইতে বর্ত্তমান প্রচলিত দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের গঠন হইয়াছে। পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের সেই মঠ প্রতিষ্ঠা-সময়ে দশনামী বলিয়া সন্ন্যাসীদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক পরিচয় ছিল না। শঙ্করাচার্য্য দেবের সে উদার সার্ব্বভৌমভাব পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসীদিগের যতি, অবধূত, হংস ও পরমহংসাদিরূপ জ্ঞান ও অবস্থার বিভেদ মাত্রই তখন ছিল, সাম্প্রদায়িক অভিমান-মূলক মঠ ও নামের প্রাধান্যযুক্ত এই সঙ্কীর্ণ ভাব পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শঙ্করের সময়ে আদৌ পরিপুষ্ট হয় নাই, অপিচ তাঁহার এরূপ অভিপ্রায়ও যে ছিল না, সে বিষয়ে এখনও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবল জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবেই সমাজ ও বর্ণের ন্যায় ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রমও কলুষিত ও ঘৃণ্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহাহউক বর্ত্তমান প্রচলিত দশনামী সম্প্রদায়ের পরিচয় বিষয়ে যাহা পরবর্ত্তী সময়ে মঠাচার্য্যগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই নিম্নে যথাক্রমে বর্ণন করিতেছি। তাহাও অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক-লক্ষণযুক্ত পরিচয়ের বিষয় তাহা আধুনিক সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও অনেকে একেবারে অবগত নহেন। আশা করি সন্ন্যাসাশ্রমী—অনভিজ্ঞ সাধুসজ্জন ও

সাধারণ ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোক্ত মঠাম্নায়-সপ্তকের রহস্য সহ এই দশনামী সন্ন্যাসীদিগের লক্ষ্য-বস্তুর বিচার করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে বৃথা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ক্রমে তিরোহিত হইতে পারিবে। বাস্তবিক সর্ব্বত্যাগী নামরূপাতীত সকল-দ্বন্দ্ব-বিবর্জ্জিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসক দিগের মধ্যে আবার লৌকিক দ্বন্দ্ব বা বিরোধের সৃষ্টি কেন হইবে? পূজ্যপাদ পূর্ব্বাচার্য্যগণ নিম্ন লিখিত ভাবে দশনামীয় লক্ষ্য ও তাহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা :—

"তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরি পর্ব্বতসাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরীতি দশ কীর্ত্তিতঃ।"

তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী এই দশটী সন্ন্যাসীদের সম্প্রদায় বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

তীর্থ : "ত্রিবেণী সঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থ ভাবেন তীর্থ নাম্না স উচ্যতে॥"

যিনি যোগমার্গ-নির্দ্দিষ্ট যুক্ত ও মুক্ত ত্রিবেণী-তীর্থে স্নানপূর্ব্বক তত্ত্বার্থভাবে তত্ত্বমসি-লক্ষণযুক্ত হইয়াছেন, তিনিই "তীর্থ" নামা সন্ন্যাসী।

আশ্রম :—"আশ্রম গ্রহণে প্রৌঢ় আশাপাশবিবর্জ্জিতঃ।
যাতায়াতবিনির্ম্মুক্ত এতদাশ্রমলক্ষণঃ॥"

যিনি প্রৌঢ় অর্থাৎ জ্ঞান-বৃদ্ধ অবস্থায় সংসারের সকল আশা-পাশ বিবর্জ্জিত হইয়া পুনঃ পুনঃ যাতায়াত বিনির্ম্মুক্তির কারণ

এই অন্তিম বৃত্তিরূপ আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই "আশ্রম" নামা সন্ন্যাসী।

বন :—"সুরম্যে নির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাপাশবিনির্ম্মুক্তো বন নামা স উচ্যতে॥"

যিনি আশাপাশ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সুষুম্নারূপ সুরম্য নির্ঝরযুক্ত প্রদেশে গুপ্ত কমলবনে বাস করেন, তিনি "বন" নামা সন্ন্যাসী।

অরণ্য :—"অরণ্যে সংস্থিতো নিত্যমানন্দ নন্দনে বনে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদং বিশ্বমরণ্য লক্ষণং কিল॥"

যিনি এই বিশ্বের সমস্তই ত্যাগ করিয়া নিত্য আনন্দ কাননরূপ-সপ্ত-সরোজারণ্যে স্থিত হয়েন, তিনিই "অরণ্য" নামা সন্ন্যাসী।

গিরি :—"বাসো গিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসেহি তৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরি নামা স উচ্যতে॥"

যিনি সর্ব্বদা গীতাভ্যাসে তৎপর ও গম্ভীর অচলের ন্যায় স্থির-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া নিত্য সহস্রাররূপ সুমেরু-পর্ব্বতচূড়ায় বাস করেন, তিনিই "গিরি" নামা সন্ন্যাসী।

পর্ব্বতঃ—"বসেৎ পর্ব্বতমূলেষু প্রৌঢ়ো যো ধ্যানধারণাৎ।
সারাৎসারং বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

যিনি প্রৌঢ় ব জ্ঞানবৃদ্ধভাবে ধ্যান-ধারণাদি দ্বারা সারাৎসার বা নিত্যানিত্য-বস্তুর বিচারে ব্রহ্মকে অবগত হইয়া বিজ্ঞানরূপ পূত পর্ব্বতমূলে অবস্থিত হইয়াছেন, তিনিই 'পর্ব্বত' নামা সন্ন্যাসী।

"সাগর :—বসেৎ সাগরগম্ভীরোধনরত্নপরিগ্রহঃ।
মর্য্যাদাশ্চ ন লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

যিনি আত্ম মর্য্যাদাদি বন্ধন বা বাঁধ লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ ভাসাইয়া

রত্নাকর-সদৃশ গম্ভীর আনন্দসাগরে আশ্রয় লইতে পারিয়াছেন, তিনিই "সাগর" নাম্ন্যা সন্ন্যাসী।

সরস্বতী :—"স্বরজ্ঞানবশোনিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।
সংসারসাগরসারাভিজ্ঞো যো হি সরস্বতী॥"

যিনি সংসার-সাগরের সার ধন অবগত হইয়া ব্রহ্মবাদী কবীশ্বর-রূপে সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞানে তন্ময় হইয়া থাকেন, তিনিই "সরস্বতী" নামা সন্ন্যাসী।

ভারতী :—"বিদ্যাভরণসম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

যিনি সংসারের সকল ভার অর্থাৎ অবিদ্যা-ভার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিদ্যা বা পরা-প্রকৃতিরূপ আভরণে ভূষিত হইয়া ভবদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই "ভারতী" নামা সন্ন্যাসী।

পুরী :—"জ্ঞানতত্ত্বেনসম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদেস্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরী নামা স উচ্যতে॥"

যিনি জ্ঞানতত্ত্বে সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়া পূর্ণ তত্ত্বপদে স্থিত হইয়াছেন এবং সর্ব্বদা পরব্রহ্মে রত হইয়া থাকেন, তিনিই "পুরী" নামা সন্ন্যাসী বলিয়া কথিত হয়েন।

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য দেবের প্রথম প্রশিষ্যগণের মধ্যে যে দশজন উক্ত দশবিধ গুণে সমন্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই পরে তীর্থাদি দশনামে অভিহিত করা হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাদের নাম-মাত্রই আছে। আক্ষেপের বিষয়, শিষ্য-পরম্পরায় সে গুণ আর প্রায় পরিলক্ষিত হয় না। এতদ্ব্যতীত এই দশনামী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে ক্রমে নানা ব্যাভিচার উপস্থিত হইয়া বহু সাম্প্রদায়িক বিকৃতি হইয়া গিয়াছে। এখন অনেকের মধ্যেই

রীতিমত বিধিনিয়মের পালন নাই। উক্ত দশনামীর মধ্যে এক্ষণে সাড়ে ছয় ঘর একেবারেই বা কতক কতক বিকৃত হইয়া গিয়াছে. এবং সাড়ে তিন ঘর শুদ্ধ বলিয়া পরিচিত আছে। তীর্থ. আশ্রম ও সরস্বতী এই তিন ঘর এবং ভারতী ঘরের অর্দ্ধ-অংশ বা এক শাখা এখনও শুদ্ধ আছেন; আর গিরি, পুরী, পর্ব্বত, সাগর, বন ও অরণ্য এই ছয় ঘর এবং ভারতী ঘরের অন্য অর্দ্ধ-অংশ বা অন্য এক শাখাকে ধরিয়া মোট সাড়ে ছয় ঘর বিকৃত বলিয়া পরিচিত। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাড়ে তিন ঘরে এখনও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিধি অনুসারে সন্ন্যাসরীতি কিয়ৎ পরিমাণে বিধিবদ্ধ আছে, অবশিষ্ট গুলিতে কোনও বিধি-নিয়মের দৃঢ়তা নাই। বর্ণাশ্রমের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যে কেহই এখন ইহাঁদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন ও ব্রাহ্মণেতর যে কেহই সন্ন্যাসী-গুরু সাজিতেও পারেন। সেই কারণেই বর্ত্তমান সময়ে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে। ওঁ সদাশিব ওঁ॥

ষষ্ঠোল্লাস।

জ্ঞানতত্ত্ব-বিচার।

পূর্ব্বে রাজযোগ-বর্ণনসময়ে সপ্তজ্ঞানভূমির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, পাঠকের নিশ্চয়ই তাহা স্মরণ আছে। ব্রহ্ম-জ্ঞানাভিলাষী সাধক শ্রীগুরু-নির্ণীত সেই সাধন-সোপান অবলম্বন করিয়াই যথাক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। শ্রীসদা-শিব এই জ্ঞানতত্ত্বের মূল উপদেশ ও আজ্ঞা শ্রীগুরুর মুখারবিন্দ হইতে "আচমন-মন্ত্র"রূপে প্রথমেই প্রদান করিয়াছেন, সাধকবৃন্দের অবগতির জন্য তাহাই এক্ষণে বর্ণন করিব।

সকলেই জানেন কুল-ক্রিয়া-দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে "আত্মতত্ত্বায়

স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা, "এই মন্ত্রে আচমন করিবার উপদেশ প্রথমেই দেওয়া হয়। কিন্তু তাহার রহস্য অনধিকারী-বোধে অথবা মন্ত্রোপদেষ্টার অনভিজ্ঞতা বশতঃ প্রায় প্রকাশ হয় না। ব্রহ্মতত্ত্ব-বিচারে তাহার রহস্য-বোধ সাধক-মাত্রেরই প্রয়োজন। প্রথম কুল-দীক্ষার এই আচমন-মন্ত্র মূল রূপে যাহা "আত্মতত্ত্ব" বলা হইয়াছে, জ্ঞানতত্ত্ব-বিচারে তাহাই আত্ম-জ্ঞান; এই ভাবে যাহা "বিদ্যাতত্ত্ব," তাহাই এক্ষণে প্রকৃতি-জ্ঞান এবং যাহা "শিবতত্ত্ব" তাহাই পুরুষ-জ্ঞান নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থাই "ব্রহ্মতত্ত্ব" বা ব্রহ্ম-জ্ঞান বলিয়া শ্রীসদাশিব অনুজ্ঞা করিয়াছেন। বেদান্তশাস্ত্রেও এইরূপ মোক্ষ-সাধনাভূত তত্ত্ববিবেক-উপলক্ষে আত্মতত্ত্বাদির উপলব্ধির কারণ যে

বেদান্ত-মতে সাধন-চতুষ্টয়।

চতুর্ব্বিধ সাধনার উল্লেখ আছে, সাধারণের অবগতির জন্য এ স্থলে তাহাও বলিয়া রাখি। সেই সাধন-চতুষ্টয় যথা—(১) নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, (২) ইহামুত্রার্থফল-ভোগ-বিরাগ। (৩) শমাদি ষট্‌সাধন-সম্পত্তি এবং (৪) মুমুক্ষুত্ব।

(১) একমাত্র ব্রহ্মই কেবল নিত্যবস্তু, তদ্ব্যতীত যাহা কিছু বা এই প্রপঞ্চময় সংসারের সমস্তই অনিত্য, সমস্তই অস্থায়ী ও পরিণামশীল বা নশ্বর। ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব আত্মস্বরূপ 'আমিও' মূলে নিত্য-স্বরূপ, কিন্তু আমার দেহাত্মক বা বিষয়াত্মক ভাব যে, সদা বিনাশশীল, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার পরমাণুমাত্রের পরিবর্ত্তন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতেছে, এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তের ফলে কোনটী নিত্য, আর কোন্‌গুলি অনিত্য, এই বিচার-সিদ্ধিই সাধন-চতুষ্টয়ান্তর্গত" "নিত্যানিত্য-বস্তু বিবেক" নামক প্রথম সাধন।

(২) উক্ত সাধনার ফলে যখন হইতে সাধকের চিত্তে ধন, মান, জন ও যৌবনাদি ইহলোকের অনিত্য ভোগ্য-বস্তুরূপ সকল সম্পত্তিই পরিণামশীল, সুতরাং দুঃখময় বোধ হইবে এবং এইরূপ স্বর্গাদি সুখ-ভোগও নির্দ্দিষ্ট কালমাত্র স্থায়ী, অর্থাৎ ভোগশেষ হইলে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে; অতএব উহা ত জীবের চিরকল্যাণপ্রদ নহে, ফলে উহাও পরিণামে দুঃখময় জানা যাইতেছে, এই স্থির বুদ্ধিতে যখন ইহ-লৌকিক এবং স্বর্গাদি পারলৌকিক বিষয়সমূহে ক্রমে দোষ দর্শনপূর্ব্বক নিবৃত্তির ইচ্ছা হইবে, তখনই সাধক উক্ত সাধন-চতুষ্টয়ান্তর্গত "ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ" নামক বৈরাগ্যরূপ দ্বিতীয় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক অভাব বশতঃ বৈরাগ্য কোন কাজেরই নহে। ভোগের বস্তু না পাইয়া অথবা লোক-লজ্জার ভয়ে মনে মনে ভোগ-লিপ্সার শত জ্বালা অনুভব করা অপেক্ষা প্রকাশ্যভাবে বিষয়-ভোগ করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। তাহা হইলে কালে প্রবৃত্তির অবসানে নিবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে। শাস্ত্রে ও ইতিহাসে ইহার বহু উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যতক্ষণ সাধকের ভিতরে-বাহিরে সমতা উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ প্রকৃত বৈরাগ্য সম্পূর্ণ অসম্ভব। পূর্ব্বেও অনেকস্থলে একথা বলা হইয়াছে।

(৩) অনন্তর "শমাদিষট্-সাধন-সম্পত্তি" নামক তৃতীয় অধিকারের সাধনা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয় প্রকার সাধনাকেই "শমাদিষট্ সাধন-সম্পত্তি" কহে।

অন্তরেন্দ্রিয়ের নিগ্রহের নাম "শম"। মনই প্রধান-রূপে

অন্তরেন্দ্রিয়। এই সাধনাদ্বারা মন নিগৃহীত হয়, অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্য বিদূরিত হয়।

"মৈত্রী করুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখ-দুঃখ-পুণ্যাপুণ্য-
বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্॥"

শ্রীমন্মহর্ষি পতঞ্জলিদেব-বর্ণিত এই সূত্রাত্মক মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটী উপাদানকেই মনোবৃত্তি নিবৃত্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুখীদিগের প্রতি প্রেম, দুঃখীর প্রতি করুণা, ধার্ম্মিকে হর্ষ ও পাপিগণে ঔদাসিন্য করিতে পারিলেই চিত্তশুদ্ধি হয়। সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান্ ও অপুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের সহিত এই চতুর্ব্বিধ ভাবের ব্যবহার করিলেই চিত্ত ক্রমে শান্ত হয়। কোন শুভ বা অশুভ ঘটনা কিম্বা কোন বস্তুর সহিত চিত্ত সংযোগ হইলে, উহাতে প্রিয় ও অপ্রিয় ভাব বর্জ্জিত হইয়া স্থির ভাব ধারণ করিলেই চিত্তের সমতা উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য প্রিয় ও অপ্রিয় যাবতীয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবে যিনি হৃষ্ট বা উদ্বিগ্ন হন না, তিনিই যথার্থ শান্তি লাভ করিতে পারেন। তাঁহারই মধ্যে প্রকৃত শমের প্রতিষ্ঠা হয়। সম্পদ-বিপদে যিনি সমবুদ্ধি, সর্ব্ববিষয়ে যিনি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, তিনিই শম-সাধনা-সিদ্ধ। সাধকের সর্ব্বাবস্থায় এই ধারণা রাখিয়া কার্য্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। সাধক যখন তাঁহার উপাসনা-নির্দ্দিষ্ট সাধনার অতিরিক্ত কোনও বিষয়েই মন দেন না, তাঁহার মনে অন্য কোন বিষয়ই যখন স্থান পায় না, তখনই তাঁহার "শম"-সিদ্ধ হয়।

দম-সাধনার দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহ নিগৃহীত হয়, অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ এবং পঞ্চ

কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই বাহ্যেন্দ্রিয়-দশক বশীভূত হয়। ইহাকেই "দম"-সাধনা বলে।

উপরতি অর্থাৎ প্রপঞ্চময় জগতের উপরম বা বিরতিপূর্ব্বক স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করাকেই নিবৃত্তি বা উপরতি কহে। বিষয়-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলেও, যাহাতে পুনরায় বিষয়ে পুনরাবৃত্তি না হয়, তাহাই উপরতি সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য। বিক্ষেপ-জনক প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্ম না কর্ত্তব্য পালন করাই উপরতি-সাধনা। নিবৃত্তি-মার্গের প্রতিকূল প্রবৃত্তি-মূলক কর্ম্মের ত্যাগকে অবিচলিত রাখিবার নিমিত্তই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশে কথিত সন্ন্যাসাশ্রমের একান্ত প্রয়োজন। যথার্থ সন্ন্যাসভাব যখন অন্তঃকরণে পূর্ণ হইয়া যায়, তখনই সাধকের "উপরতি"-সিদ্ধ হয়।

তিতিক্ষা—শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, স্তুতি, নিন্দা, ভাল ও মন্দ, আদি দ্বন্দ্বসমূহের সহন-শীলতাকে অর্থাৎ তত্তদ্ বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়াকে "তিতিক্ষা" বলা যায়।

শ্রদ্ধা—শ্রীগুরুদেবের বচনে ও বেদান্তমূলক শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস করাকে এবং তত্ত্ব-বিষয়ে উৎকট ইচ্ছারূপ চিত্তের প্রসন্নতাকে "শ্রদ্ধা" বলে। শ্রদ্ধাদির সাধনার ফলেই সমাধি হইয়া থাকে।

সমাধান—সাধক যখন যে বিষয়ে চিত্তস্থির করিতে অভিলাষ করেন, তখন সেই বিষয়ের সহিত মনকে একতান করিবার উপযোগী চিত্তের দৃঢ় অবস্থার নাম "সমাধান'।

এই ছয় প্রকার সাধনার সমন্বয়-সিদ্ধিই সাধকের উক্ত সাধন-চতুষ্টয়ের মধ্যে তৃতীয় অধিকার "ষট্সাধনসম্পত্তি"।

অনন্তর মোক্ষ বা মুক্তি-প্রাপ্তির তীব্র ইচ্ছাকে "মুমুক্ষুত্ব" বলা

হইয়াছে। বেদান্তসিদ্ধ এই সাধনচতুষ্টয়ের সাধনার দ্বারা সাধকের জ্ঞানতত্ত্ব-বিবেকের অধিকার লাভ হইয়া থাকে।

"নিরালম্বোপনিষদে" শ্রীমহর্ষি ভরদ্বাজের প্রশ্নে পিতামহ ব্রহ্মা জ্ঞান-সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

একাদশেন্দ্রিয়-নিগ্রহেণ সদ্‌গুরূপাসনয়া শ্রবণমননিদিধ্যাসন-দৃক্‌দৃশ্যপ্রকারং সর্ব্বং নিরস্য সর্ব্বান্তরস্থং ঘটপটাদিবিকার-পদার্থেষু চৈতন্যং বিনা ন কিঞ্চিদস্তীতি সাক্ষাৎকারানুভবো জ্ঞানম্।"

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ ও বাক্ ; পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করিয়া সদ্‌গুরুর উপাসনা দ্বারা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সহকারে ঘট, পট ও মঠাদি তত্তৎ বস্তুর বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত একমাত্র সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুমাত্র সত্য পদার্থ নাই, এইরূপ অনুভবাত্মক যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তাহারই নাম "জ্ঞান"। অতএব পূর্ব্বোক্ত সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন এবং যোগযুক্ত না হইলে কখনই প্রকৃত জ্ঞানতত্ত্বের বিচারে অধিকারী হইতে পারা যায় না। অনধিকারী ব্যক্তির জ্ঞান, সাধারণ শব্দ-বিচার-যুক্ত জ্ঞান, তাহা ভ্রান্তি-পূর্ণ। কারণ সাধারণ মানবমাত্রেই মায়া-পাশে বদ্ধ, সেই মায়াপাশ ছিন্ন করিতে না পারিলে, যথার্থ জ্ঞানালোক দর্শন করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। কিন্তু সেই মায়াপাশ ছিন্ন করিবার একমাত্র উপায় যে, যোগ তাহা পূর্ব্বে অনেকস্থলে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ যোগী ব্যতীত কেহই প্রকৃত জ্ঞানতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। যোগদর্শনের মতে যাহা অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধনার অন্তর্গত জ্ঞানের সপ্ত-প্রান্তভূমি * বেদান্তমতে

* জ্ঞানের সপ্তপ্রান্তভূমি-সম্বন্ধে "মুক্তিতত্ত্ব" দেখ

যাহা সাধনচতুষ্টয়, দর্শন-শাস্ত্রের মতে যাহা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং রাজযোগ-অংশে বর্ণিত, সপ্তজ্ঞানভূমির যে সপ্তবিধ জ্ঞান-স্ফূরণের হেতু, তাহাই শ্রীসদাশিব-প্রোক্ত তত্ত্বজ্ঞান-সাধন। রাজযোগোক্ত জ্ঞানভূমির সাত প্রকার অবস্থা হইলেও প্রকৃত জ্ঞানের শিবোক্ত-সাধনায় ক্রিয়াসিদ্ধাংশে বা তন্ত্রে চারিপ্রকার বিধিই পরিলক্ষিত হয়। যথা—আত্মজ্ঞান, প্রকৃতিজ্ঞান পুরুষজ্ঞান এবং নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান। এই চারিপ্রকার জ্ঞানকে এক-কথায় "তত্ত্বজ্ঞান" বলে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মজ্ঞানদ্বারা আত্মতত্ত্বের, প্রকৃতিজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিতত্ত্বের বা বিদ্যাতত্ত্বের এবং পুরুষজ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মতত্ত্বের বা শিবতত্ত্বের এবং ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বের অপরোক্ষ-জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে যিনি জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানী, এই তিনকে এক করিয়া লইতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, তিনিই আত্মবিৎ। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

> "জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
> বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবেবাহ শিষ্যতা ॥
> জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
> বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ ॥
> এতত্তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষান্নির্ব্বাণকারণম্।
> চতুর্ব্বিধাবধুতানাম্ এতদেব পরং ধনম্ ॥

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিতয় কেবল মায়াদ্বারাই পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত হইতেছে, কিন্তু এই ত্রিতয়ের তত্ত্ব-বিচার করিলেই একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, অন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কারণ চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, চিন্ময় আত্মাই জ্ঞেয়-

বস্তু এবং চিন্ময় আত্মাই স্বয়ং জ্ঞাতা। যিনি ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী বা আত্মবিৎ। হে দেবি, এই তোমাকে সাক্ষাৎ নির্ব্বাণের কারণ "জ্ঞানতত্ত্ব" সম্বন্ধে বলিলাম। চতুর্ব্বিধ অবধূত বা সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে ইহাই পরমধন।

স্মৃতিতে উক্ত আছে :—

"অভেদপ্রত্যয়ো বস্তুজীবস্য পরমাত্মনা।
তত্ত্ববোধ স বিজ্ঞেয়ো বেদতন্ত্রাদিভির্ম্মতঃ॥

জীবাত্মাতে পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। বেদ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রের ইহাই একমাত্র অভিমত। আবার বেদান্তশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় : —

অভেদ প্রত্যয়ো যস্তু জগতাং পরমাত্মনা।
সৈব তত্ত্বমতি র্জ্ঞেয়া দেবানামপি দুর্ল্লভা॥

পরমাত্মার সহিত জগতের অভেদ-জ্ঞান অর্থাৎ ঘটপটাদি বিশ্ব-সংসারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যেই পরমাত্মজ্ঞান অনুভব করাই তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই জ্ঞান দেবতাদিগেরও দুষ্প্রাপ্য।

পরামুক্তিপ্রদ এই একমাত্র অপূর্ব্ব জ্ঞানতত্ত্ব বিচার করিবার পূর্ব্বে, সৃষ্টিতত্ত্ব, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর এবং পঞ্চকোষাদি শরীর-বিজ্ঞান বিষয়ক কতিপয় দার্শনিক পারিভাষিক-তত্ত্বের আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ে জ্ঞান উপলব্ধির বিশেষ সুবিধা হইবে।

"মাণ্ডুক্যোপনিষদে" দেখিতে পাওয়া যায় :—

"বিভূতিং প্রবদন্ত্যন্যে মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়া স্বরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈ র্বিকল্পিতা॥"

সৃষ্টি-বিচারতৎপর পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, এই বিশ্বসৃষ্টি কেবল সেই পরমাত্মার বিভূতি বা মাহাত্ম্য-বিস্তার মাত্র ; কেহ বলেন, ইহা স্বপ্নবৎ মায়াস্বরূপ।

"ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ ॥
কালাৎ প্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ ॥
ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে ।
দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা ॥

কোন কোন সৃষ্টিবাদীরা বলিয়া থাকেন, এই প্রভুর সৃষ্টি ইচ্ছা-মাত্র। কালচিন্তকেরা অর্থাৎ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, কালক্রমে আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়। কেহ বলেন, পরমাত্মা আপনার ভোগবিলাসের জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ বলেন, ভোগ বিলাসের জন্য নহে, কেবল আপনার ক্রীড়ার জন্য এই সৃষ্টি সম্পাদন করিয়াছেন। অন্যান্যবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, উৎপাদন করাই পরমেশ্বরের স্বভাব, তাহাতে কোনও কারণ নাই। তিনি পূর্ণকামী, তাঁহার কোনও স্পৃহা নাই, পরন্তু আপন স্বভাববশতঃ উৎপন্ন করিতেছেন। এইরূপ জগৎ উৎ-পত্তির নানাকারণ বিভিন্ন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"ছান্দোগ্যোপনিষদে" দেখিতে পাওয়া যায় :—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয় মিত্যুপক্রম্য
তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় মিতি তৎ তেজোঽসৃজতেতি ॥"

হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ছিল না, তখন কেবল অদ্বিতীয় সৎমাত্র ছিলেন। সেই সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন যে, আমি প্রজারূপে বহু হইব। এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তেজের সৃষ্টি করিলেন।

"ঐতরেয়োপনিষদে" কথিত আছে :—

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎকিঞ্চিদাসীৎ।

স ঐক্ষত লোকানসৃজতেতি।

জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান ছিলেন, তৎকালে এই পরিদৃশ্যমান জগতের কিছুই ছিল না। সেই আত্মা জগৎসৃষ্টিকরণাভিপ্রায়ে অবলোকন করিতেছিলেন,—

"পঞ্চদশী"কার বলেন :—

"বিশ্বরূপাধ্যায় এষ উক্ত সূক্তেঽপি পৌরুষে।

ব্রহ্মাদি, স্তম্বপর্য্যন্তানেতস্যাবয়বান্ বিদুঃ॥"

পুরুষ সূক্তের বিশ্বরূপাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় বিশ্ব সেই বিরাট পুরুষেরই অবয়বমাত্র।

"গীতায়" শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥

আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাহারই বশে অবশ এই ভূতগ্রাম অর্থাৎ জীবজগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।

অন্যত্র "মাণ্ডুক্যোপনিষদে" আছে :—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।

খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথিবী বিশ্বধারিণী॥"

এই পরব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, বাক্, পাণি আদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও বিশ্বধাত্রী পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

"তৈত্তিরীয়োপনিষৎ" বলিয়াছেন :—

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।

আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিবীভ্যো বনস্পতিঃ। বনস্পতিভ্যো ওষধয়ঃ ওষধিভ্যোঽন্নং। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃপুরুষঃ। স বৈ এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ॥"

প্রথমে সেই জ্ঞানস্বরূপ নিত্য পরমাত্মা হইতে আকাশ প্রকাশ হইয়াছে; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে বনস্পতি, বনস্পতি হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে পুরুষ, অতএব সেই পুরুষই অন্নরসময় শরীরবিশিষ্ট জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। অন্যান্য শাস্ত্রকার সৃষ্টিসম্বন্ধে এইরূপ নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই সৃষ্টির মূল কারণ আত্মাকে কেহ সূক্ষ্ম, কেহ স্থূল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্থূলও নহেন সূক্ষ্মও নহেন, তিনি স্থূল-সূক্ষ্মের অতীত। যদি তিনি সূক্ষ্ম হন, তবে এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সমাবৃত করা তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত হইত। আবার যদি তিনি স্থূল হন, তাহা হইলে অনুপ্রমাণবিশিষ্ট জীবদেহে তাঁহার অবস্থান কখনও সম্ভবপর হইত না। মন্ত্রই হঠাদি যোগরত সাধক বা মূর্ত্তি উপাসকেরা পরমাত্মার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া শিব, বিষ্ণু ও গণেশাদিকেই পরমাত্মা বলেন, কিন্তু ঐ সকল দেবমূর্ত্তিও পঞ্চতত্ত্ববিশিষ্ট হইবার কারণ, কালে সেই দৈবী-জগৎও পরিণামবশে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন, মহাপ্রলয়কালে প্রথমস্তরের মূল দেবতা অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশও মহাপ্রকৃতিতে লয় হইয়া থাকেন। যথা :—

ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবঃ দেবি প্রকৃত্যা জায়তে ধ্রুবং।
তথা প্রলয়কালে তু প্রকৃত্যা লুপ্যতে পুনঃ॥"

আবার যাঁহারা মূর্ত্তি স্বীকার করেন না, অর্থাৎ শূন্যবাদীরা পরমাত্মাকে শূন্যস্বরূপ নিরাকার বলিয়া চিন্তা করেন, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমাত্মারই বিরাটরূপ বলিয়া উক্ত হইবার কারণ, পরমাত্মাকে শূন্যস্বরূপ বলা সঙ্গত নহে। এইরূপ জ্যোতিঃশাস্ত্রে কালকে, স্বরোদয়ে দিক্‌কে, মন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্রকে, ইত্যাদি আপন আপন অধিকার অনুসারে নানালোকে নানাভাবে তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়াছেন। মীমাংসকেরা বিধিনিষেধজন্য ধর্ম্ম কর্ম্মকে, সাংখ্যেরা পঞ্চবিংশতিতত্ত্বকে অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্ব, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এবং পঞ্চমহাভূতকে; পাতঞ্জল যোগদর্শনে এই পঞ্চবিংশতির উপর আর একটী তত্ত্ব ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া ষড়বিংশতত্ত্বকে, পাশুপতগণ ঐ ষড়বিংশতত্ত্বের সহিত রাগ, অবিদ্যা, নিয়তি, কাল ও মায়া যোগ করিয়া ত্রিংশৎতত্ত্বকে, আবার কোনও কোনও মতে তাঁহাকে অনন্ততত্ত্বে বহুরূপাত্মক পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন তত্ত্বেরই অন্তর্ভূক্ত নহেন, তিনি এক, তিনি অদ্বিতীয়।

"মাণ্ডুক্যে" তাই উক্ত হইয়াছে।

"এতৈরেষ পৃথগ্ ভাবৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতঃ।
এবং যো বেদতত্ত্বেন কল্পয়েৎ সোঽবিশঙ্কিতঃ॥"

এইরূপ পৃথক পৃথক ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ, সেই পরমাত্মাকে বহুরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি বুঝিতে পারেন যে, এই একমাত্র পরমাত্মাতে ভ্রান্তিবশতঃ নানাবিধ বস্তু কল্পিত হইয়া থাকে, তিনিই বেদতত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া নিঃশঙ্কচিত্ত হইতে পারেন। পূর্ব্বে সেই বেদান্ত বাক্যেই

বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মা ও জগতের অভেদজ্ঞানই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান। এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড সমস্তই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অখণ্ডরূপ। শ্রীমন্মহর্ষি বশিষ্ঠদেব সেই কথাই উপদেশ করিয়াছেন :–

"তথা বিস্তীর্ণ সংসারঃ পরমেশ্বরতাং গতঃ॥

এই বিস্তীর্ণ মায়াময় সংসার পরমেশ্বরেই লয় হইয়া থাকে।

শ্রুতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় :—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎপ্রযান্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্য।"

অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইতেছে. ব্রহ্মদ্বারাই স্থিতি হইতেছে ব্রহ্মতেই সমস্ত লয় হইতেছে ইত্যাদি।

শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন :—

"যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামাঙ্গঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতঃ॥
সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ মায়া নিত্যা সনাতনী।
যথাত্মা চ তথা শক্তি র্যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা॥"

পরমাত্মস্বরূপ পরমেশ্বর সৃষ্টি কার্য্যের জন্য যোগাবলম্বন করিয়া আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। যেমন একটী চণক স্বীয় আবরণ মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় একটীই প্রতীয়মান হয়, পরে সেই আবরণ উন্মোচন করিলে তাহার মধ্যে দুইটী দল বা ডাল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমাত্মা দ্বিধাভূত হইয়া তাঁহার দক্ষিণ অর্দ্ধঅঙ্গ পুরুষ এবং বাম অর্দ্ধঅঙ্গ প্রকৃতিরূপে পরিণত হইলেন। সেই প্রকৃতিই নিত্যা, সনাতনী, ব্রহ্মরূপিণী ও মায়াময়ী। যেরূপ অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি, আমি ও আমার বাক্‌শক্তি, সেইরূপ পরমাত্মা ও

তাঁহার পরাশক্তি সতত একাধারে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই কথাই "নির্ব্বাণে" স্পষ্ট করিয়া শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

সত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃ স্বরূপিণী।
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং চণকাকাররূপিনী॥
মায়াবল্কলং সংত্যজ্য দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী।
শিবশক্তিবিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা॥

সত্যলোকে নিরাকার মহাজ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম মহাজ্যোতি-স্বরূপা নিজ মায়া দ্বারা নিজে আবৃত হইয়া একটী চণক বা ছোলার ন্যায় স্বভাবে বিরাজিত আছেন। ছোলা যেমন একটী আবরণ বা খোসার মধ্যে অঙ্কুর বা ওঁকুর সহ দুইটী দল বা ডাল একত্র হইয়া পরস্পরে আবদ্ধ থাকে, পুরুষ ও প্রকৃতিও সেই-রূপ ব্রহ্মচৈতন্যসহ মায়ারূপ আচ্ছাদনে সততই আবৃত হইয়া আছেন, সেই ব্রহ্মমায়ারূপ বল্কল বা আবরণ ভেদ করিয়া শিবশক্তি বা সৎ-চিৎ রূপের সম্মিলনভূত আনন্দস্বরূপ অঙ্কুর বা ওঁকুরে প্রকাশিত হইয়া সৃষ্টিবিন্যাস করিয়াছেন।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই শিব, পুরুষ বা পরমাত্মা এবং শক্তি বা তাঁহার পরাপ্রকৃতির যোগে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

"হরগৌর্য্যাত্মকং সর্ব্বং চরাচরমিদং জগৎ।
শুক্রশোণিত সংযোগাৎ শরীরং পরিকল্পিতং॥

চরাচর সমস্ত জগৎ শিবশক্ত্যাত্মক অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষাত্মক-যেহেতু এই ক্ষুদ্র জগৎ দেহপিণ্ড ও শুক্রশোণিতের কল্পনামাত্র।

"এষা মাহেশ্বরী সৃষ্টি দ্বৈতভাবেন সংস্থিতা॥"

এই মাহেশ্বরী সৃষ্টি দ্বৈতভাবেই সংস্থিতা আছে। এই কারণ শিব ও শক্তিযোগে জগতের সৃষ্টি স্বীকার করিতে হয়।

শ্রীভগবতী গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

স্বষ্ট্যর্থমাত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়ার্পিতং ।

ভূতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ পুমান্ স্ত্রী চ বিভেদতঃ ॥"

হে নগরাজ, আমি সৃষ্টি করিবার নিমিত্তই ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্ম রূপ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তন্মধ্যে একাংশ পুরুষ ও অন্য অংশ স্ত্রী নামধেয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নহি।

শিবসংহিতায় বলিয়াছেন :—

সা মায়াবরণ শক্ত্যা কৃতা বিজ্ঞানরূপিণী।

দর্শয়েজ্জগদাকারংতং বিক্ষেপ স্বভাবতঃ ॥"

বিজ্ঞানরূপিণী মহামায়ার নিজ আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা আবৃত করিয়া পরমাত্মাকে জগদাকারে দর্শন করান।

"চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম।

অস্তি চেৎ কল্পনেয়ং স্যান্নাস্তি চিন্ময়ঃ ॥"

যদি জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে নিশ্চয় করিতে হইবে যে, একমাত্র চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই এই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু যদি জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা না যায়, তবে সেই চিন্ময় ব্রহ্মই আছেন, আর কিছু নাই বুঝিতে হইবে।

এই ব্রহ্ম বা আত্মা অথবা পরমাত্মা কিরূপ ? শাস্ত্র বলিয়াছেন

"সচ্চিদানন্দ স্বরূপঃ ॥"

অর্থাৎ তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। এই সৎ কি, চিৎ কি, এবং আনন্দই বা কি ?

সৎঃ—"কালত্রয়েঽপি তিষ্ঠতীতি আত্মা সৎ ॥"

অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় একভাবে অব-স্থান করিতেছে, এই নিমিত্তই আত্মা সৎ বা সদ্‌স্বরূপ সদাস্থায়ী।

চিৎ :—"সাধনান্তরনৈরপেক্ষ্যেণ স্বয়ং প্রকাশমানতয়া যদিতরপদার্থাবভাসনমস্তীতি আত্মা চিৎ।"

অর্থাৎ অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া প্রত্যেক পদার্থকে প্রকাশ করিতেছে, এই জন্য আত্মা চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ।

আনন্দ :—"দেশকাল-বস্তুপরিচ্ছেদশূন্যঃ আত্মা আনন্দ ইতি আত্মনঃ সচ্চিদানন্দরূপত্বং॥"

আত্মার দেশতঃ কালতঃ বা বস্তুকৃত আদৌ পরিচ্ছেদ নাই, এই জন্য আত্মা আনন্দ বা সুখস্বরূপ, সুতরাং আত্মা বা ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ।

এই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই সৎ ও চিৎরূপে দ্বিধাভূত হইয়া প্রকৃতি ও পুরুষ-ভাবের সংযোগে আনন্দরূপে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং এই প্রকৃতি ও পুরুষ বা মায়া ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। প্রকৃতি বিচারে শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"ব্রহ্মাশ্রয়া মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিনামাপি।"

এই মায়া ব্রহ্মাশ্রয়া ও ত্রিগুণাত্মিকা। ইনিই প্রকৃতি নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। বেদান্ত-তন্ত্র-মতে এই মায়া বা প্রকৃতি অনাদি এবং সান্ত, অর্থাৎ মায়ার উৎপত্তি নাই কিন্তু বিনাশ বা লয় আছে। এই কারণ শাস্ত্রে মায়াময় জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। "ভক্তিমীমাংসায়" প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মায়াই ব্রহ্মের শক্তি, মায়া যেন ব্রহ্মের ছায়া, সুতরাং মায়া বা ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। যেরূপ আমি ও আমার বাক্-শক্তি কখন কখন আমাতে প্রকটা হয় না, কখনও বা প্রকাশিত হইয়া আমা হইতে

যেন পৃথক্‌রূপে প্রতীত হয়। উদাহরণস্বরূপে বলা যাইতে পারে, আমি ও আমার বাক্য বা বাক্‌শক্তি যেরূপ অভেদ হইয়াও ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যখন আমি কথক বা বক্তারূপে কোনও বাক্য উচ্চারণ করি, তখন সেই বাক্য আমা হইতে পৃথক বা ভিন্ন বলিয়া মনে হইবে। আবার আমি বাক্য বন্ধ করিলেই বাক্য আমাতে লয় বা আমাতে অন্তর্হিত হইয়া থাকিবে, তখন আমি ও আমার বক্তৃতা-শক্তির অভেদ-সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না, কিন্তু সে অবস্থাতে আমার বক্তৃতা-শক্তির একেবারে বিনাশ হয় নাই। আমি ইচ্ছামাত্রেই বাক্য প্রকাশ করিতে পারি। আমার বক্তৃতা-শক্তি আছে বলিয়া আমি বক্তা, আমি বাক্য বন্ধ করিলেও আমার বক্তা বা কথক নাম যাইবে না, অথবা আমি মূক্‌ বা বোবা বলিয়াও বিবেচিত হইব না। সেই-রূপ উপাসনা-শাস্ত্রানুসারে সৃষ্টি, উপাসনা-দশায় ব্রহ্মের দ্বৈত-বাদ এবং মুক্তিদশায় ব্রহ্মের অদ্বৈত-বাদ এই উভয়ই সিদ্ধ হইয়াছে।

সুতরাং এই ব্রহ্মবিজ্ঞানানুসারে ব্রহ্মবস্তুর দ্বৈত বা অদ্বৈত পদের আর কোনও বিরোধ থাকিতে পারে না। ক্রমোন্নত উপাসনা ও সাধন-বিধানের ফলেই ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশসহ পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন দর্শনের যথা সাংখ্য ও বেদান্তাদির সমন্বয় হইয়া থাকে। যাহাহউক উক্ত ব্রহ্মমায়া বা মূল-প্রকৃতির-সম্বন্ধে শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ॥
সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥"

সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা পরব্রহ্ম দুই প্রকার, সগুণ ও ও নির্গুণ। এই পরব্রহ্ম প্রকৃতি বা মায়াতে অনুপহিত বা মায়া হইতে যখন বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকেন অর্থাৎ মায়া যখন ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন অথবা মায়ার স্বরূপ যখন তাঁহাতে প্রকাশ থাকে না; চণকের অন্তর্গত দুইটী ডালের ন্যায় যখন উভয়ে একত্ব বা ওতঃপ্রোতভাবে এক অঙ্গে জড়িত হইয়া থাকেন বা এক হইয়া থাকেন, তখনই তাঁহাকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলা যায়। পূর্ব্ব-কথিত আমি ও আমার বাক্‌শক্তির ন্যায়ই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি যথাক্রমে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম; অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে "আমি কে?" তাহা যেমন সকলে দেখিতে পায় না, আমি স্বয়ংই সাধারণ জ্ঞানে বুঝিতে পারি না, কিন্তু আমি কথা কহিলেই আমার অস্তিত্ব সকলের অনুভব হয়। মনে কর, নিশার ঘোর অন্ধকারময় একটী গৃহে আমি বসিয়া আছি। আমাকে কেহই তখন দেখিতে পাইতেছে না, সেই অন্ধকারের মধ্যে আমার স্থূল অস্তিত্ব লুকাইয়া গিয়াছে, তুমিও গৃহদ্বারে আসিয়া গৃহের মধ্যে আমার অস্তিত্ব অনুভব করিলে না, কিন্তু যদি তুমি তখন "ঘরের মধ্যে কেহ আছ? বলিয়া প্রশ্ন কর আর আমি তাহার উত্তরে বলি যে, "হাঁ। আমি আছি।" তাহা হইলেই আমার অস্তিত্ব তখন তোমার অনুভব হইবে। অতএব এস্থলে আমার বাক্যই আমার স্বরূপ, আমার শক্তি বা তাহাই আমার যেন সগুণ-ভাব আমার সূক্ষ্মমূর্ত্তি। আর যখন তোমার প্রশ্নে আমার উত্তর দিবার ইচ্ছা নাই, আমি সেই অন্ধকার গৃহের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও কথা না বলি, তাহা হইলে আমার অস্তিত্বের সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞানই হইবে না। সে অবস্থায় আমি বা আমার আত্মা

কত্তকটা যে নির্গুণ ভাব-বিশিষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ কি? সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম যখন কলাযুক্ত হয়েন, অর্থাৎ সেই সাম্যাবস্থাময়ী মূল-প্রকৃতিতে যখন তিনি উপহিত হযেন, তখন তাঁহা হইতে এক অভিনব শক্তির আবির্ভাব হয়, এবং সেই আবির্ভূতা শক্তি হইতে নাদ (মহত্তত্ব) এবং নাদ হইতে বিন্দু (অহঙ্কারতত্ত্ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গুণত্রযের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। অর্থাৎ সে সময সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সমভাবে মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে পরাভব করে না তখন কোন গুণেরই বিশেষ প্রাধান্য বা প্রাদুর্ভাব থাকে না। অতএব এই অবস্থায় মূলপ্রকৃতিতে কোনও গুণেরই প্রাধান্য না থাকাতে, সমুদায় গুণই পরস্পরে অভিভূত ও লয় প্রাপ্ত হওযাতে, ইহাকেও নির্গুণ অবস্থাযুক্ত বলা যাইতে পারে। ফলতঃ এ সময়েই ব্রহ্ম প্রকৃতির সহিত, ওতঃপ্রোত সম্বন্ধযুক্ত। প্রকৃতি ব্যতীত ব্রহ্ম থাকিতে পারেন না এবং ব্রহ্ম ব্যতীত প্রকৃতির অস্তিত্বও থাকে না। পূর্ব্বোক্ত দুইটী ডালের অবস্থার চণকাকারের ন্যায় উভয়ে তখন একীভূত হইয়া আছেন। তবে ব্রহ্মের সেই কর্তৃত্ব বা সম-গুণযুক্ত অবস্থাকে প্রকৃতি, এবং চৈতন্য বা নির্গুণ অবস্থাকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকে। উভয়ে একীভূত থাকিবার কারণ ব্রহ্মে সগুণত্ব বা কর্তৃত্ব ও নির্গুণত্ব বা চৈতন্য উভয়ই অব্যাহত রহিয়াছে। কেহ কেহ ব্রহ্ম-প্রকৃতির এইরূপ কর্তৃত্ব ও চেতনত্ব দেখিয়া প্রকৃতিযুক্ত চৈতন্য অথবা চৈতন্যযুক্ত প্রকৃতি বলিয়াও মনে করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীর ন্যায় স্থূল-বিভিন্নতা-পরিচায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট নহেন।

তিনি যে নামরূপাতীত অব্যয় ও অনির্ব্বচনীয় বস্তু! তবে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির ভেদ অনুসরণ করিয়াই কেহ কেহ ব্রহ্মকে শিব-স্বরূপ এবং প্রকৃতিকে তাঁহার শক্তি-স্বরূপ স্থূল-ধ্যানাত্মক বলিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে পুরুষ, কেহ স্ত্রী, কেহ উভয়াত্মক এবং কেহ বা স্ত্রী-পুংভাবের অতীত বলিয়াও মনে করেন। সনাতন ধর্ম্মানুগত যাবতীয় উপাসক-সম্প্রদায় ব্রহ্মের এইরূপ স্ত্রী ও পুং আদি কোনও না কোন এক স্থূল-ধ্যানাত্মক ভাবের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাহা পূর্ব্বে অনেক স্থলেই বলা হইয়াছে। যাহাহউক সৃষ্টি-বিকার-সম্বন্ধে সচ্চিন্ময় ব্রহ্মের সেই দ্বিধাভূত পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে আনন্দোৎপন্নই ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির আদি কারণ। মহাপ্রলয়ের অবসান হইলে "সচ্চিদেকংব্রহ্ম' তদাত্ম্য সম্বন্ধে 'কালে' অধিষ্ঠান করিলে চৈতন্যযুক্ত মূল-প্রকৃতি হইতে আনন্দের বিকাশ-স্বরূপ প্রথমতঃ এক অপূর্ব্ব শক্তির আবির্ভাব হয়। তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। এই শক্তি "আদ্যাশক্তি" নামে তখন অভিহিতা হন। ইনি মূল-প্রকৃতির রূপান্তর মাত্র। সুতরাং মূল-প্রকৃতির ন্যায় ইনিও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা-সমন্বিতা ও পরব্রহ্মের সহিত একীভূতা। তবে মূলপ্রকৃতির সহিত ইহাঁর এই মাত্র পার্থক্য যে, মূলপ্রকৃতি সতত নির্ব্বিকারভাবেই অবস্থিতা থাকেন, আর ইনি তাঁহারই প্রতিবিম্ব বা প্রতিরূপা "আদ্যাশক্তি" নামে সর্ব্বপ্রথম বিকারপ্রাপ্তা হইয়া থাকেন। অর্থাৎ কাল বা মহাকালের সহকারিতায় অদৃষ্ট-নিবন্ধন প্রথমতঃ এই আদ্যাশক্তিতেই গুণক্ষোভ হইয়া থাকে। ইহাই বিশ্ব-সৃষ্টির প্রারম্ভাবস্থা বা ইহাকেই সৃষ্টির সূত্রপাত বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে কথা হইতেছে, আমি ক্ষুদ্র জীব, এত গভীর এই

সৃষ্টিতত্ত্ব বিচারে আমার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন অবশ্যই কিছু আছে! সে প্রয়োজন জীবরূপী এই আত্মার শেষ মুক্তির নিমিত্ত! প্রচলিত কথায় বলে, যাহাতে উৎপত্তি তাহাতেই নিবৃত্তি। সেই কারণ সৃষ্টি-তত্ত্ব বিচারের বিশেষ প্রয়োজনই আছে। কিন্তু সেই মূল সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার করিতে হইলে, লয়তত্ত্ব ধরিয়াই অর্থাৎ প্রতিলোম পথের অনুসরণ করিয়াই আদিতে পৌঁছিতে হইবে। সাধক মুক্তির বিচার কালে যে ক্রমোন্নত সাধনপথে আসিয়া আজ মুক্তির সমীপবর্ত্তী হইয়াছে, বিপরীত গতিতে সেই পথেই মোক্ষ বা তাঁহাতে লীন হইতে হইবে। ইহাই সমীচীন।

"শিবসংহিতায়" শ্রীশ্রীঈশ্বর সেই কথাই বলিয়াছেন:—

চতুর্ব্বিধা সৃষ্টি ও দর্শনশাস্ত্র সমন্বয়।

"অত্র কুণ্ডলিনী শক্তির্লয়ং যাতি কুলাভিধা।
তদা চতুর্ব্বিধা সৃষ্টির্লীয়তে পরমাত্মনি॥"

কুল নামে অভিহিতা কুণ্ডলিনী শক্তি যখন পরম-শিবকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং তাঁহাতেই বিলীন হয়েন, তখন সেই পরমাত্মাতেই তদনুবর্ত্তিনী চতুর্ব্বিধা সৃষ্টি লয় হইয়া থাকে। আবার "শ্রীমদ্ভগবতী-গীতায়" স্বয়ং শ্রীশ্রীজগদম্বাই শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে শক্তি-সমর্পণ-কালে বলিয়াছেন:—

"গচ্ছ ত্বমনয়াসার্দ্ধং সত্যলোকং শুভাশুবৈ।
বীজাচ্চতুর্ব্বিধং সর্ব্বং সমুৎপাদয় সাম্প্রতম্॥"

তুমি ইহাঁকে সঙ্গে লইয়া সত্বর সত্যলোকে গমনকর এবং যে অভুক্ত বীজসমূহ বিদ্যমান আছে, তাহা হইতে চতুর্ব্বিধা সৃষ্টি উৎপন্ন কর।

সৃষ্টির বিলয় কালে যেমন কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি তদনুবর্ত্তিনী চতুর্ব্বিধা সৃষ্টিসহ বিলোমগতিতে পরমশিবে বিলীন হইয়া থাকেন,

সৃষ্টির প্রারম্ভেও সেইরূপ ভাবে সেই আদ্যা মহাশক্তিরই আদেশে অনুলোম গতিতে উক্ত চারিপ্রকার, সৃষ্টি বিকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, বিশ্ব-সৃষ্টি চারি -প্রকার। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে সৃষ্টি অথবা মুক্তিতত্ত্বের আলোচনায় সহসা পরস্পর বিরুদ্ধ-মতেরই পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই কারণ প্রায় সকল দার্শনিক পণ্ডিতের দৃঢ় ধারণা যে, সপ্তদর্শনের মধ্যে বা সাধারণ-পরিচিত ষড়্দর্শনের মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও মতের একতা নাই। অর্থাৎ এক দর্শন যাহা বলিতেছেন, অন্য দর্শন তাহার বিরুদ্ধ উপদেশই যেন প্রচার করিতেছেন। কিন্তু এইরূপ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ ক্রিয়াবান ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদিষ্ট যথাক্রম সাধনা বিনা কেবল সাহিত্যের ন্যায় দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে দর্শনের প্রতিপাদ্য প্রকৃত-বস্তু-দর্শনের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র ভ্রান্তিদর্শনই স্বাভাবিক! রীতিমত সাধনার সহিত দর্শনকারদিগের উদ্দেশ্য পরিজ্ঞাত হইলে জানিতে পারা যায় যে, কোন দর্শনই কাহারও বিরোধী নহে। তবে দর্শনকারগণ সাধকের অধিকার ও অবস্থানুসারে যে কোনও গ্রন্থের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগাদির ন্যায় সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের প্রথমাদি বিভাগক্রমে কেহ স্থূল, কেহ সূক্ষ্ম, কেহ সূক্ষ্মতর এবং কেহ বা সূক্ষ্মতম বিচারে মূল সৃষ্টি-রহস্যসহ মুক্তিবিধায়ক ব্রহ্ম-নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে-রাজযোগ নির্দ্দিষ্ট "সপ্তজ্ঞানভূমির" সাধন-বিষয়ের আলোচনা-মধ্যেও এই সপ্তদর্শনের ক্রমোন্নতভাবের উল্লেখ হইয়াছে। পাঠকের স্মরণ না থাকিলে এই সময় তাহা পুনরায় একবার

দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন। শ্রীমন্মহর্ষি গৌতমের "ন্যায়" এবং শ্রীমন্মহর্ষি কণাদের "বৈশেষিক, এই উভয় দর্শনই স্থূলেন্দ্রিয়বোধ্য বস্তুনিচয়ের বিচারপূর্ব্বক স্থূলভাবেই ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন*। সুতরাং সপ্তদর্শনের মধ্যে এই দুই খানি দর্শন প্রথম বা নিম্নশ্রেণীর দর্শন বলিয়া কথিত হইয়াছে। তন্ত্রাচার্য্যগণ এই দুইখানিকে "ইচ্ছা দর্শন" বলিয়া উল্লেখ করেন। পূর্ব্বে নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে—"ইচ্ছা ক্রিয়া তথাজ্ঞানং তৎপরং জ্যোতিরোম্ ইতি।" এই ইচ্ছাতেই মহামায়ার প্রথমা শক্তির সূক্ষ্ম বিকাশ। দর্শনগুলির মধ্যে এই দুইখানিতেই উক্ত মহর্ষিদ্বয় পরমাণু-বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া "যৌগিকী-সৃষ্টির" বিচার নির্ণয় করিয়াছেন এবং স্থূল পদার্থ সমুদায়ের নিরূপণসহ ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক স্থূল পথ ধরিয়াই যথাক্রমে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতরাদিতে প্রবেশ করিতে হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব-বিচারের ইহাই প্রথম ক্রম।

এইরূপ শ্রীমন্মহর্ষি কপিলের "সাংখ্য" ও শ্রীমন্মহর্ষি পতঞ্জলির "যোগ" দর্শনদ্বয়, সপ্তদর্শনান্তর্গত দ্বিতীয় বা মধ্য শ্রেণীর

---

* মহর্ষি গৌতমের "ন্যায়" ও মহর্ষি কণাদের "বৈশেষিক" দর্শনের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। উভয়েরই মত প্রায় একপ্রকার। উভয়েই পরমাণু-পদার্থবাদী। গৌতম বলেন—"জগতের উপদান-কারণ পরমাণু সৎ তাহা নিরবয়ব, অবিভাজ্য, অজ ও নিত্য বস্তু কিন্তু, জড়—এই কারণ ইহার স্বাধীন ক্রিয়া নাই; ইহার নিমিত্ত-কারণ ঈশ্বর, তাঁহারই ইচ্ছায় পঞ্চভূতের পরমাণুসমূহ মিলিত হইয়া জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরমাণুর দুইটীর যোগে এক দ্ব্যণুক হয় ও তিনটী দ্ব্যণুকের যোগে এক ত্রসরেণু হয়, এই ত্রসরেণুই জীবের

দর্শন বলিয়া কথিত। "ইচ্ছা-ক্রিয়াদি" পূর্ব্বোল্লিখিত তন্ত্র-বচন অনুসারে তন্ত্রাচার্য্যগণ এই উভয় দর্শনকে 'ক্রিয়া-দর্শন' বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রথম শ্রেণীর দর্শনদ্বয় অপেক্ষা এই দুইএর মধ্যে সূক্ষ্মতর বিচার নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া স্থূল "যৌগিকী-সৃষ্টির" উপর "পরিণাম-সৃষ্টি" নামক সূক্ষ্মতর বিচার-সিদ্ধ ব্রহ্মনির্ণয় (ক) করিয়াছেন।

অনন্তর তৃতীয় শ্রেণীর তিন খানিই মীমাংসা দর্শন। তন্ত্রাচার্য্যগণ সেই "ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং" তন্ত্র-বচন-অনুসারে এই তিন খানিকেই "জ্ঞান-দর্শন" বলিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞান আবার

নয়নেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া থাকে। এই ভাবপরমাণুজাত ত্রসরেণু ক্রমে মিলিতে মিলিতে মহাবয়বী পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিরাট ব্রহ্মাণ্ডরূপে উৎপন্ন হয়। অতএব অবয়বী যে কোন বস্তুই উক্ত পরমাণুর সমাহারভূত বলিতে হইবে। সুতরাং তাহাদের পরস্পর বিভেদেই সে বস্তুর পুনরায় বিনাশ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে যখন জগতের পরমাণুসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন

(ক) সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মধ্যে ভেদ অতি অল্প। সাংখ্যের সমস্ত তত্ত্বের উপর পতঞ্জলি একটী 'ঈশ্বরতত্ত্ব' স্বীকার করিয়া তাহারই সাধন ও সিদ্ধির উপায়স্বরূপ অমূল্য যোগ-রত্নের উপদেশ দিয়াছেন। পতঞ্জলির এই 'ঈশ্বর' অদৃষ্টের পরিচালক, কিন্তু গৌতমের ঈশ্বর পরিদৃশ্যমান জগতের কর্ত্তা। অতএব পতঞ্জলির ঈশ্বরই চৈতন্য ও অপরিণামী তদ্ব্যতীত সমস্তই পরিণামী। পরিণামীতত্ত্বকে অপরিণামী ও অনাত্মাকে আত্মা মনে করাই বন্ধন। তত্ত্বজ্ঞান-বিচার ও যোগসাধনা দ্বারা সমাধিলাভ হইলেই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। সেই স্বরূপ-বোধই কৈবল্য বা মুক্তি।

সূক্ষ্মবিচারে ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান প্রাধান্যে বা কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান-ভেদে ত্রিবিধ। সেই কারণ শ্রীমন্মহর্ষি. জৈমিনী ও শ্রীমন্মহর্ষি ভরদ্বাজের "কর্ম্ম মীমাংসা"-যুক্ত জ্ঞান-দর্শন, "পূর্ব্বমীমাংসা"‡ বলিয়াও ইহা প্রসিদ্ধ। শ্রীমন্মহর্ষি অঙ্গিরা, শ্রীমন্মহর্ষি শাণ্ডিল্য ও

হইয়া নিজ কারণ বস্তুতে ফিরিয়া যায়, তখনই জগতের প্রলয় হইয়া থাকে।"

মহর্ষি গৌতম ষোড়শ প্রকারের পদার্থবাদী। যথা, প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ-স্থান। এই ষোড়শবিধ পদার্থের মধ্যে "প্রমেয়" নামক পদার্থতত্ত্বের জ্ঞানই

---

‡ মহর্ষি জৈমিনী আদি কর্ম্ম-মীমাংসা-দর্শনে শব্দ-প্রমাণ বেদ ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানকেই বিশেষভাবে আশ্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই দর্শনে কর্ম্মকে প্রধান করিয়া যে অপূর্ব্ব জ্ঞান-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সাধনা ব্যতীত সাধারণে আদৌ বুঝিতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন, কোনও কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না, অতএব এই বিশ্বসৃষ্টির কর্ত্তৃত্বেরও কারণ আছে। যাহা এক কর্ম্মের কর্ত্তা, তাহা আবার অন্য একটী কর্ত্তার কর্ম্ম। অতএব এই ভাবে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়রূপ ধারাবাহিক কর্ম্ম-প্রবাহ যেন নদীর স্রোতের ন্যায় অনাদি ও অনন্তকাল ব্যাপী। কর্ত্তৃত্ব এই কর্ম্মস্রোতের একটী অবস্থা বা অংশ-বিশেষ-মাত্র। কর্ম্ম হইতেই উন্নতি, অবনতি, সুখ, দুঃখ, ভয়, বন্ধন, ক্রমে গুরুত্ব, ঈশ্বরত্ব ও মুক্তিত্ব লাভ হয়। বাস্তবিক প্রথমে সকাম পরে নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনাতেই জীব শুদ্ধ-বুদ্ধি হইয়া মুক্ত হইতে সমর্থ হইতে পারে।

শ্রীমদ্দেবর্ষি নারদাদির ভক্তি বা উপাসনা-দর্শন "মধ্য মীমাংসা" অথবা "দৈবী মীমাংসা" যুক্ত জ্ঞান-দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দর্শন একেশ্বর-বাদী জৈন ও বৌদ্ধদিগের প্রাধান্য-সময়ে এক-প্রকার লুপ্ত বা পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছিল; জৈন মুনিগণের দ্বারা বহু কাল ধরিয়া "ভক্তি-দর্শন" ব্যতীত অন্য ছয় খানি আর্যদর্শন শাস্ত্রেরই রীতিমত পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল; সেই কারণ এখনও সাংখ্যাদি দর্শনের ভাষ্যকার-মধ্যে জৈন-সাধু "বিজ্ঞান ভিক্ষু" আদির নাম প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত-বিরোধী দৈবী অর্থাৎ দেবতা-সম্বন্ধীয় দর্শন বা "ভক্তি মীমাংসা" দর্শন বহুকাল-ব্যাপী আলোচনার অভাবেই একপ্রকার লুপ্ত ও অপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অতএব ক্রমে উহার নামও লোকে ভুলিয়া

মুখ্যভাবে মুক্তির হেতু, অন্যগুলির জ্ঞান পরম্পরাসম্বন্ধেই মুক্তির হেতু। প্রমেয় আবার দ্বাদশবিধ, যথাঃ— আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ। আত্মা দ্রষ্টা ও ভোক্তা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া আত্মা ভোগ করে, তাহাই শরীর; যাহা দ্বারা ভোগ করেন তাহাই ইন্দ্রিয়। ভোগ্য বস্তুর নাম অর্থ, ভোগ্য বস্তুর উপলব্ধির নাম বুদ্ধি। যে বস্তুর সাহায্যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের বোধ হয় বা যাহার অভাবে বিষয়ের বোধ হইতে পারে না, তাহাই মন। শারীরিক মানসিক ও বাচিক ভেদে প্রবৃত্তি তিন প্রকার। রাগ বা অনুরাগ, দ্বেষ ও মোহ, ইহাকেই দোষ বলে, ইহাই প্রবৃত্তির হেতু। জন্ম-মৃত্যুর নাম প্রেত্যভাব। প্রবৃত্তি হইতে যে সমুদায় সুখ দুঃখের অনুভব হয় তাহাকে ফল বলে। অসৎকর্ম্মফলের নাম দুঃখ। সুখের অস্তিত্ব না থাকিলে দুঃখ হয় না, সুখের শেষ দুঃখ,

গিয়াছে; কিন্তু দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এখনও সাধারণভাবে পঞ্চ মহা-যজ্ঞ উপলক্ষে ব্রহ্মযজ্ঞে যে আগু-বচনরূপ প্রত্যেক শাস্ত্রের সংক্ষেপ-মন্ত্র প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহাতে "অথাতো দৈবীমীমাংসা" রূপ সূত্রের উল্লেখ আছে। যাহা হউক সেই "দৈবী বা ভক্তি মীমাংসাই" চিরকাল "মধ্য-মীমাংসা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই স্থলে সপ্ত দর্শন বা ষড়-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনার প্রসঙ্গে উল্লেখকরা আবশ্যক যে, সপ্তদর্শনই সাধারণভাবে অন্যান্য সকল আর্ষ-শাস্ত্রের মধ্যেই ষড় দর্শন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যেমন যোগশাস্ত্রে মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সপ্তচক্র হইলেও সাধারণতঃ ষট্ চক্র-সাধনা' বা ষট্‌চক্র ভেদ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হয়। অর্থাৎ মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত ষট্‌চক্র ধরা হয়, সহস্রারকে তাহার অতীত স্বতন্ত্র বা চক্রাতীতচক্র বলে অথবা উক্ত সপ্তচক্রান্তর্গত সপ্ত

অতএব সুখও দুঃখের কারণ। এই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম অপবর্গ বা মুক্তি। এই ষোড়শ প্রকার পদার্থের জ্ঞানদ্বারাই জীব জন্ম-মৃত্যুর মূল-কারণ দেহাত্ম-বোধকে পরিত্যাগ করিতে পারে। তাহা হইলেই তাহার সমস্ত দুঃখের একান্ত অবসান হইয়া মুক্তিলাভ হয়।

মহর্ষি কণাদ উক্ত ষোড়শ পদার্থের পরিবর্ত্তে ষট্-পদার্থ-বাদী। কাহারও কাহারও মতে তিনি সপ্ত-পদার্থ বাদী। তবে ইহাতে বিশেষ গোলের কোন কারণ নাই। কণাদের এই সপ্ত পদার্থের মধ্যেই গৌতমের ষোড়শ পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। কণাদের সপ্ত পদার্থ যথা:—দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। যাঁহারা ষট্ পদার্থের পক্ষপাতী তাঁহারা এতন্মধ্যে অভাবকে উক্ত পদার্থের মধ্যে ধরেন না। (১) 'দ্রব্য' আবার নয় প্রকার, যথা :—

শিবের অস্তিত্ব সতত বিদ্যমান থাকিলেও সহস্রারের অন্তর্গত পরম-শিবের উল্লেখ না করিয়া শাস্ত্রে ব্রহ্মাদি ষট্-শিবেরই* উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও মধ্যমীমাংসা বা ভক্তিমীমাংসা পর্য্যন্তই ষড়্দর্শন বলিয়া প্রাচীন কালে উক্ত ছিল; "উত্তর বা ব্রহ্মমীমাংসা" অথবা বেদান্তশাস্ত্র সর্ব্বদর্শনাতীত দর্শন বলিয়া চিরকাল বিবেচিত হইত। 'বেদান্ত' এই শব্দ-মাত্রই তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ। বাস্তবিক দর্শন বা 'দেখা' বলিতে ষট্চক্র বা ষষ্ঠচক্র পর্য্যন্তই হয় অর্থাৎ ষষ্ঠ সংখ্যক ভক্তিদর্শনের আধারে তটস্থে ভক্ত ভগবানের দর্শনজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হন, তাহার পর বেদ বা জ্ঞানের

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুতের পরমাণুগুলিই নিত্য, আকাশ সর্ব্বস্থানেই নিত্য, এসম্বন্ধে কাহারও কাহারও মতভেদ আছে। কাল, দিক্, আত্মা ও মন সর্ব্বদা নিত্য। আত্মা ও মন সম্বন্ধে গৌতম ও কণাদের মতভেদ নাই। (২) 'গুণ' চতুর্ব্বিংশতি প্রকার, যথা—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। পূর্ব্বকথিত দ্রব্যগুলির মধ্যে এই সকল গুণের কিছু না কিছু বিদ্যমান আছে। (৩) 'ক্রিয়া' পাঁচ প্রকার যথা:— উৎক্ষেপন, অবক্ষেপন, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। (৪) 'সামান্য' অর্থে জাতি, ইহাও নিত্য। ইহা আবার দুই প্রকার, যথা পরা ও অপরা। (৫) 'বিশেষ' পদার্থই

* ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।

• ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্‌শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

অন্তে কে কাহাকে আর দর্শন করিবে। তখন যে বেদান্ত-সিদ্ধ অপরোক্ষে অদ্বৈত অনুভূতি মাত্র! সেই কারণ মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সপ্তচক্রের ন্যায়, 'ন্যায়' শাস্ত্র হইতে 'বেদান্ত' শাস্ত্র পর্য্যন্ত সপ্তদর্শন হইলেও সাধারণতঃ ষড়্‌চক্রের সহস্রারের অনুরূপ বেদান্ত-পরিত্যক্ত ষড়দর্শন বলিয়াই প্রাচীন কালে প্রসিদ্ধ-ছিল। এ দুর্দ্দিনে শিবপ্রোক্ত তন্ত্রই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বকথিত মত কেবলমাত্র একেশ্বরবাদী জৈন-মুনিগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বিরোধী ভক্তি বা দৈবীদর্শনকে নষ্ট করিয়া ষড়দর্শন পূর্ণ করিবার জন্য তাহার স্থলে বল ও কৌশলপূর্ব্বক বেদান্তদর্শনকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সহস্র সহস্র বৎসর তাঁহাদেরই প্রাধান্যে এবং তাঁহাদেরই কৃত ভাষ্য ও টীকার সহায়তায় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হওয়ায় বেদান্ত-

---

পরমাণু-সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। পরমাণু নিরবয়বী বলিয়া তাহাদের প্রকারভেদ না থাকিলেও পরমাণুর সমষ্টিজাত দ্রব্যাদির প্রকার-ভেদে উহাদের পার্থক্য বোধ করিতে পারা যায়। যে অতীন্দ্রিয়-পদার্থ পরমাণুরও প্রকার-ভেদ সংঘটন করে, তাহাই 'বিশেষ' শব্দ-বাচ্য। তাহাই মহর্ষি কণাদের দর্শনের বিশেষত্ব বলিয়া তাঁহার দর্শনের নাম 'বৈশেষিক' হইয়াছে। (৬) সমবায়, অবয়বীর সহিত অবয়বের, জাতির সহিত ব্যক্তির, গুণ ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের এবং বিশেষের সহিত নিত্য পরমাণুর সম্বন্ধের নাম 'সমবায়'। (৭) অভাব দুই প্রকার যথা সম্বন্ধের অভাব ও ভেদ। ইহাদেরও সূক্ষ্ম বিভেদ আছে। এই পদার্থতত্ত্বের জ্ঞানই মুক্তির কারণ। আত্মা ও অনাত্মার জ্ঞান হইলেই জীব অনিত্য অনাত্ম-পদার্থ ত্যাগ করিয়া আত্ম-সাক্ষাৎ করিতে পারে বা মুক্তি লাভ করে।

শাস্ত্র উক্ত দর্শন ষট্‌কেরই অন্তর্ভূক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত পূর্ব্ববর্ণিত সহস্রারচক্রের ন্যায় ষড়্‌দর্শনাতীত দর্শন শাস্ত্র। উহা সেকালে ষড়্‌দর্শনের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। উহা ইতিপূর্ব্বে-কথিত কেবল জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের সমাধিযুক্ত-দশায় অনুভাব্য বলিয়া ষড়্‌দর্শনের অতীত শাস্ত্র বা অন্তিম-দর্শন বলিয়া পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিগণ কর্তৃক কথিত। যাঁহারা কেবলমাত্র এক নির্গুণ ব্যতীত সগুণ ভাবযুক্ত ভগবান বা দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা স্বভাবতঃ ভক্তি-শাস্ত্রকে ত অবহেলা করিবেনই। ভগবানকে লইয়াই ভক্তি। যখন ভক্ত ভগবানের সমন্বয়ে একেবারে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়া যায়, তখন ভক্তি বলিয়া কোন ক্রিয়া ত আর উভয়ের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারে না। সুতরাং ভক্তি-শাস্ত্র একেশ্বরবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে তখন একপ্রকার নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তু!

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসের এই "উত্তর বা ব্রহ্মমীমাংসা" অথবা "বেদান্ত-দর্শন" যাহা পরবর্ত্তী সময়ে পরমপূজ্যবর শঙ্করাবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যদেব স্বকীয় ভাষ্যসহ জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাই এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সপ্তম দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ। জৈন মুনিদিগের সিদ্ধান্ত-বিরোধী ভক্তি-দর্শন-সূত্রগুলি সনাতন ষড়্‌দর্শন-শাস্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কারণ এই সপ্তম বা দর্শনাতীত অন্তিম-দর্শন খানিকে টানিয়া হিচ্‌ড়াইয়া পুরিয়া দিবার কারণ পরবর্ত্তী সময়ে ভক্তিবাদী সাধনপরায়ণ মুমুক্ষুদিগের মধ্যে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই কারণেই মহাত্মা রামানুজদেব বেদান্তের বিশেষ ভাষ্য দ্বারা "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" মত প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি গুণির গুণকে নিত্য অভেদ

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মই ভোগ্য ও ভোক্তা নিয়ামকরূপে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। ভোগ্যবস্তু জড় এবং ভোক্তা নিয়ামক চৈতন্য। কিন্তু জড়ের কোনও পৃথক সত্ত্বা নাই। জড়ত্ব সংরূপে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের একটী বিশেষণ মাত্র। বিশেষণ বা গুণ স্থূল সত্তায় কখন প্রকাশিত হয় কখন বা সূক্ষ্ম-সত্তায় অবস্থিত থাকে। স্থূল সত্ত্বাতেই জগতের বিকাশ, সূক্ষ্ম সত্তায় জগতের বিলয় সাধিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম নিগুর্ণ অর্থে তাঁহার কোনও গুণ নাই বা কোনও বিশেষণ নাই, তাহা নহে। তিনি বলেন—

"নির্গতো বিশেষঃ যস্মাৎ তৎ ইতি নিগুর্ণং"

অর্থাৎ যাহা হইতে গুণ বা বিশেষণ নির্গত হয় বা হইয়াছে তিনিই নিগুর্ণ। ব্রহ্মের এই গুণ বিশেষণ বা শক্তি স্বীকার না করিলে সমস্তই মিথ্যা হইয়া যায়। বাস্তবিক সাধকের ভক্ত ভগবান সম্বন্ধ যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ অদ্বৈত জ্ঞানত হইতে পারে না কাজেই "একমেবাদ্বিতীয়" রূপে অপরোক্ষ জ্ঞানানুভূতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভক্তিদর্শনের অভাবে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের গুণরূপ বিশেষত্ব-বোধক ষড়দর্শনান্তর্গত বেদান্ত ভাষ্যে "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" মতের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই কারণ রামানুজদেব বলিয়াছেন যে, জীব যখন সাধনা দ্বারা অনন্যভক্তি লাভ করেন, তখনই তাহার মুক্তিদ্বার উন্মুক্ত হয়। সেই পরাভক্তিবলেই সাধক মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। মধ্যমীমাংসায় বা ভক্তিমীমাংসায় কিন্তু এই সকল কথা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ আছে। যাহা হউক পূর্ব্ব ও মধ্য-মীমাংসা সহ এই উত্তরমীমাংসাই তৃতীয় শ্রেণীর দর্শনত্রয়। এই তিন খানি পূর্ব্বকথিত দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শন অপেক্ষা ক্রমান্বয়ে

অতি গুপ্তভাবে রক্ষিত ও আলোচিত হইবার কারণ তাঁহাদের পক্ষে কোনদিনই দার্শনিক শঙ্কার কোনও কারণ উপস্থিত হয় নাই ; তবে নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, তন্ত্রের সেই গভীর জ্ঞানকাণ্ডও অধিকারী অভাবে গুরুপরম্পরায় ক্রমেই গুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই কারণ সাধারণে এমন কি নানাশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সাধকগণও দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে এমন অপূর্ব্ব সমতা বিষয়ে কিছুমাত্র অবগত নহেন। ফলে গুপ্ত সাধন-রহস্য-বিহীন দর্শনশাস্ত্রালোচনায় কেবলমাত্র বাচিক জ্ঞান হেতু পরস্পর দ্বন্দ্ববোধ হইয়া থাকে। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

> তন্ত্রাণি গুরুগম্যানি শিবোক্তানি বিশেষতঃ।
> কবিভির্নৈব বুধ্যন্তে শাস্ত্রৈরর্থা যথোদিতা॥"

শিববক্ত্র-বিনির্গত তন্ত্র-শাস্ত্রের অর্থ কেবলমাত্র গুরুপরম্পরায় পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহা কবিকল্পনার বস্তু বা বিদ্বজ্জনের বাক্য অর্থাৎ আভিধানিক জ্ঞান বা শব্দার্থের অন্তঃস্থ নহে। যাহাহউক সেই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিতত্ত্ব যাহা তন্ত্রশাস্ত্রের অপূর্ব্ব জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে, সমুন্নত সাধক সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য এক্ষণে সংক্ষেপে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপা মূলপ্রকৃতি এবং তাঁহা হইতে আবির্ভূতা তদ্রূপা আদ্যাশক্তির বিষয় বলা হইয়াছে। তাহাই বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভাবস্থা। তন্ত্রে শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

> "সৃষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি প্রকৃত্যামনুবর্ত্তত।
> অদৃষ্টাজ্জায়তে সৃষ্টিঃ প্রথমে তু বরাননে॥

বিবর্ত্তভাবে সম্প্রাপ্তে মানসী সৃষ্টিরুচ্যতে ।
তৃতীয়ে বিকৃতিং প্রাপ্তে পরিণামাত্মিকা তথা ॥
আরম্ভসৃষ্টিশ্চ ততশ্চতুর্থে যৌগিকী প্রিয়ে ।
ইদানীং শৃণু দেবেশি তত্তত্ত্বঞ্চ বিশেষতঃ ।
সৃষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি তথাপূর্ব্বং সমাগতঃ ॥"

দেবি, মূল প্রকৃতি হইতে চারিপ্রকার সৃষ্টি অনুবর্ত্তিত হইয়াছে। হে বরাননে তাহার মধ্যে মূল প্রকৃতি হইতে বিশ্বসৃষ্টি বিধানার্থ যে সৃজনীশক্তির প্রথম আবির্ভাব বা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাময়ী প্রকৃতিতে যে প্রথম গুণক্ষোভ, তাহাই সেই প্রথম সৃষ্টি। মহা-প্রলয়ের সময় বীজাদি সমন্বিত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মূল প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতিও পরে পরমব্রহ্মে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইতি-পূর্ব্বে উদ্ধৃত শিবসংহিতায় শ্রীসদাশিববাক্যেও এই ভাবেই উক্ত হইয়াছে যে,

"তদাচতুর্ব্বিধা সৃষ্টি র্লীয়তে পরমাত্মনি।"

অর্থাৎ তখন সেই পরমাত্মাতেই তদনুবর্ত্তিনী চতুর্ব্বিধা সৃষ্টি লীন হইয়া থাকে। আবার নূতন সৃষ্টির কল্পনাকালে কালের সহকারিতায় অনাদি ও অভুক্ত বীজসমষ্টি যাহা পূর্ব্বে প্রকৃতিতে পরে প্রকৃতি সহ পরব্রহ্মেলীন হইয়াছিল, তাহাদের অদৃষ্টনিবন্ধন আদ্যাশক্তিতে প্রথম গুণক্ষোভরূপে যে সৃষ্টি হয়, তাহাই উক্ত চতুর্ব্বিধা সৃষ্টির মধ্যে 'সূক্ষ্মতম' প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি, ইহাই অদৃষ্ট-সৃষ্টি নামে তন্ত্রে কথিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবতীগীতার সেই আদ্যাশক্তিই ভগবান ব্রহ্মাকে শক্তি সমর্পণ সময়ে বলিয়াছিলেন ঃ—

"বীজাচ্চতুর্ব্বিধং সর্ব্বং সমুৎপাদয় সাম্প্রতম্ ॥"

অর্থাৎ যে অভুক্ত বীজসমূহ বিদ্যমান আছে তাহা হইতে চতুর্ব্বিধা সৃষ্টি উৎপন্ন কর। ইহা অবশ্য সেই চতুর্ব্বিধা সৃষ্টিরই স্থূলভাব।

অনন্তর বিবর্ত্তভাবে যে সৃষ্টি হয়, তাহাকে মানসীসৃষ্টি বলে। বৈদান্তিকগণও এই বিবর্ত্ত-সৃষ্টিকে মানসীসৃষ্টি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বেদান্তে কথিত আছে ঃ—

"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥"

কোনও এক বস্তু হইতে যদি অন্য বস্তু উৎপন্ন হইয়া সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করে, তবে সেই উৎপন্ন বস্তুকে মূলবস্তুর বিকার বলা যায়। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হইল, দধিকে দুগ্ধের বিকার বলা যায়। আর যে সময় এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইয়াও মূল বস্তুর পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাকেই বিবর্ত্ত বলা যায়। যেমন সহসা এক গাছি রজ্জু দেখিয়া সর্প বলিয়া ভ্রম হইল, চিত্তের মধ্যে তখন সেই রজ্জুই মিথ্যারূপে সর্পের অস্তিত্ব উৎপন্ন করিল বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে রজ্জু রজ্জুই রহিল, তাহার কোনই পরিবর্ত্তন হইল না বা সেই রজ্জু যথার্থ সর্পরূপে পরিণত হইল না। এই অবস্থায় পূর্ব্ব বস্তুর বিবর্ত্তন বলা যায়। এইরূপ প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি হইবার কারণ অদ্বিতীয় অখণ্ড ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব সততই অব্যাহত রহিয়াছে, তবে কেবল অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়া দ্বারা পরিকল্পিত জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্তরূপে আধুনিক বিজ্ঞানসিদ্ধ চলচ্চিত্র বা "বায়োস্কোপের" চিত্রের ন্যায় সমস্তই প্রকৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বস্তুতঃ সেই চিত্রাধার বস্ত্রখণ্ডে তাহার কোন চিহ্নই সংলিপ্ত থাকে না। সে ক্ষেত্রে

পূর্ব্বেও যেমন ছিল, পরেও তেমনি থাকিবে। কেবল ক্রিয়াকালে ছায়াময় ঘটনাবলীর ভ্রান্ত সমাবেশমাত্রই হইয়া থাকে। তাহা দেখিয়া মায়ামুগ্ধ দর্শকের সুখ দুঃখ ভয় ও ক্রোধাদি সকল ভাবই ক্ষণিকের জন্য উৎপন্ন হইয়া যায়। এই ভাবেই পূর্ব্বকথিত সেই রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়ায় যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, পরক্ষণে যেমনই রজ্জুতে সর্পভ্রম তিরোহিত হইল, অর্থাৎ তাহা যে যথার্থ ভয়ের আকর সর্প নহে কেবল তাহার ভ্রান্তিমাত্র বুঝা যাইল তৎপরিবর্ত্তে তাহা যথার্থ রজ্জু বলিয়াই যখন স্থিরনিশ্চয় হইল, তখনই অন্তর হইতে সেই মিথ্যাভয় বিদূরিত হইয়া গেল, কিন্তু সর্পের ভয় ভ্রমজনিত হইলেও সহসা চিত্তের উপর যে আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল, তাহার ফলস্বরূপ চিত্তের চাঞ্চল্য যেরূপ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্তরূপ মায়ার ছায়াময়ী কল্পনাপ্রসূত সংসারচিত্র বা দৃশ্যসমূহ অবিদ্যানাশের পর অলীক প্রতীত হইলেও বহু জ্ঞানানুশীলনপর সাধকও সহসা সেই মায়ার ছলনা চিত্ত হইতে বিলোপ করিতে পারেন না।

"শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে" উক্ত হইয়াছে:—
"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরং
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥"

পরমাত্মার মায়াকেই প্রকৃতি বা বিদ্যা বলে। সেই পরমাত্মা বা মহেশ্বর যখন মায়াবিশিষ্ট হয়েন, তখনই তাঁহাকে মায়ী বলে। সেই মায়াবিশিষ্ট পরমাত্মার অবয়বরূপ বস্তু সমুদায় মায়ার দ্বারা এই জগৎরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহাই ব্রহ্মের বিবর্ত্তস্বরূপ, ইহাই বৈদান্তিকদিগের অনুমোদিত বিবর্ত্তসৃষ্টি। পূর্ব্বোদ্ধৃত

তন্ত্রবচনে ব্রহ্মের বিবর্ত্তভাবে সম্প্রাপ্ত সূক্ষ্মতর এই দ্বিতীয় বা মানসীসৃষ্টির উল্লেখ হইয়াছে।

এই সৃষ্টপদার্থ যখন বিকার প্রাপ্ত হইয়া রূপান্তরে পরিণত হয়, তখন তাহাকে সাংখ্যদর্শনের অনুমোদিত পরিণাম-সৃষ্টি বলা হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত তন্ত্রবচন অনুসারে ইহাই তৃতীয় শ্রেণীর সূক্ষ্ম সৃষ্টির অন্তর্গত। মূলপ্রকৃতি হইতে আদ্যাশক্তি, অনন্তর তদীয় গুণবিক্ষোভসঞ্জাত মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের মতানুসারে এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের উৎপত্তিবিধান পরিণামসৃষ্টি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

যখন পঞ্চীকৃত পরমাণুসমূহের পরস্পরসংযোগে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু-সমূহের উৎপত্তি হইতে থাকে, তখন তাহাকে পূর্ব্বোদ্ধৃত তন্ত্রবচন অনুসারে চতুর্থ শ্রেণীর স্থূল-সৃষ্টি বলা হয় এবং ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের মতানুসারে তাহাই যৌগিকী বা আরম্ভসৃষ্টি বলিয়া কথিত হয়।

এই ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের মহর্ষিদ্বয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রথম শ্রেণীর উপযোগী সূত্রগুলিই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কারণ তাঁহারা পরমাণুর নিত্যতা কল্পনা করিয়া একমাত্র আরম্ভ বা যৌগিকী-সৃষ্টিরই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিচারে তাঁহারা তত্তদ্ প্রণীত গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের উভয় মহর্ষিই ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিচার করিতে করিতে দর্শন আলোচনার দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযোগী সূত্রসমূহ রচনা করিয়া

পরিণাম-সৃষ্টি-তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইহারা সূক্ষ্মতর বিচারে বেদান্তের মত ব্রহ্মমীমাংসার তৃতীয় শ্রেণীর বিবর্ত্তসৃষ্টি নিরূপণে অগ্রসর হন নাই। বাস্তবিক বিবর্ত্ত-সৃষ্টিবিচার দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নকারীদিগের পক্ষে উচ্চ অধিকার বলিতে হইবে। কারণ ইহাতে যৌগিকী-সৃষ্টি হইতে ক্রমে পরিণাম-সৃষ্টি এবং বিবর্ত্ত-সৃষ্টি পর্য্যন্ত তিনই নিরূপিত হইয়াছে। পরন্তু ইহা অথবা উক্ত ত্রিবিধ শ্রেণীর দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহ অপেক্ষা সূক্ষ্মতম বিচারে সাক্ষাৎ সদাশিব তন্ত্রোপদেশে চতুর্থ বা অন্তিম দার্শনিক সিদ্ধান্তে অদৃষ্ট-সৃষ্টি নিরূপণ বিষয়ে বর্ণন করিয়াছেন এবং সকল দর্শনেরই বিচারজ্ঞানসহ অধিকার হিসাবে সাধকগণকে ইহার ক্রিয়াসিদ্ধাংশের উপদেশ করিবার জন্য অভিজ্ঞ গুরুমণ্ডলী-কেই আদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা সমষ্টি ও ব্যষ্টির বিচারে তাই উপদেশ করেন যে, যেমন সমষ্টিতে বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি ও কালে বিরাট বিশ্বের বিলয় হয়, ব্যষ্টিতেও সেই ভাবে সৃষ্টির চিরন্তন ক্রিয়া সমভাবে চলিতেছে; কারণ সমষ্টি যে ব্যষ্টিরই সমাহার মাত্র! মুক্তি উপলক্ষে উক্ত সমষ্টিভূত ব্যষ্টি বিরাটের অন্তর্ভুক্ত ব্যষ্টি জীব যোগীবররূপে জীবন্মুক্ত শ্রীগুরুনির্দ্দিষ্ট যথাক্রম সাধনার ফলে পূর্ব্বকথিত চতুর্ব্বিধা সৃষ্টির বিলয় দ্বারাই মুক্তিসিদ্ধ হইয়া থাকেন। সাধনার সেই অতি গূঢ়রহস্য ভাষায় ব্যক্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহা কেবলমাত্র অনুভাব্য বিষয়। শ্রীগুরুর কৃপায় দৃঢ় সাধনার দ্বারাই তাহা আপনা আপনি অন্তরে অনুভব হইয়া থাকে। অনুভব-কর্ত্তারও তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার শক্তি থাকে না। এই কারণ শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যা গণিকাইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥"

গণিকাগণের মুখমণ্ডলে যেমন কোনও অবগুণ্ঠন নাই, দর্শনাভিলাষী ইচ্ছা করিলেই তাহাদের মুক্ত রূপমাধুরী দর্শন করিতে পারেন, বেদাদি দর্শন ও পুরাণাদি পবিত্র ঔপপত্তিক শাস্ত্রসমূহ সেইরূপ যেন অবগুণ্ঠন পরিশূন্য, অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানাভিলাষী সাধক ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলেই সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার সাধারণ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, কিন্তু শিবপ্রোক্ত শাম্ভবী বিদ্যারূপ উক্ত শাস্ত্রসমূহের ক্রিয়াসিদ্ধাংশ (Practical parts) ঠিক সেরূপ নহে। তাহা প্রকৃতই কুলবধূর ন্যায় যেন অসূর্য্যম্পশ্যা বা সাধন-বস্ত্র-সমাবৃতা। সাধনপথে নিতান্ত আত্মীয়-রূপে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে না পারিলে, সেই স্নিগ্ধ-কোমল জগন্মোহিনী রূপের সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে না। বেদাদি-শাস্ত্র দর্শন ও পুরাণাদি ভগবদ্ভক্তির প্রস্রবণস্বরূপ প্রবাহিত রহিয়াছে, সে প্রবাহসলিলে ভক্ত সাধক অবগাহন করিলে ক্রমে সেই জননীরূপা সাধন-বিজ্ঞানময়ী ক্রিয়াসিদ্ধ শাস্ত্রের সন্দর্শন করিবার অভিলাষ জন্মে, তখন সম্পূর্ণ ক্রিয়াতন্ত্রাভিজ্ঞ সিদ্ধ গুরু-দেবের কৃপায় শম্ভুবর্ণিত সেই গুপ্ত শাস্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মুক্ত ও গুপ্তভেদে বিভিন্নমুখী আর্য্যশাস্ত্রসমূহের একটী বাহ্য বা বহির্ম্মুখী অঙ্গ অন্যটী তাহার অন্তরঙ্গ। শ্রীসদাশিব তাই শাস্ত্রের বাহ্যরূপ দর্শনাদি শাস্ত্রগুলিকে 'গণিকাইব' বলিয়াছেন আর তাহারই গুপ্ত অন্তর-বিদ্যাকে বা সাধনাদ্বারা অনুভাব্য বিষয়কে 'কুলবধূরিব' শাম্ভবী-বিদ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত

অধিকারী না হইলে এই গুপ্ত সাধনার উপদেশ কাহাকেও প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। এই হেতু ইহা সম্পূর্ণ গুরুমুখগম্য বলিয়া শিবের আজ্ঞা আছে। এতদ্ব্যতীত যোগসিদ্ধির ফলস্বরূপ অপূর্ব্ব আত্মজ্ঞানানুভব সিদ্ধবস্তু, তাহা বাক্য বা ভাষায় প্রকাশ করাও যে অসম্ভব, তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। যাহা ভাষায় প্রকাশ করা চলে না অথবা অন্য কোনরূপেই যাহা কাহারও চক্ষুরাদি কোনও স্থূল ইন্দ্রিয়গম্য করিতে পারা যায় না, তাহা যে স্বাভাবিক-রূপে আর্য্য কুলবধূগণ অপেক্ষাও গোপনীয়া তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই কোন সময় এক সিদ্ধ যোগী মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন:—

"পুথী মেরে থূতী, বেদ পঢ়ে মৌজুর।
কথ্‌নীকে ঘর বহুৎ মিলে কর্‌নীকে ঘর দূর॥"

অর্থাৎ পুস্তক বা পুঁথি পড়িয়া কোন যোগ সাধনাই হয় না। আমার থুতি অর্থাৎ থুতু বা এই মৌখিক উপদেশরূপে গুরুবাক্যই তৎপক্ষে একমাত্র অবলম্বনীয়। চারি বেদাদি শাস্ত্রসমূহ পাঠ করাত মুটে মজুরের কার্য্য অর্থাৎ যে কেহ পরিশ্রম করিয়া বেদ-পাঠ করিবে, তাহার বেদাদিশাস্ত্র কণ্ঠস্থ হইবে মাত্র, তাহাতে তাহার রহস্য অনুভব কি হইবে? "সংসার কিছুই নয়" বলিলে সংসার লোপ হইয়া যায় না, "দেহ রূপ আমি নষ্ট" বলিলেই দেহজ্ঞান বিনষ্ট হয় না। তাহা শুধু শাস্ত্র পড়িয়াই সিদ্ধ হয় না, তাহা গুরূপদিষ্ট সাধন-সঙ্কেত-সাপেক্ষ, তাহা যথার্থই অতি দুর্লভ বস্তু। জন্মজন্মান্তরের সাধনার ফলেই তাহা উপলব্ধি হয়। কথ্‌নী বা শাস্ত্রপাঠী শুকপক্ষীর ন্যায় কথক বা বক্তা অনেকই মিলে, কিন্তু প্রকৃত আত্মবিদ্ কর্‌নী বা কর্ম্মী গুরুর সাক্ষাৎকার হওয়া সুকঠিন। যথার্থ কাজের লোক কোথায়?

শ্রীভগবান্ "জ্ঞানসঙ্কলিনীতে" বলিয়াছেন :—

"মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি বৈ বহিঃ।
সারন্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ॥"

চতুর্ব্বেদ ও সমুদায় শাস্ত্র মন্থন করিয়া যোগিগণই তাহার নবনীত-স্বরূপ সারাংশ পান করিতে পারেন, আর তাহার তক্র বা ঘোল-রূপ অসার অংশ যাহা পতিত থাকে, তাহাই তর্কপর শুষ্ক পণ্ডিত বা পাণ্ডিত্যাভিমানী মহাশয়গণ পান করিয়া "পেটঠাণ্ডা" করেন! শঙ্করাবতার শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যদেবও বলিয়াছেন :—

"অনেকশতসংখ্যাভি স্তর্কব্যাকরণাদিভিঃ।
পতিতাঃ শাস্ত্রজালেষু প্রজ্ঞয়া তে বিমোহিতাঃ॥"

বহুশতসংখ্যক তর্ক ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের কেবল আলোচনাপূর্ব্বক মনুষ্যগণ শাস্ত্রজালে পতিত হইয়া বিমোহিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক শাস্ত্রালোচনার সহিত গুরু-নির্দ্দিষ্ট গূঢ় সাধনা ব্যতীত কিছুতেই প্রকৃত শাস্ত্র-জ্ঞান হইতেই পারে না। আক্ষেপের বিষয় অভিজ্ঞ সাধকাভাবে বহুকাল হইতে রীতিমত সাধনাসহ দর্শনাদি-শাস্ত্রের পঠন-পাঠন লোপ হওয়ায় দার্শনিক-জ্ঞান-বিষয়ে এতাধিক মতানৈক্য ও অসাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়াছে।

তন্ত্রক্রিয়াবান পরাভক্তিপরায়ণ সাধক তাই মাতৃভক্তিতে তন্ময় হইয়া গাহিয়াছিলেন :—

"দীনতারিণী দুরিত হারিণী সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণ ধারিণী
সৃজন-পালন-নিধন-কারিণী সগুণ নির্গুণা সর্ব্বস্বরূপিনী।
ত্বংহি কালী তারা পরমা প্রকৃতি, ত্বংহি মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি
ত্বংহি জলস্থল অনিল অনল, ত্বংহি ব্যোমকেশ-প্রসবিনী।

সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়, তন্নতন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদাধ্যায়,
বৈশেষিক বেদান্ত ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারেনি,
নিরুপাধি আদি অন্তরহিত, করিছ সাধক জনার হিত,
গণেশাদি পঞ্চ রূপে কাল বঞ্চ কালভয়হরা ত্রিকালবর্ত্তিনী ।
সাকার সাধকে তুমি যে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয় ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময়, সেই তুমি নগতনয়া জননী ।
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সেই অবধি সে পরব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয় অনির্ব্বচনীয়, সকলি মাতা ত্রিলোকব্যাপিনী ॥”

তন্ত্রে সৃষ্টির ক্রম ও তন্মাত্রাদির বিচার

যাহাহউক ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মহাপ্রলয় কালে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাময়ী মূলপ্রকৃতি পরমপুরুষে প্রতিলোম-ভাবে লয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তৎকালে তদাত্মক রজোগুণ সত্ব গুণে, সত্বগুণ তমোগুণে লয় হইয়া থাকে এবং সেই তমোগুণও পরিশেষে তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়। আবার নূতন সৃষ্টির সময় সমাগত হইলে, অথবা অদৃষ্ট নিবন্ধন জীবসৃষ্টির অনুলোম ভোগকাল সমুপস্থিত হইলে বা তাঁহার ইচ্ছাশক্তির পুনরুদয় হইলে অর্থাৎ যখন ক্রমে ক্রমে আত্মা-শক্তিরূপ হইতে তাঁহার প্রথম গুণক্ষোভ হয়, তখন প্রথমে তমোগুণের আধিক্যই আবির্ভাব হইয়া থাকে। তন্ত্ররহস্যে কথিত আছে—আদ্যাশক্তি হইতেই প্রথম আবির্ভূত তমোগুণে চৈতন্যময়ী আদ্যাশক্তি স্বয়ং অনুপ্রবিষ্টা হইয়া বিশ্বসৃজনে তৎপরা হইলেন। এ-স্থলে তমোগুণ অর্থে মহাকাল জানিতে হইবে। “সাধন প্রদীপে” দক্ষিণকালিকা রণরহস্যে সেই কারণেই বলা হইয়াছে যে “তুমি মহাকালকেও কলন বা গ্রাস কর, অর্থাৎ তোমাতেই তাঁহাকে লয় করিয়া লও বলিয়া তুমি কালিকা, আবার

সৃষ্টির নূতন কল্পে এই মহাকালকে তুমিই প্রথমে প্রসব কর, অর্থাৎ তোমার প্রথম গুণক্ষোভ বশতঃ তোমা হইতেই তমোগুণ-প্রধানাত্মক মহাকালরূপে আবির্ভাব হইলে চৈতন্যরূপিনী তুমিই সেই কালের সাহায্যে পুনরায় বিশ্বসৃষ্টি সম্পাদন কর বলিয়া তুমি আদ্যাশক্তি বা আদ্যাকালী।" সেই মহাকালরূপী তমোগুণে চৈতন্যময়ী অনুপ্রবিষ্টা হইলে বা তাঁহাতে যেন উপগতা হইলে, নাদ বা মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। সেই নাদ বা মহত্তত্ত্বই রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণ-ভেদে পরে বিভক্ত হইয়া থাকেন। সাংখ্য-দর্শনে এই ত্রিবিধ নাদকেই যথাক্রমে রাজসিক-মহত্তত্ত্ব ও সাত্ত্বিক-মহত্তত্ত্ব এবং তামসিক-মহত্তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিযাছেন।

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে।"

অর্থাৎ প্রথমে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পরে তিনি নির্গুণ-ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তি হইয়াছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, প্রথমে গুণত্রয়ের বিক্ষোভ-সমষ্টিরূপ মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। সেই মহত্তত্ত্ব পরে রাজসিক, সাত্ত্বিক ও তামসিক-ভেদে বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্ম-ব্রহ্মা, সূক্ষ্ম-বিষ্ণু, সূক্ষ্ম-মহেশ্বর অথবা ঐ মূর্ত্তিত্রয়ের আদি বীজ বা বিন্দু উৎপন্ন হইয়াছে। মহত্তত্ত্বকে শাস্ত্রে আবার বুদ্ধিতত্ত্ব বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক এই বুদ্ধিতত্ত্বরূপ মহত্তত্ত্ব বা নাদ হইতে রাজসিক, সাত্ত্বিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ বিন্দু উৎপন্ন হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে এই বিন্দুকে 'অহঙ্কার' বলিয়া উক্ত হইবার কারণ এই ত্রিবিন্দু যথাক্রমে রাজসিক বিন্দু, সাত্ত্বিক বিন্দু ও তামসিক বিন্দু বলিয়া উক্ত হয়। "সারদাতিলকে" শ্রীশ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দু সমুদ্ভবঃ॥
পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ॥
বিন্দুঃ শিবাত্মকং বীজং শক্তির্নাদ স্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥
রৌদ্রী বিন্দোস্ততো নাদাৎ জ্যেষ্ঠা বীজাদজায়ত।
বামা তাভ্যঃ সমুৎপন্না রুদ্রব্রহ্মরমাধিপাঃ।
তে জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মানো বহ্নীন্দ্বর্কস্বরূপিনঃ॥"

সচ্চিদানন্দ-বিভব পরমেশ্বর হইতে যে নাদ বা মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহা হইতে যে বিন্দু বা অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে, সাক্ষাৎ পরশক্তিময় সেই বিন্দু পুনরায় ত্রিধা বিভক্ত হইয়া ত্রিগুণানুসারে বিন্দু, নাদ ও বীজ নামে অভিহিত হইলেন। অর্থাৎ সাত্ত্বিক বিন্দুর নামই 'বিন্দু,' রাজসিক বিন্দুর নাম 'নাদ' এবং তামসিক বিন্দুর নাম 'বীজ' হইল। এবং এই তিনের সমষ্টি-ভূত বিন্দু 'পরমবিন্দু' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই বিন্দু, বীজ ও নাদের মধ্যে—প্রথম বিন্দু অর্থাৎ সত্ত্বগুণ, পরশিবস্বরূপাত্মক চিন্ময়; দ্বিতীয় বিন্দু বীজ বা তমোগুণ, শক্তিস্বরূপাত্মক পরা-প্রকৃতিময়; এবং তৃতীয় বিন্দু নাদ বা রজোগুণ, ইহা উভয়াত্মক অর্থাৎ সর্ব্বাগমবিশারদ পরশিব ও পরা-শক্তির বা পরমাপ্রকৃতির সমবায়স্বরূপ। অনন্তর উক্ত বিন্দু হইতে রৌদ্রীশক্তি, নাদ হইতে জ্যেষ্ঠাশক্তি এবং বীজ হইতে বামাশক্তি উৎপন্ন হইলেন। আবার এই রৌদ্রী-শক্তি হইতে রুদ্র, জ্যেষ্ঠাশক্তি হইতে ব্রহ্মা এবং বামাশক্তি হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন

হইয়াছেন। সাংখ্য-দর্শনোক্ত যে ত্রিবিধ বিন্দু বা মহত্তত্ত্বের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এবং তন্ত্রোক্ত এই ত্রিবিধ বিন্দুই যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বীজমাত্র ছিলেন। এক্ষণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আপন আপন স্বরূপে উপনীত হইলেন। এই রুদ্র জ্ঞানশক্তি স্বরূপ ; ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তি স্বরূপ এবং বিষ্ণু বা মহেশ্বর ক্রিয়াশক্তি স্বরূপ। আবার এই রুদ্র, বহ্নিস্বরূপ হইয়া সংহার করেন ; ব্রহ্মা, চন্দ্রস্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করেন ; বিষ্ণু, সূর্য্যস্বরূপ হইয়া জগতের পোষণ করিয়া থাকেন। "ক্রিয়াসারে" শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতম্।
তয়োর্যোগে ভবেন্নাদ স্তেভ্যো জাতা স্ত্রিশক্তয়ঃ ॥"

বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক এবং নাদ শিবশক্ত্যাত্মক। এই বিন্দু, বীজ ও নাদ হইতে ত্রিশক্তি উৎপন্না হইয়াছেন। এ স্থলে রুদ্র, ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর উল্লেখ নাই। কারণ তাঁহারা ঐ ত্রিশক্তি হইতে অভিন্ন। মূলপ্রকৃতির সহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যেমন কোনও ভেদ নাই এবং উভয়ে যেমন তদাত্মপ্রাপ্ত হইয়া আছেন, তেমনই জ্ঞানশক্তির সহিত রুদ্র, ইচ্ছাশক্তির সহিত ব্রহ্মা এবং ক্রিয়াশক্তির সহিত বিষ্ণু তদাত্মপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বে অনেক স্থলেই বিশেষ "সাধন প্রদীপে" আদ্যাশক্তি-তত্ত্বের মধ্যে এই ত্রিধাশক্তি-বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে, পাঠক তাহা পুনরায় দেখিয়া লইবেন।

যাহা হউক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের দিব্যশরীর বা স্বরূপোৎপত্তি বিষয়ে বলা হইল, এক্ষণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বিরাটমূর্ত্তির উৎপত্তি-বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা

হইয়াছে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণত্রয়ভেদে ত্রিবিধ বিন্দু উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ সাত্ত্বিক-বিন্দুকে বিন্দু, রাজসিক-বিন্দুকে নাদ এবং তামসিক-বিন্দুকে বীজ বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তামসিক বিন্দু বা বীজ হইতে প্রথমতঃ শব্দ-তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশ ; আকাশ হইতে স্পর্শ-তন্মাত্র ; স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে বায়ু; বায়ু হইতে রূপ তন্মাত্র ; রূপতন্মাত্র হইতে তেজ ; তেজ হইতে রসতন্মাত্র, রসতন্মাত্র হইতে জল ; জল হইতে গন্ধ-তন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আকাশের গুণ শব্দ ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ ; তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; জলের গুণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এ স্থলে যে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর কথা বলা হইতেছে, ইহারা প্রত্যেকেই সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, অর্থাৎ ইহারা পরস্পরবিশ্লিষ্ট, স্বতন্ত্র, অপঞ্চীকৃত বা অমিশ্র ও অদৃশ্য সূক্ষ্মতমবস্থ।

পঞ্চীকরণ বিধিসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন :—এক এক তত্ত্ব বা পঞ্চভূতকে প্রথমে দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার এক অর্দ্ধভাগকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়া অন্য অন্য অর্দ্ধকে পুনরায় চারি চারি ভাগে বিভাগ পূর্ব্বক সেই চতুর্ধা বিভক্ত এক এক অংশ পূর্ব্বকৃত এক এক অংশ ভূতার্দ্ধের সহিত সংযুক্ত করিলে পঞ্চীকরণ সম্পাদিত হয়। ইহাতে যে কোন এক ভূতের অর্দ্ধ অংশ অর্থাৎ ষোল আনার মধ্যে আট আনা অংশ এবং অন্য ভূতচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের অর্দ্ধের চতুর্থাংশ করিয়া বা অন্য চারিটীর প্রত্যেকের দুই আনা অংশ করিয়া, মোট

আট আনারূপ অংশ সংযুক্ত করিলে পঞ্চীকৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে, পঞ্চীকৃত আকাশ বলিলে বুঝিতে হইবে, উহাতে সূক্ষ্ম, অমিশ্র বা অপঞ্চীকৃত আকাশের অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ ষোল আনার হিসাবে আট আনা অংশ এবং ঐরূপ অমিশ্র বা অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত যথা বায়ু, তেজ, জল, পৃথ্বী এই চারিটীর প্রত্যেকের ষোল আনার হিসাবে দুই আনা অংশ করিয়া মোট আট আনা পরিমাণ অংশ একত্র মিলিত হইয়া আছে। এইভাবে বায়ু, তেজ, জল, পৃথ্বী, ইহাদের যে কোনও তত্ত্বের পঞ্চীকৃত অবস্থা বা পঞ্চীকৃত ভূত সৃষ্ট হইয়াছে বলা যায়। যাহা হউক উক্ত সূক্ষ্মভূত-পঞ্চকের ত্রিবৃৎ * করণ ও পঞ্চীকরণ হইলে বা উহাদের সূক্ষ্মাংশ যথারীতি পরস্পরে মিলিত হইলে স্থূলভূতরূপে পরিণত হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, বীজ শব্দে অভিহিত তামসিক বিন্দু হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ এই পাঁচ প্রকার তন্মাত্র, তাহা হইতে সূক্ষ্মরূপ আকাশ, বায়ু. তেজ, জল ও পৃথিবী এই অপঞ্চীকৃত বা অমিশ্র পঞ্চতত্ত্ব এবং পরে পঞ্চীকৃত বা মিশ্র আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথ্বী, এই সূক্ষ্ম ও স্থূল পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এতৎসমুদায় মহেশ্বরের বিরাট-মূর্ত্তি বা শরীর বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে॥

এইরূপ নাদ শব্দে অভিহিত রাজসিক বিন্দু হইতে অপঞ্চীকৃত ও পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ

---

* ভূতাত্মক সত্ত্ব রজঃ ও তমোরূপ গুণত্রয়ের পঞ্চীকরণ বিধি অনুসারে একীকরণ। অর্থাৎ যে কোন ভূতাত্মক ত্রিগুণের মধ্যে একটি গুণের অর্দ্ধাংশ ও অন্য দুইটী গুণের সিকি সিকি অংশের মিলনভূত সমন্বয়কে ত্রিবৃৎকরণ বলে।

শক্তি এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমুদায় ব্রহ্মার বিরাট-মূর্ত্তি বা দেহ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপেই বিন্দু নামে অভিহিত সাত্বিক বিন্দু হইতে অপঞ্চীকৃত ও পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ জ্ঞান এবং কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, রসনা, ও ঘ্রাণ এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চারি অংশ অথবা কোনও কোনও শাস্ত্রানুসারে ইহার উপর চিত্ত * লইয়া পাঁচ অংশে বিভক্ত অন্তঃকরণ সৃষ্ট হইয়াছে। এই সমুদায় বিষ্ণুর বিরাট-মূর্ত্তি বা দেহ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে তত্ত্ববোধ-মীমাংসায় উক্ত হইয়াছে যে, "ব্রহ্মাশ্রিতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়া হইতে প্রথম সূক্ষ্ম আকাশ-তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে, ক্রমে সেই আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথ্বীতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। এ সমস্তই সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্ব।"

অনন্তর আকাশের সাত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্রেন্দ্রিয়, বায়ুর সাত্বিকাংশ হইতে ত্বগেন্দ্রিয়, অগ্নির সাত্বিকাংশ হইতে চক্ষুরেন্দ্রিয়, জলের সাত্বিকাংশ হইতে রসনেন্দ্রিয় এবং পৃথ্বীর সাত্বিকাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে।

আবার সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্বের সমষ্টিভূত সাত্বিকাংশ হইতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কাররূপ অন্তঃকরণ-চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে। অন্তঃকরণের এই চতুর্ব্বিধ ভাববৃত্তি-সম্বন্ধে নিম্নে স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করা যাইতেছে!

---

* চিত্ত অর্থাৎ চিৎ বা চৈতন্যের ভাব।

মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার অন্তঃকরণের চারিটী বিভিন্ন অবস্থার পরিচায়ক। ঠিক মানবের বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য এই অবস্থাচতুষ্টয়ের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। একই মানব যেমন স্বভাব ও কর্ম্মানুসারে বাল্যাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থায় পরিচিত হয়, অন্তঃকরণও তেমনই ভাব-বৃত্তির বা কর্ম্মের বিভেদ অনুসারে মন আদি চারিটী অবস্থায় কথিত হইয়া থাকে।

মনঃ—অন্তঃকরণ যখন কেবল সঙ্কল্প ও বিকল্পরূপ বৃত্তিময় অর্থাৎ ঠিক যেন বালকের ন্যায়ই চঞ্চলস্বভাববিশিষ্ট, যখন অন্তঃকরণ বৃত্তি কোনও এক নির্দ্দিষ্টভাবে আদৌ স্থির থাকিতে পারে না, সদাই এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করে, অন্তঃকরণের তদানীন্তন চঞ্চল অবস্থাকেই "মন" বলে। মানব সাধারণতঃ এই মনোরূপ বৃত্তি দ্বারাই পরিচালিত হয়।

বুদ্ধি :—অন্তঃকরণ যখন বালক-স্বভাবানুরূপ সঙ্কল্প-বিকল্পময় চঞ্চল বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যুবার ন্যায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ বা নিশ্চয়াত্মিকা-বৃত্তিযুক্ত হয়, অর্থাৎ কোনও এক নির্দ্দিষ্ট বিষয় লইয়াই আলোচনাপর হয়, তখনই অন্তঃকরণ "বুদ্ধি" নামে অভিহিত হয়।

চিত্ত :—অন্তঃকরণ যখন মনরূপে বালকের ন্যায় চঞ্চল অথবা বুদ্ধিরূপে যুবার ন্যায় নির্দ্দিষ্ট বিষয়ানুগত-বৃত্তিময় নহে, পরন্তু ঠিক যেন প্রৌঢ়ের ন্যায় তাহার বাল্য ও যৌবনের কৃতকর্ম্ম অর্থাৎ মন ও বুদ্ধি দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের স্মরণ-আলোচনায় প্রীতি অনুভব করাইয়া দেয়, তখন এই স্মরণের কর্ত্তারূপ অন্তঃকরণের বৃত্তিকে "চিত্ত" কহে।

অহঙ্কার—অহঙ্কর্ত্তা অর্থাৎ অহঙ্কারের বৃত্তি আমি বা আমার'

ইত্যাদিরূপ অন্তঃকরণের যে অভিমান তাহাকেই "অহঙ্কার" কহে। এই সময় মন, বুদ্ধি বা চিত্তের ত্রিবিধ-বৃত্তিই নিরোধ-প্রাপ্ত হয়। কেবল আত্মজ্ঞানে অন্তঃকরণ বৃদ্ধত্ব লাভ করে। সাধকের এই স্থানেই "আমার" সাক্ষাৎকার হয়। অর্থাৎ আমি যে কি বস্তু, সেই বিষয়ই অনুভব হইয়া থাকে। এই 'আমি' পূর্ব্বেও অনুভব ছিল, তবে তাহা তমঃ ও রজোগুণাত্মক, অর্থাৎ প্রথম তমোগুণযুক্ত অহঙ্কার, রূপ ও গুণাত্মক, দ্বিতীয় রজোগুণযুক্ত অহঙ্কার শক্তি ও জ্ঞানাত্মক, কিন্তু এখন তৃতীয় সাত্ত্বিক অহঙ্কারে আমি মুক্তাত্মক, অর্থাৎ আমিই মুক্ত, আমিই তিনি বা আমিই ব্রহ্ম। এই অবস্থায় যথার্থ "আমিকে" জানিতে পারা যায়। এই বিষয়গুলির সমষ্টিও পূর্ব্ববর্ণিত বিষ্ণুর বিরাট-মূর্ত্তির অন্তর্গত।

অতঃপর উক্ত সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্বান্তর্গত আকাশের রাজসাংশ হইতে বাগিন্দ্রিয়, বায়ুর রাজসাংশ হইতে পাণি-ইন্দ্রিয়, বহ্নির রাজসাংশ হইতে পাদ-ইন্দ্রিয়, জলের রাজসাংশ হইতে উপস্থ-ইন্দ্রিয়, এবং পৃথ্বীর রাজসাংশ হইতে পায়ু-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে।

আবার সূক্ষ্ম-পঞ্চভূতের সমষ্টিভূত রাজসাংশ হইতে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ-বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে। নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই পঞ্চ উপবায়ু উক্ত পঞ্চ প্রাণাদি বায়ুরই অন্তর্গত। অতএব এগুলি পঞ্চপ্রাণ হইতে পৃথক্ নহে। *

---

* ঊর্দ্ধ প্রবহমান হৃদয়স্থিত বায়ুর নাম প্রাণ, নিম্ন প্রবহমান গুহ্যাদিস্থিত

যাহাহউক এইগুলির সমষ্টিও পূর্ব্ববর্ণিত ব্রহ্মার বিরাট-মূর্ত্তির অন্তর্ভুক্ত।

প্রোক্ত সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্বের সমষ্টিভূত তামসাংশ হইতে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে ইহাকেই পঞ্চমহাভূত বলিয়া থাকেন। ইহা মহেশ্বরেরই বিরাট-মূর্ত্তির অন্তর্গত।

এই পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যেকের মধ্যে আবার চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। এতদন্তর্গত ভূমগুলের মধ্যে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ এই চতুর্ব্বিধ জীব-শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাকেই শাস্ত্রে ভূতবর্গ-চতুষ্টয় বলে।

এই ভূতবর্গান্তর্গত জীবদেহ বা শরীর আবার ত্রিবিধ। যথা, স্থূল, সূক্ষ্ম ও স্থূল-শরীর, সূক্ষ্ম-শরীর ও কারণ-শরীর। স্থূল-কারণ শরীর। শরীর :—যাহা পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে নির্ম্মিত, কর্ম্ম-জন্য সুখ-দুঃখাদির ভোগের ক্ষেত্র, অর্থাৎ যদ্বারা সুখ ও দুঃখাদির ভোগ অনুভব হইয়া থাকে এবং যাহা বর্ত্তমান আছে, উৎপন্ন হয়, বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় পরিণামতা লাভ করে, ক্রমে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় ও বিনাশ-প্রাপ্ত হয়, এই ষড়্‌-ভাব-বিকার-বিশিষ্ট, তাহাই স্থূল শরীর।

বায়ুকে অপান বলে। প্রাণ ও অপানের মিলনক্ষেত্র নাভিস্থিত বায়ুর নাম সমান, কণ্ঠদেশস্থিত বায়ু উদান এবং সর্ব্বশরীরস্থ বায়ুকে ব্যান বলে। নাগ বায়ু উদ্গার, কূর্ম্ম বায়ু উন্মীলন-সঙ্কোচন, কৃকর ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দেবদত্ত জৃম্ভন, নিদ্রা-তন্দ্রা, ও ধনঞ্জয় বায়ু হিক্কা-পোষণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

সূক্ষ্ম-শরীর যাহা অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে নির্ম্মিত, যদ্বারা কর্ম্ম-জনিত সুখ-দুঃখাদি ভোগের সাধন হয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, মন এবং বুদ্ধি, এই সপ্তদশ কলার সহিত যাহা বিদ্যমান আছে, তাহাই সূক্ষ্ম-শরীর।

"পঞ্চদশীতে" উক্ত হইয়াছেঃ—

"বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈ র্মনসা ধিয়া।

শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টির নাম সূক্ষ্ম-শরীর. এবং ইহাকেই লিঙ্গ-শরীর বলে। বেদান্তশাস্ত্রে ইহাকেই হৃদ্দেশে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলা হইয়াছে।

"রাম গীতায়" আছে :—

"সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈর্যুতং।

প্রাণৈরপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং।

ভোক্তুঃ সুখাদেরপি সাধনং ভবেৎ।

শরীর মন্যদ্বিদুরাত্মনো বুধাঃ॥"

মন, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত অপঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে জাত, স্থূল শরীর হইতে ভিন্ন এবং সুখ-দুঃখ ভোগ করিবার সাধনস্বরূপ যে দেহ, তাহাকেই সূক্ষ্মশরীর বলে।

কারণ-শরীরঃ— অনির্ব্বচনীয় অনাদি অবিদ্যারূপ, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কারণমাত্র, নিজস্বরূপের অর্থাৎ আত্মচৈতন্যের অজ্ঞান-স্বরূপ এবং নির্ব্বিকল্পকরূপ যাহা আছে, তাহাই কারণ-শরীর। অর্থাৎ অনাদি জীব-প্রবাহের পৃথক পৃথক সৃষ্টির

প্রারম্ভে জড় ও চেতনের গ্রন্থি-বন্ধনের সময় যে প্রথম দশা উৎপন্ন হয়, উহাই জীবের কারণশরীর। সূক্ষ্মশরীরের সংস্কার পৃথক পৃথক হইবার কারণ প্রত্যেক জীবকে স্ব স্ব যথাক্রম সংস্কার অনুসারে বিচিত্রতাময় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থূলশরীর ধারণ করিতে হয়। পরন্তু অনাদি অবিদ্যামূলক এবং অপর দুই শরীরের মূল কারণ এবং চিদাত্মায় বিকারহীন যে দশা তাহাকেই কারণশরীর বলে।

"পঞ্চদশী" বলিয়াছেন :—

"অবিদ্যাবশগাস্ত্বন্য স্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ "॥

স্থির সলিলাদিতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রমার ন্যায় অবিদ্যায় বা অজ্ঞান-রূপ সলিলে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য-প্রভা, যিনি অবিদ্যারই বশতা-পন্ন হইয়া অর্থাৎ অজ্ঞানবশীভূত হইয়া জীব-শব্দে কথিত হন, তিনিই প্রতিবিম্ব ক্ষেত্ররূপ দর্পণসদৃশ অবিদ্যার নৈর্ম্মল্য ও মালিন্যের অর্থাৎ স্বচ্ছতার ও ক্রমে অস্বচ্ছতার তারতম্য হেতু, দেব, মনুষ্য ও গো আদি বিবিধ বৈচিত্র্যময়রূপে প্রতিভাত হন। এই দেব ও মানবাদিরূপের কারণ-স্বরূপ, চৈতন্য-প্রভার প্রতিবিম্বক্ষেত্ররূপ উক্ত অবিদ্যার নামই কারণশরীর। এই কারণশরীরাভিমানী জীবকে প্রাজ্ঞ বলে। এখানেই পূর্ব্বকথিত অহঙ্কাররূপ অন্তঃকরণের বা জীবের "আমির" উদ্ভব হয়।

রামগীতায় আছে :—

" অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমপীহ কারণং
মায়াপ্রধানন্তু পরং শরীরকং।

উপাধিভেদাত্তু যতঃ পৃথক্ স্থিতং
স্বাত্মানমাত্মন্যবধারয়েৎ ক্রমাৎ॥"

এই কারণশরীর আদিরহিত, অনির্ব্বচনীয়, মায়াপ্রধান স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে ভিন্ন, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কারণ হওয়াতে ইহাকেই জ্ঞানিগণ কারণশরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণশরীর অবার পঞ্চকোষময়। যথা—

পঞ্চকোষ। ১ম। অন্নময়কোষ, ২য়। প্রাণময়কোষ, ৩য়। মনোময়কোষ, ৪র্থ। বিজ্ঞানময়কোষ ও ৫ম। আনন্দময়কোষ। এতদ্‌সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

১ম। অন্নময়কোষ :—যাহা অন্নরসেই আবির্ভূত হইয়া অন্নরসেই বৃদ্ধি লাভ করিয়া অন্নরসময় পৃথিবীতে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম অন্নময়কোষ। কোষ অর্থে সংরক্ষক বা আবরণ। ইহাকেই জীবের পূর্ব্ববর্ণিত স্থূল-শরীর বলে।

এই স্থূলশরীরের গঠনক্রমবিষয়ে "জ্ঞানসঙ্কলিনীতে" শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

শুক্রশোণিতমজ্জা চ মেদোমাংসঞ্চ পঞ্চমং।
অস্থি ত্বক্ চৈব সপ্তেতে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ॥

শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক্ এই সপ্ত ধাতু-দ্বারা স্থূলশরীর বা অন্নময়কোষ বিনির্ম্মিত হইয়াছে। কেহ কেহ ত্বক্‌কে স্বতন্ত্র ধাতুমধ্যে গণ্য না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে রক্তের পূর্ব্বাবস্থা রসকেই এক ধাতু ধরিয়া সপ্ত ধাতু পূর্ণ করিয়াছেন। যথা—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতু। যাহাহউক পূর্ব্বকথিত পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও

ব্যোম হইতেই শরীরসৃষ্টি-সমর্থক উক্ত সপ্ত-ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহাদেরই সংযোগে ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি অন্যান্য শারীর-ধর্ম্মও উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রীভগবান "জ্ঞান-সংকলিনী"তে বলিয়াছেন :—

অস্থিমাংসনখঞ্চৈব ত্বগ্‌রোমাণি চ পঞ্চমং।
পৃথ্বী পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥
শুক্র-শোণিত-মজ্জা চ মল-মূত্রঞ্চ পঞ্চমং।
অপাং পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেনভাসতে॥
নিদ্রা-ক্ষুধা-তৃষা চৈব ক্লান্তিরালস্য পঞ্চমং।
তেজঃ পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥
ধারণং চালনং ক্ষেপং সঙ্কোচং প্রসরস্তথা।
বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥
কামং ক্রোধং তথা মোহং লজ্জা লোভঞ্চ পঞ্চমং।
নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥

পৃথ্বী বা মৃত্তিকা পঞ্চগুণ বিশিষ্ট, ইহার পাঁচগুণ হইতে যথা-ক্রমে অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্‌ ও লোম এই পাঁচটী উৎপন্ন হইয়াছে। অপ্‌ বা জলও মৃত্তিকার ন্যায় পঞ্চগুণ বিশিষ্ট, ইহা হইতে শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র এই পাঁচ উৎপন্ন হইয়াছে; এই ভাবে তেজঃ বা অগ্নি হইতে নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ক্লান্তি ও আলস্য এই পাঁচটী উৎপন্ন হইয়াছে; মরুৎ বা বায়ু হইতে এই ভাবে ধারণ, চালন, ক্ষেপন, সঙ্কোচ ও প্রসারণ এই পাঁচটী এবং নভঃ, ব্যোম্‌ বা আকাশ হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও লজ্জা উৎপন্ন হইয়াছে। স্থূলশরীর এবং ইহার উক্ত ধর্ম্মসমূহ ভূতপঞ্চক হইতে জাত। এই কারণ ইহাকে ভৌতিক

দেহ বলে। এই দেহ নির্জ্জীব, জড়-স্বভাব-বিশিষ্ট হইলেও চৈতন্যের আশ্রয়ে সচেতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আত্মজ্ঞান হইলে অন্নময়কোষরূপ এই স্থূলদেহের জড়ত্ব প্রতীত হইয়া থাকে।

২য়। প্রাণময়কোষ :—প্রাণাদি পঞ্চবায়ু ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া, স্থূল অন্নময়কোষের সহিত সূক্ষ্ম-কোষগুলির সংযোজকরূপে প্রাণময়কোষের সৃষ্টি হয়।

৩য় মনোময়কোষ :—মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্মিলনে মনোময়-কোষের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

৪র্থ। বিজ্ঞানময়কোষ :—বুদ্ধি এবং পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মিলনে বিজ্ঞানময়কোষের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়—এই তিন কোষকেই পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম শরীর বলে। তবে প্রাণময়কোষ বা এই আবরণের মধ্যে সূক্ষ্মতর মনোময়কোষ এবং মনোময়কোষ বা এই আবরণের মধ্যে সূক্ষ্মতম বিজ্ঞানময়কোষ অবস্থিত রহিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রযোগরহস্যে প্রাণক্রিয়া-আলোচনার প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, এই প্রাণময়কোষই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের বা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের সংযোগ সাধন করিয়া সংসারে সৃষ্টি-পুষ্টির ক্রম অক্ষুন্ন রাখে। প্রাণময়কোষের সেই প্রাণক্রিয়ার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-গতির ফলে যে আবর্ত্ত-চক্র উৎপন্ন হয়, তাহারই কেন্দ্রে যে বিচিত্র পীঠ সৃষ্টি হয় * তাহাতেই স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ বা শরীর একীভূত হইয়া আনন্দস্বরূপ বিশ্বসৃষ্টির স্থূল কারণভাবের আবির্ভাব হয়। উদাহরণরূপে বলা যাইতে পারে যে, সৎ বা প্রকৃতি-

* মন্ত্রযোগ রহস্যে প্রাণক্রিয়া জাত পীঠ-সৃষ্টি দেখ।

প্রধানা মাতা ও চিৎ বা পুরুষ-প্রধান পিতার উভয় প্রাণক্রিয়ার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গতির একতায় বা সমাহারে আনন্দস্বরূপ যে আবর্ত্তকেন্দ্ররূপ পীঠ সৃষ্টি হয়, অনন্তর সেই পীঠের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠতা বিচারে অলৌকিক দৈবীবিধানে পিতৃলোকের সহায়তায় অন্তরীক্ষস্থিত বা সূক্ষ্মজগতের নিম্নস্তর স্থিত অভুক্ত আত্মাসমূহ সমাকৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে অবস্থিত হইয়া থাকে এবং তথা হইতেই তাহাদের অভুক্ত পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে জাতি, আয়ু ও ভোগের অনুকূল সংস্কার ও শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই জীবসৃষ্টির সূক্ষ্মরহস্য। জীব পিতৃঋণরূপ সেই ভোগদেহ বা অন্নময়-কোষসহ তাহার সূক্ষ্ম-দেহ বা প্রাণ ও মনাদি কোষের সংযোগে একরস হইয়া থাকে। যেমন কতকগুলি স্থূল গমের কি যবের আটা বা ময়দার সহিত উহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বস্তু এক ঘটি জল মিশাইয়া তাল পাকান যায় এবং পরে সেই তাল হইতেই নেচি কাটিয়া গুলি পাকান যায় ও ক্রমে তাহাকে রুটী, লুচি, গজা, খাজা যে কোন আকারে গঠন করিতে পারা যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম বা তরল জল-রূপ বস্তু না মিশাইলে সেই স্থূল আটা কি ময়দাকে একত্র বা একরস কিংবা একতাল করিতে পারা যাইত না; স্থূল অন্নময় পরমাণুও এই ভাবে প্রাণময়-মূলক সূক্ষ্ম পরমাণুর সহযোগে, একরস হইয়া যায়; তখন কর্ম্মফলানুসারে নানারূপের জীব-আকার প্রাপ্ত হয়। স্থূল আটা বা ময়দার প্রতি পরমাণুর অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম জলের পরমাণু যেমন তখন আর পরিলক্ষিত হয় না, বাহ্যদৃষ্টিতে কেবল আটা বা ময়দারই তাল বলিয়া বোধ হয়, তেমনি জীব তখন অন্তরস্থিত সূক্ষ্ম আত্মাকে ভুলিয়া তাহার সেই স্থূল দেহকেই

সর্ব্বস্ব বা আত্মা বলিয়া মনে করে। ইতিপূর্ব্বে "বৈরাগ্য-সিদ্ধির উপায়" ও "সন্ন্যাসীর প্রতি উপদেশ" অংশেও এই কথা বলা হইয়াছে যে, যেমন বিরাট জগৎ মিথ্যাস্বরূপ হইয়াও একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, সেইরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া ভূতপঞ্চকজাত এই মিথ্যাভূত ক্ষুদ্রজগৎ স্থূল জীবদেহও আত্মবৎ প্রতীত হইতেছে। "জ্ঞানসঙ্কলিনীতে" শ্রীশ্রীঈশ্বর বলিয়াছেন :—

"পঞ্চতত্ত্বাৎ ভবেৎ সৃষ্টি স্তত্ত্বাৎ তত্ত্বং বিলীয়তে।
পঞ্চতত্ত্বাৎ পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনং ॥"

পঞ্চতত্ত্ব হইতে সৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং সেই তত্ত্ব-পঞ্চকেই সৃষ্টি বিলীন হইয়া থাকে, তাহা হইলেই তত্ত্বাতীত নিরঞ্জনরূপ পরমতত্ত্বের জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

৫ম। আনন্দময়কোষ:—উক্ত সূক্ষ্মতম বিজ্ঞানময় কোষরূপ আবরণেরও অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতমাতীত সূক্ষ্ম আনন্দময়-কোষ অবস্থিত। কারণশরীরভূত অবিদ্যায় অবস্থিত চৈতন্যের প্রতিবিম্বরূপ মলিন সত্তা বা আত্মস্বরূপের অজ্ঞানরূপ এবং প্রিয়, মোদ, প্রমোদ এই ভাবত্রয়যুক্ত হইয়া আনন্দময়কোষের সৃষ্টি হয়। ইহাই কারণশরীর। কারণ ইহাই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের কারণস্বরূপ।

জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়।

এই পঞ্চকোষময় স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণশরীর আবার ১ম। জাগ্রৎ, ২য়। স্বপ্ন, ৩য়। সুষুপ্তি, এই অবস্থা-ত্রয়যুক্ত। শাস্ত্র বলিয়াছেন:—

১ম। যে অবস্থায় স্থূলশরীরের শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বারা শব্দাদি পঞ্চবিষয়ের জ্ঞান হয়, তাহাই জাগ্রতাবস্থা। এই স্থূল-শরীর-অভিমানী-আত্মাকে "বিশ্ব" বলা যায়।

২য়। জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, যাহা স্পর্শ করা যায়, যে রস ও গন্ধ অনুভব করা যায়, পরে বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্কজাত ক্রিয়ার অভাবে কেবলমাত্র তদুৎপন্ন-বাসনাদ্বারাই যে অবস্থায় সেই প্রপঞ্চ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাই জীবের স্বপ্নাবস্থা। সূক্ষ্মশরীরাভিমানী এই আত্মাকে "তৈজস" বলা হয়।

৩য়। আমি কিছুই জানি নাই, সুখে নিদ্রিত ছিলাম—এই প্রকার যে অনুভব জাগ্রতাবস্থার স্মরণে আসে, তাহাই জীবের সুষুপ্তি অবস্থা। কারণশরীরাভিমানী এই আত্মাকে "প্রাজ্ঞ" বলা হয়।

সমষ্টিভূত স্থূলশরীরকে বিরাট বলে; এইজন্য স্থূলশরীরের দেবতাকে "বিশ্ব" বলা হইয়াছে। সূক্ষ্মবাজ্যের সূক্ষ্ম-শরীর-বিশিষ্ট দেবতাদিগের শরীর তেজোময়, সেই কারণ সূক্ষ্মশরীরাভিমানী দেবতাকে "তৈজস" বলা হইয়াছে। কারণশরীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সেইজন্য তাহার তদভিমানী দেবতাকে "প্রাজ্ঞ" বলা হয়।

জীব ও ঈশ্বর।

যাহাহউক পঞ্চকোষময় স্থূলাদি ত্রিবিধ শরীর, জাগ্রতাদি ত্রিবিধ অবস্থা ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব-বিশিষ্ট জীবপিণ্ড শরীরাভিমানী হইয়া স্বভাবতঃই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী ঈশ্বরকে নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিয়া থাকে। আত্মাতেই অবিদ্যা এবং বিদ্যা বা মায়া দ্বারা জীব ও ঈশ্বররূপে ভেদ-সৃষ্টি কল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই যে শরীরাভিমানী জীব বলিয়া কথিত হয়, তাহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে। এই প্রকার উপাধি ভেদে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ-সৃষ্টি

যে পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত জীবের জন্মমরণাদিরূপ সংসারে গমনাগমন কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। সেই কারণ জীবাত্মা পুনঃ পুনঃ প্রাণক্রিয়ার আবর্ত্তে সমাকৃষ্ট হইয়া তাহাদের অভুক্ত ভোগ-বাসনা পরিপূর্ণ করিবার অভিলাষে মাতৃগর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীব ও ঈশ্বরের অভেদ-জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। বেদান্তাদি দর্শন ও জ্ঞান-তন্ত্রাদি শাস্ত্র-সমূহের ইহাই একমাত্র অভিমত। সেই জ্ঞান—আত্মজ্ঞান, প্রকৃতি-জ্ঞান, পুরুষজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান ভেদে চতুর্ব্বিধ। আত্মজ্ঞানের দ্বারা আত্মতত্ত্ব, প্রকৃতিজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিতত্ত্ব, পুরুষজ্ঞানের দ্বারা পুরুষতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিতে হয়, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই সাধারণ জ্ঞানতত্ত্বের বিচারে শিবোক্ত আত্মতত্ত্বই প্রথমে আলোচনা করা যাইতেছে।

কুল-সাধনা উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথমেই আচমনে "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা" মন্ত্র উচ্চারণের আদেশ আছে। সেই আত্মতত্ত্ব কি?

স্বয়ং শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

আত্মতত্ত্ব-রহস্য।

"শুক্র শোণিতয়োর্যোগে পঞ্চভূতাত্মিকা তনুঃ।
পাতাল-স্বর্গ-পর্য্যন্তং আত্মতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥"

শুক্র ও শোণিত সহযোগে যে পঞ্চভূতাত্মক স্থূল তনু পাতাল হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পাতাল বা পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বা আপাদমস্তকে যে তত্ত্ব সতত অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহাকেই "আত্মতত্ত্ব" বলে। এই আত্মতত্ত্বের আধার স্থূল-তনু।

"রসাদিপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং ভোগালয়ং দুঃখসুখাদি কর্ম্মনাং।
শরীরমাদ্যন্তবদাদিকর্ম্মজং মায়াময়ং স্থূলমুপাধিবাত্মনঃ॥"

যাহা পঞ্চীকৃত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূ-তাত্মক রসাদি ধাতুস্বরূপক হইতে সম্ভূত, যাহা সুখ-দুঃখাদির কারণ স্বরূপ, যাহা সকল কর্ম্ম ভোগের ক্ষেত্র, যাহা উৎপত্তি ও বিনাশ-যুক্ত, যাহা জন্মার্জ্জিত প্রারব্ধ-কর্ম্ম-বশে জাত, যাহা বিকার-স্বরূপ ও সতত পরিবর্ত্তনশীল সেই অন্নময়-কোষরূপ মায়াময় স্থূলশরীর-কেই স্থূল-উপাধিরূপে আত্মতত্ত্ব বলা হয়। বলা আবশ্যক, এ স্থলে আত্মশব্দ পরমাত্মা বা পরব্রহ্মরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। স্থূলভাবে স্থূলতনু-বিচারেই ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থূলদেহ-বিচার-সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বিস্তৃতভাবেই ইহা বলা হইয়াছে।

"পঞ্চীকৃত-মহাভূত-কার্য্যংজন্মাদিষড়্ভাব-বিকারংস্থূলশরীরং।" অর্থাৎ পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের কার্য্য ও পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম হেতু জন্ম প্রভৃতি ও ষড়্বিধ বিকার-(বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য, জরা ও মৃত্যুরূপ ছয় প্রকার দেহ-বিকার) যুক্ত যে শরীর তাহারই নাম স্থূলদেহ। ইহাকেই পিণ্ড বা ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডও বলে। এই দেহ-পিণ্ডের পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশভুবন অর্থাৎ সপ্তপাতাল ও সপ্তস্বর্গ বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মাণ্ড-পিণ্ডে যাহাযাহা আছে, দেহ-পিণ্ডের মধ্যেও তাহারই অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে সমস্তই রহিয়াছে এবং ইহা যে পঞ্চভূতাত্মক, জন্ম-মৃত্যু ও কৌমার-যৌব-নাদি বিকার-যুক্ত; জাগ্রতাদি অবস্থাসম্পন্ন এবং প্রারব্ধ-কর্ম্ম-জনিত সুখ-দুঃখাদি ভোগের যে আলয়স্বরূপ, এই সমস্ত তত্ত্ব প্রকৃতরূপে অবগত হওয়ার নামই আত্মতত্ত্বজ্ঞান অথবা এই তত্ত্ব সমুদায়ের স্বরূপ অনুভব করিবার জন্য যে ষট্‌চক্রভেদ-সাধনাদির প্রক্রিয়াজ্ঞান, তাহাও আত্মজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। সাধন-ব্যতীত মায়া বিমোহিত জীবের আত্মজ্ঞান সহজে উদয় হয় না।

এইহেতু যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনার সহিত ষট্‌চক্রভেদ ও শম-দমাদি পূর্ব্বকথিত বিভিন্ন যোগাঙ্গরূপ ক্রিয়াবিশেষের সাধন করিলে এই আত্মজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে স্থূল-শরীরের বিশ্লেষণ-বিচারে দেখান হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞানের সকল বীজই দেহের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যাহা বিরাটরূপ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত, তাহাই পিণ্ড বা দেহের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে সুশোভিত। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেবের উপদেশক্রমে তাহার রীতিমত অভ্যাস বা সাধনা ব্যতীত উপলব্ধির উপায় নাই। বাস্তবিক এই ক্ষুদ্রের মধ্যে ব্রহ্মবিন্দু বা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিম্ব পরিদর্শন ব্যতীত বিরাটের পরিচয় পাওয়া প্রকৃতই অসম্ভব।

শ্রীভগবান শান্তি গীতায় বলিয়াছেন :—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো হৃৎপদ্মে যো ব্যবস্থিতঃ।
তমাত্মানঞ্চ বেত্তারং বিদ্ধি বুদ্ধ্যা সুসূক্ষ্ময়া ॥"

হৃৎপদ্মে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সদা অবস্থিত রহিয়াছেন, তিনিই জ্ঞাতৃস্বরূপ আত্মা। সুসূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা পিণ্ডস্থিত সেই আত্মাকে অবগত হও।

এইজন্যই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে :—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ঈশানো ভূতভব্যস্যেতি।"

ইহাই উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবান আরও পরিচ্ছিন্নভাবে বলিয়াছেন :—

"হৃদয়কমলং পার্থ হ্যঙ্গুষ্ঠ পরিমাণতঃ।
তত্র তিষ্ঠতি যো ভাতি বংশ পর্ব্বস্বিবাম্বরম্‌ ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং তেনৈব বদতি শ্রুতি"।

হে পার্থ! হৃদয়কমল অঙ্গুষ্ঠমাত্র অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ।

সেই হৃদয়-কমলে বংশপর্ব্বের মধ্যবর্ত্তী আকাশের ন্যায় স্থিত হইয়া যিনি প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই আত্মা।

অনন্ত আকাশের মধ্যে কুম্ভকারের চক্রে একটী ঘট উৎপন্ন হইল, সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘটের মধ্যেও কিঞ্চিৎ আকাশ আবৃত বা পূর্ণ রহিল। ঘটস্থিত সেই আকাশকে যেমন ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ কূটস্থ বা এই পিণ্ডস্থ আত্মাতে বুদ্ধি কল্পিত হইয়া প্রকাশ পাওয়াতে তখন সেই আত্মা বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য বলিয়া কথিত হন। তাহাই আত্মা-রূপে লক্ষ্য, পারমার্থিক জীবশব্দের বাচ্য, তোমার স্বরূপ। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যর অন্তর্গত ত্বং শব্দ দ্বারা তৎ বা তাহাতেই ব্রহ্মের সহিত অভেদভাব জানিয়া সাধক জীবন্মুক্ত হইতে পারেন। সেই ত্বংই বা তুমিই আত্মা, সেই কারণ কুল-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে যথারিতি আত্মতত্ত্ব সাধন করিবার বিবিধ বিধি উপদিষ্ট হইয়া থাকে। এই আত্মতত্ত্বের সিদ্ধসাধককেই সন্ন্যাসী বা অবধূত বলে। সুতরাং প্রথম হইতে আচমন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সাধককে এই অপূর্ব্ব আত্মতত্ত্বের বিচার শিক্ষার পূর্ব্ব ইঙ্গিতরূপ "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা" মন্ত্রেরই অধিকার ও উপদেশ শাম্ভবী শাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

বিদ্যাতত্ত্ব রহস্য।

"মূলাধারে চ যা শক্তির্গুরুবক্ত্রেণ লভ্যতে।
সা শক্তি র্মোক্ষদা নিত্যা বিদ্যাতত্ত্বং তদুচ্যতে"॥

এই স্থূল-শরীরাভ্যন্তরে মূলাধার-কমলে যে শক্তিরূপা প্রকৃতিদেবী অধিষ্ঠিতা আছেন, তাহার তত্ত্ব শ্রীগুরুমুখেই অবগত হওয়া যায়। সেই শক্তিরূপা প্রকৃতিদেবীই মুক্তিদাত্রী অর্থাৎ তাঁহার তত্ত্ব

অবগত হইলেই জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এইহেতু এই শক্তি-তত্ত্বকেই " বিদ্যাতত্ত্ব " বলে।

"যামলে উক্ত হইয়াছে :—

"সত্ত্বংরজস্তমঃ ইতি গুণত্রয়মুদাহৃতম্।
সাম্যাবস্থিতিরেতেষা মব্যক্তং প্রকৃতিং বিদুঃ॥"
সৈব মূল প্রকৃতিঃ স্যাৎ প্রধানং পুরুষোঽপি চ॥"

অন্যত্র উক্ত আছে :—

সত্ত্বং রজঃস্তমইতি গুণানাং ত্রিতয়ং প্রিয়ে।
যদা সা পরমা শক্তি র্গুণাধিষ্ঠানমাচরেৎ॥
প্রকৃতিত্বং ভবেত্তস্য পুরুষঃস্যাৎ সদাশিবঃ॥"

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ এই গুণত্রয়ের নিষ্ক্রিয়াবস্থার নাম প্রকৃতি। ইহাই অব্যক্ত-স্বরূপ মূলপ্রকৃতি বা মহাপ্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি অথবা মহামায়া। যখন ব্রহ্মে গুণের অধিষ্ঠানত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই তাঁহার প্রকৃতিত্ব এবং যখন নির্গুণ তখনই পরমশিবস্বরূপ পরমপুরুষ বা ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম-শক্তি বা মহামায়া দ্বিবিধা। শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"সা মহামায়া দ্বিবিধা—বিদ্যা অবিদ্যা চ।
যা মহামায়া মুক্তেহেঁতুভূতা সা বিদ্যা।
যা মহামায়া সংসারবন্ধনহেতুভূতা সাঽবিদ্যা॥"

অন্যত্র :—

"সা বিদ্যাপরমামুক্তে হেঁতুভূঁতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥"

অর্থাৎ সেই মহামায়া দ্বিবিধা—বিদ্যা ও অবিদ্যা। যিনি মোক্ষের কারণীভূতা বা হেতুস্বরূপা তিনি নিত্যা সনাতনী। তিনিই

বিদ্যা এবং যিনি ভববন্ধনের কারণীভূতা ও ব্রহ্মাদির নিয়ন্ত্রী তিনিই অবিদ্যা।

শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"যা বিদ্যা সা মহামায়া সা তু সেব্যা সদা বুধৈঃ।
যোঽবিদ্যামুপাসতে সোঽয়ং তমঃ প্রবিশতি ॥"

যিনি বিদ্যা তিনিই মহামায়া, সুধিগণ নিরন্তর তাঁহারই সেবা করিবেন, যিনি অবিদ্যাসেবী তিনি তমিস্রা-নরকে গমন করেন।

"রুদ্রযামলে" শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"সুখদা মোক্ষদা নিত্যা সর্ব্বভূতেষু সংস্থিতা।
যদা তুষ্টা জগন্মাতা তদা সিদ্ধি মুপালভেৎ ॥"
"বন্দনীয়া সদা স্তুত্যা পূজনীয়া চ সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যা কীর্ত্তিতব্যাচ মায়া নিত্যা নগাত্মজা ॥"

সুখদাত্রী মোক্ষদাত্রী ও নিত্যা বিদ্যা সর্ব্বভূতেই অধিষ্ঠিতা আছেন, সেই জগজ্জননী বিদ্যা যখন প্রসন্না হন, তখনই সিদ্ধি-প্রাপ্তি হয়। এই বিদ্যারূপিনী, মহামায়াই বন্দনীয়া নিয়ত স্তুত্যা ও সর্ব্বকালেই পূজনীয়া, ইহাঁকেই সদা শ্রবণ কীর্ত্তন করিবে।

আবার বিদ্যা অর্থে জ্ঞানও বুঝায়। জ্ঞানোদয় হইলেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান আপনা-আপনি বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সেই অজ্ঞান নাশ হইলেই সাধকের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই বিদ্যা-তত্ত্ব সাধকের কিরূপে লাভ হইতে পারে, তাহা অনেকস্থলে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তথাপি পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত সংক্ষেপে এস্থলে আরও কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

পূর্ব্বকথিত ' আত্মজ্ঞান ' বলিলে যেরূপ পঞ্চ স্থূলভূতের সহিত এই স্থূলদেহের সম্বন্ধ অবগত হওয়া যায়, বিদ্যাতত্ত্ব ও তেমনি সূক্ষ্ম-

দেহের সহিত শক্তির কিরূপ সম্বন্ধ তাহাই অবগত হওয়া যায়। এই শক্তিই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরোৎপত্তির কারণ ব্রহ্মশক্তি। ইনি কুণ্ডলিনীরূপে জীবপিণ্ডে অধিষ্ঠানপূর্বক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-ভেদে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি নামে ত্রিবিধভাবে প্রকাশ পাইতেছেন। ইনিই অহংতত্ত্বরূপে ইচ্ছাশক্তি, একাদশ ইন্দ্রিয়-তত্ত্বরূপে ক্রিয়াশক্তি এবং মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বরূপে জ্ঞানশক্তি হইয়া প্রকাশিত হইয়া আছেন। ইনি বিদ্যারূপে বিশুদ্ধ-জ্ঞান-প্রকাশিকা মুক্তিদাত্রী মহামায়া ঈশ্বর-প্রসবিনী কুণ্ডলিনী শক্তি এবং অবিদ্যারূপে অজ্ঞান-প্রকাশিকা সংসারাসক্তি-কারী জগৎ-প্রসবিনী আবরণীশক্তি বা বিক্ষেপশক্তি বলিয়াও অভিহিত হয়েন।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"বাঙমনোঽগোচরায়া মে শক্তের্ভেদাঃ ক্রমেণ চ।
চত্বার ঈরিতাঃ স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-ভেদতঃ॥
চতুর্থস্ত তুরীয়ঃ স্যাজ্ জ্ঞানরূপী ন সংশয়ঃ।
নিশ্চলো হি মমাঙ্গে স সততং তিষ্ঠতি ধ্রুবম্॥
যা চ কারণরূপা মে তৃতীয়া শক্তি রেব সা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশানাং জনয়িত্রী মতাপরা॥
দ্বিতীয়স্তাশ্চ সূক্ষ্ময়া সাহায্যেন ত্রিশক্তয়ঃ।
ব্রহ্মাণ্ডজন্তুরাধানস্থিতিনাশকরা মতাঃ॥
স্থূলা তু দৃশ্যমানেঽত্র সংসারেঽনন্তরূপতাং।
কুর্ব্বতী চাঽপি বৈচিত্র্যং ব্যাপ্নোত্যপ্যখিলং জগৎ॥"

বাক্য ও মনের অগোচরে আমার যে শক্তি আছে, তাহা যথা-ক্রমে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও তুরীয়া ভেদে চতুর্ব্বিধা। চতুর্থী তুরীয়া-শক্তিই যে সাক্ষাৎ জ্ঞান-স্বরূপিনী তাহাতে সন্দেহ নাই, সেই তুরীয়া-

শক্তিই আমাতে একাঙ্গরূপে নিশ্চলভাবে সতত অবস্থিতা রহিয়াছেন। আমার কারণরূপা তৃতীয়াশক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশের জনয়িত্রী। দ্বিতীয়া সূক্ষ্মশক্তির সহায়তায় ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন, পালন ও সংহার-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন এবং প্রথমা স্থূলশক্তি এই দৃশ্যমান সংসারে অনন্তরূপের সৃজন করিয়া জগতের সর্ব্বত্র বৈচিত্র্যময়ী হইয়া পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

নানাশাস্ত্রে ইনিই ইচ্ছা, ক্রিয়া তথা জ্ঞান-শক্তি অথবা ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও গৌরীশক্তি বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন। "সাধন-প্রদীপের" আদ্যাশক্তিতত্ত্বে এ সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। পাঠক প্রয়োজন মনে করিলে পুনরায় তাহা দেখিয়া লইবেন। সেই ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানাত্মক সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-সম্ভূত স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহের যাবতীয় তত্ত্ব বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়াকেই বিদ্যাতত্ত্ব জ্ঞান বলা হয়।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"জ্ঞানশক্তির্ভবানীশ ইচ্ছাশক্তি রুমা স্থিতা।
ক্রিয়াশক্তিরিদং বিশ্বমস্য ত্বং কারণং ততঃ॥"

পরমাত্মা স্বয়ং জ্ঞানশক্তিকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হইলেন, ইনিই পুরুষ এবং ইচ্ছাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া উমা নামে প্রকৃতিরূপে প্রকাশিতা হইলেন, পরে এই পুরুষ ও প্রকৃতি অর্থাৎ শিব ও শক্তি উভয়ে ক্রিয়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র বিশ্ব রচনা করিলেন। যিনি এই ত্রিশক্তির কারণস্বরূপ তিনি ব্রহ্ম শব্দ বাচ্য।

এই বিদ্যাতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীভগবান "শাক্তিগীতায়" বলিয়াছেন :—

"শক্তিতত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং তৎ সমাহিতাঃ
ব্রহ্মণশ্চিজ্জড়য়ো র্ভেদাৎ যে শক্তী পরিকীর্ত্তিতে ॥
চিচ্ছক্তিঃ স্বরূপা জ্ঞেয়া মায়া জড়া বিকারিণী।
কার্য্যপ্রসাধিনী মায়া নির্ব্বিকারা চিতিঃ পরা ॥"

"হে অর্জ্জুন, শক্তিতত্ত্ব বা বিদ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ প্রকারে বলিতেছি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। পরব্রহ্মের চিৎ ও জড়রূপা ভিন্ন ভিন্ন দুইটী শক্তি আছেন। ইহাদের উভয়ের মধ্যে চিৎশক্তি তাঁহারই স্বরূপা এবং জড়শক্তি তাঁহার বিকারী মায়া। মায়া হইতে সমস্ত জগৎ-কার্য্য সাধিত হয় বলিয়া তাঁহাকে কার্য্যপ্রসাধিনী বলা হয়, আর চিৎশক্তি নির্ব্বিকারা। অগ্নির যেরূপ দাহিক ও প্রকাশিকারূপ দুই প্রকার শক্তি আছে,—তাহার ঐ প্রথম দাহিকা শক্তিকে অগ্নি হইতে পৃথক অথবা অভিন্ন বলিয়া সহসা নির্ণয় করা যায় না। দাহ-কার্য্যের পূর্ব্বে অগ্নির সেই দাহিকা-শক্তি কি প্রকারে কোথায় ছিল, তাহা সহসা জানিতে পারা যায় না, কেবল কার্য্য দ্বারাই তাহার অনুমান হয়। আবার অগ্নি ব্যতীত সেই দাহিকাশক্তি অন্যত্র প্রকাশও পায় না, সুতরাং তাহাকে অগ্নি হইতে অভিন্ন বলিয়াই তখন স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু মন্ত্রাদি বা কোন দ্রব্যগুণ দ্বারা সেই দাহিকাশক্তি রুদ্ধ বা স্তম্ভিত হইলে আর যখন তাহা প্রকাশ পায়না, তখন অগ্নিতে তাহার যে স্থিতি আছে, তাহা বোধগম্য হয়না; অতএব তখন তাহাকে অগ্নি হইতে যেন ভিন্ন বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে হয়, মন্ত্র অথবা কোন দ্রব্য-গুণাদি যোগেই হউক বা যে কারণেই হউক অগ্নিতে তাহার অস্তিত্বের অভাব জ্ঞান হইলে, তাহা যে অনল হইতে তখন ভিন্ন, ইহা যেন অবধারিত বলিয়া বোধ হয় এবং উহার কার্য্যরূপ জীব-জড়ে

স্ফোটক বা ফোস্কার মধ্যেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব আশ্রয়রূপ অনল এবং উহার কার্য্যরূপ স্ফোটক এই উভয় হইতেই সেই দাহিকা-শক্তি ভিন্ন বলিয়া তাহাকে অসত্য-ভাবে অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রহ্মশক্তি মায়াও এই প্রকার অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয়া। সেই ব্রহ্মশক্তি-স্বরূপা মায়াও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন ইহা নির্ণয় করা যায়না। কেবল কার্য্যের দ্বারা তাঁহাকে অনুমান বা তাঁহার নির্দ্দেশ করা যায় মাত্র। জগৎ-কার্য্যের পূর্ব্বে তিনি কি ভাবে কোথায় ছিলেন, তাহা সহজে জানিতে পারা যায় না, কেবল তাঁহার কার্য্যের দ্বারাই তাঁহার অনুমান হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোথাও তিনি প্রকাশ হন না, কাজেই তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন স্বীকার করিতে হয়। আবার নামরূপাত্মক মায়িক জগতের অধিষ্ঠান, নির্ব্বিকার, নিত্য-শুদ্ধ-সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মাকে অবগত হইলে যখন তাহাতে মায়ার অস্তিত্বের অভাব জ্ঞান হয়, তখন তাহা যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ইহা নিশ্চয়। স্বকার্য্য নামরূপাত্মক জগতে তখন থাকে না। বাগিন্দ্রিয়-সম্ভূত শব্দ এবং মনোবিকারজাত রূপ মাত্রে তখন মায়ার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। অতএব তাঁহার আশ্রয়—পরব্রহ্ম ও তাঁহার কার্য্য-জগৎ হইতে তাঁহাকে তখন ভিন্ন বলিয়া অসৎ বা মিথ্যা বলা যায়। যেরূপ অগ্নির প্রকাশ অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে, ভিন্ন হইলে তাহা অগ্নি বলিয়াই গণ্য হয় না। সুতরাং প্রকাশ অগ্নিরই স্বরূপ এবং অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় পরমাত্মার মায়া জড়, বিকারী ও বিনাশশীলা, অর্থাৎ মিথ্যা বস্তুতে মিথ্যা নিশ্চয় হইলেই তাহার নাশ হয়।

এই মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে যে দ্বিবিধ, তাহা পূর্ব্বে বলা

হইয়াছে। যখন মায়া ব্রহ্মের দিকে মুখ করিয়া থাকেন, তখন তিনি বিদ্যা ; আর ব্রহ্মের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেই তিনি অবিদ্যা ; তখনই তিনি মোহকারিণী মায়ার বলে পরব্রহ্মের স্বরূপ গোপন করিয়া বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে স্বয়ং রজ্জু-সর্পের ন্যায় সত্য-স্বরূপ জগতাকারে আভাসিত হন। তাঁহারই মোহে আচ্ছন্ন হইয়া জীব আত্মবিস্মৃত হয় এবং দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ বিপর্য্যয়রূপ স্বার্থ-সাধনে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। বিচারশীল পুরুষ ব্রহ্মবিচার দ্বারা এই অবিদ্যাপাশ বা আত্মাতে অজ্ঞান মোচন করিলেই বিদ্যার কৃপায় ব্রহ্ম পরিদর্শনে সমর্থ হইতে পারে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, চৈতন্যই মায়ার একমাত্র আশ্রয়, চৈতন্যই সেই মায়া-ভাসিত হইয়া থাকে এবং সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য-সত্তাকে গ্রহণ করিয়া আবরণ শক্তির প্রভাবে তাঁহাকেই রজ্জু-সর্পের ন্যায় জগৎরূপে বিবর্ত্তিত করে। যাহা হউক এই অবিদ্যা ও বিদ্যারূপিণী মায়াকে জানিয়া পরে তাহার জড়সত্তা ও চিৎসত্তাকে অনুভব করিয়া সেই মহাবিদ্যারূপিণী মহামায়ার কৃপায় শিব বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া জীব মুক্ত হইতে পারে।

শ্রীশ্রীদেবী স্বয়ং বলিয়াছেন :—

"অহমেবাস পূর্ব্বন্তু নান্যৎ কিঞ্চিন্নগাধিপ।
তদাত্মরূপং চিৎসংবিৎ পরব্রহ্মক নামকম্॥"

সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি একমাত্র আত্মাস্বরূপে বিদ্যমান ছিলাম, আমার আত্মস্বরূপকে চিৎ, সংবিৎ ও পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইনিই বিদ্যাতত্ত্বস্বরূপ মহাবিদ্যা।

কুল সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগুরুদেব সাধককে এই বিচিত্র বিদ্যাতত্ত্ব বিচার সাধনার পূর্ব্বইঙ্গিত রূপে "বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা"

আচমন মন্ত্রের অধিকার ও উপদেশ দিয়া থাকেন। যিনি এই পরাবিদ্যাতত্ত্বে সিদ্ধ হইতে পারেন, তাঁহাকেই পরমহংস বলা হয়।

শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

শিবতত্ত্ব রহস্য।

"সহস্রারস্য মধ্যস্থে সহস্রদলপঙ্কজে।
তন্মধ্যে নিবসেত্তত্ত্ব শিবতত্ত্বং তদুচ্যতে॥"

শিরস্থিত সহস্রদল কমলমধ্যে যে পরমাত্মা সতত অবস্থিত রহিয়াছেন তিনিই পরম শিব। তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়ার নামই তত্ত্বজ্ঞান।

সহস্রদলস্থিত পরম শিব পরমাত্মা। ইঁহাকে আত্মাপুরুষ বা ঈশ্বর বলা হয়। ইনি সমস্ত জীবপিণ্ডে অবস্থিত হইয়া মায়াকে বশীভূত করণানন্তর ঈশ্বর নামে অভিহিত হন এবং যখন ইনি অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া থাকেন, তখন জীব শব্দে উক্ত হন। আবার উক্ত পরমাত্মা বা চৈতন্যই মায়া ও অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীব সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার কারণ হওয়ায় কোন কোনও মহাপুরুষ তাঁহার ঐ ক্রিয়াভাবকেই কারণ-শরীর বলেন। যদিও সাধারণতঃ প্রকৃতি ক্রিয়াকেই কারণ বলা যায় কিন্তু চৈতন্যসংযোগ ব্যতীত কোনও শরীরই রক্ষা হইতে পারে না। এই কারণ তন্ত্রে শ্রীসদাশিব শিবতত্ত্বকেই কারণশরীর বলিয়াছেন।

শিবগীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন :—

"অনাদ্যা বিদ্যয়াযুক্তস্তথাপ্যেকোঽহমব্যয়ঃ।
অব্যাকৃত ব্রহ্মরূপো জগৎকর্ত্তা মহেশ্বরঃ॥"

আমি এই নির্ব্বিকার পুরুষ হইয়াও অনাদি অবিদ্যা সংযোগে নামরূপ দ্বারা অনভিব্যক্ত অবিদ্যোপহিত ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়া

জগতের সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকি, তাই আমাকে মহেশ্বর শিব বলিয়া থাকে।

"জ্ঞানমাত্রে যথাদৃশ্য মিদং স্বপ্নে জগত্রয়ম্।
তথাময়ি জগৎসর্ব্বং দৃশ্যতেঽস্তি বিলীয়তে॥"

যেমন স্বপ্নাবস্থায় অনেক পদার্থেরই জ্ঞানমাত্রে সৃষ্টি হইয়া থাকে, বাস্তবিক তাহার কোন সত্তা নাই, তেমনই অবিদ্যাদ্বারা আমাতেই এই সমস্ত জগতের দৃশ্যত্ব, অস্তিত্ব এবং বিলয় অবস্থিত রহিয়াছে, অর্থাৎ যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা হইলেও জ্ঞানকালে তাহার সত্যতা উপলব্ধ হয়, তেমনই জগতের দৃশ্যত্ব, অস্তিত্ব এবং বিলয়াদি বাস্তবিক মিথ্যা হইলেও অবিদ্যাদ্বারাই তাহা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আমি বাক্য ও মনের অবিষয়, আমাকে সেই আনন্দস্বরূপ শিব বা ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। যে সাধক সেই অবিদ্যামুক্ত শিব বলিয়া আমায় জানিতে পারে, তাহার আর সংসার ভাবনা থাকে না, সে সমস্ত বিশ্ব মাঝে সমস্ত জীবের মধ্যে আমাকেই দেখিতে পায়। সেই একত্বদর্শী জ্ঞানী পুরুষ আমার স্বরূপ হইয়া মুক্তি লাভ করে। এই কারণ কুল-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদ্ গুরুদেব সাধককে এই অদ্ভুত শিবতত্ত্ব বিচার সাধনার পূর্ব্ব ইঙ্গিত রূপ "শিবতত্ত্বায় স্বাহা" আচমন মন্ত্রের অধিকার ও উপদেশ দিয়া থাকেন। যিনি সাক্ষাৎ শিবের ন্যায় ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, তিনিই শিবতত্ত্বজ্ঞ সাক্ষাৎ শিব-স্বরূপ, সাক্ষাৎ পরমহংস-পদবী-বাচ্য।

এই 'আত্মতত্ত্ব,' 'বিদ্যাতত্ত্ব' ও 'শিবতত্ত্ব' বিচার সম্বন্ধে সার উদ্দেশ্য এই যে, যখন সাধক স্থূল দেহাত্মা বা ঘটাকাশকে অবগত হইতে পারেন তখন তিনি জীবাত্মতত্ত্ববিদ্।

ত্রিতত্ত্বসার।

ইহাই সাধকের প্রথম সাধনা। এই সময় সাধক স্বীয় দেহ বা স্থূল অন্নময়কোষের প্রতি-পরমাণুর সংযোগমধ্যে চৈতন্যাভাষ আত্মার যে বিচিত্র সত্তা বিদ্যমান আছে, তাহাই অনুভব করিতে যত্ন করেন। পূর্ব্বকথিত আটা বা ময়দার সহিত জলের মিলন-জাত গুলির বা নেচির মধ্যে জলের অস্তিত্ব স্পষ্ট প্রত্যক্ষ না হইলেও উহার প্রতি পরমাণুর মধ্যে সূক্ষ্ম জল-পরমাণুর অস্তিত্ব অনুভব করার ন্যায় এই দেহস্থিত চৈতন্যকে অনুভব করেন। অনন্তর যখন সাধক সূক্ষ্ম-দেহস্থিত আত্মশক্তিস্বরূপ কুণ্ডলিনী-শক্তিকে অবগত হইতে পারেন, তখনই তিনি বিদ্যাতত্ত্ববিদ। ইহাই সাধকের দ্বিতীয় সাধনা। এই সময় সাধক স্বীয় সূক্ষ্ম-দেহরূপ প্রাণময়-কোষ হইতে সূক্ষ্মতরাদি কোষগুলির সহিত কেমন অব্যক্ত লীলা-বিন্যাস-সহযোগে কুণ্ডলিনীরূপ চৈতন্যশক্তি বা প্রকৃতি স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের মূল-সংযোগ স্থাপনপূর্ব্বক মূলাধারে বিরাজিত রহিয়াছেন, তাহাই প্রত্যক্ষ করিতে যত্নবান হন। ইহার পর যখন স্থূল ও সূক্ষ্মের কারণরূপ সহস্রার-কমলমধ্যস্থিত আত্মাকে বা পরমশিবকে অবগত হইতে পারেন, তখনই তিনি শিবতত্ত্ববিদ। ইহাই সাধকের তৃতীয় সাধনা। এই সময় সাধক কারণ-শরীররূপ চিদাত্মার বিকারহীন আত্মসত্তা যাহা ব্রহ্মরন্ধ্রূপ সত্যলোক বা সহস্রারে বিরাজমান তাহাই অনুভব করিতে যত্নবান থাকেন। এই ভাবে সাধক-প্রবর উত্তরোত্তর উন্নত জ্ঞান-মার্গে সমুপস্থিত হইয়া, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞান-সাধনায় তুরীয় অবস্থায় পরিণত হইতে পারেন।

শ্রীসদাশিব তাহার রহস্যের উপদেশক্রমে বলিয়াছেন:—

ব্রহ্মতত্ত্ব রহস্য

"মূলাধারে বসেৎশক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ।
তয়োরৈক্যে মহেশানি ব্রহ্মতত্ত্বং তদুচ্যতে॥

হে-মহেশানি! মূলাধারে কুণ্ডলিনী-শক্তি এবং সহস্রারে সদাশিব সতত অবস্থান করিতেছেন, ইহাঁদের উভয়ের একত্র সম্মিলন করার নামই ব্রহ্মতত্ত্ব। সমাধি-যোগ ব্যতীত ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপ অনুভব হয় না। প্রকৃতি এবং পুরুষের একাত্মতাভাব কেবল সমাধি-অবস্থাতেই অনুভব হইয়া থাকে। সমাধিস্থ যোগী ব্যতীত অন্য কাহারও ব্রহ্মস্বরূপ বোধ হয় না বা ব্রহ্মজ্ঞান অনুভব হয় না।

শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"সমাধিযোগৈ স্তদ্বেদ্যং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিভি ঃ।
দ্বন্দ্বাতীতৈঃ নির্ব্বিকল্পৈ র্দেহাত্মাধ্যাসবর্জ্জিতৈ ঃ॥"

যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী অর্থাৎ রাগ বা প্রেম অথবা অনুরাগ এবং দ্বেষ বা ঘৃণা এই উভয়ভাব বর্জ্জিত, দ্বন্দ্বাতীত অর্থাৎ সুখদুঃখাদিরূপ কোনও দ্বন্দ্বে যিনি লিপ্ত নহেন, যাঁহার কোনও সঙ্কল্প বা বিকল্প নাই এবং যিনি আত্মাভিমানবিহীন, তিনিই সমাধিযোগ দ্বারা এই ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিয়া থাকেন। "শ্রীভগবতী গীতায়" উক্ত হইয়াছে :—

" শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী যোগিগণ শিবশক্তি বা নিত্যস্বরূপ পুরুষ ও প্রকৃতিয় একতাকেই ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

" শক্তিযামলে" নিত্যা প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :—

"ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদীনাং ভবো যস্যাং নিজেচ্ছয়া।
পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং নিত্যা সা পরিকীর্ত্তিতা॥"

ভাষ্যকার ব্রহ্মানন্দগিরি বলিয়াছেন :—

"পরমশ্চাসৌ আত্মা চেতি পরমাত্মা। উৎকৃষ্ট আত্মা ইত্যর্থঃ।
উৎকৃষ্টত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়া ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদি শরীরোৎপাদনং ধত্তে।
অথবা তত্তদিন্দ্রিয়রহিতোঽপি তত্তদিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষাশ্রয়ঃ॥"

শ্রুতিতে আছে :—

"অপাণি পাদো যবনো গৃহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বং ন হি তস্য বেত্তা, তমাহুরাদ্যং পুরুষপ্রধানম্॥"

যাঁহার নিত্য ইচ্ছা নিবন্ধন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উদ্ভব হয় এবং ইঁহারা যাঁহাতে পুনরায় লয়প্রাপ্ত হন, তাঁহাকেই নিত্যা প্রকৃতি বলা যায় এবং পরমপুরুষরূপ আত্মাকে পরমাত্মা বলা যায়। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আত্মাকেই পরমাত্মা কহে। এই আত্মা নিজ ইচ্ছা বলেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদির দেহরূপে প্রতিভাত হন। সেই কারণ ইনি উৎকৃষ্ট আত্মা বা পরমাত্মা। কিম্বা নেত্রাদি ইন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও তত্তৎ ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নাম পরমাত্মা। তিনি হস্তপদাদিবিহীন হইয়াও তত্তৎ ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষের কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নাম পরমাত্মা। তিনি হস্তপদাদিবিহীন হইয়াও গমন ও গ্রহণ করেন এবং নেত্র ও কর্ণ বিহীন হইয়াও সদা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাই তাঁহাকে আদিভূত পরমপুরুষ বলে। নিত্যা-প্রকৃতি ও পরম-পুরুষের সমন্বয়ভূত ব্রহ্মতত্বই তত্বদর্শী যোগিগণের অনুভাব্য বিষয়।

মুমুক্ষু পাঠকের রাজযোগ-নির্দ্দিষ্ট 'বিরাট.' 'ঈশ্বর' ও 'ব্রহ্ম' এই ত্রিবিধ ধ্যানের অবশ্যই স্মরণ আছে। আমি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড-

পিণ্ডে সমগ্র জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, অথবা এই "জগৎই ব্রহ্মের স্বরূপ" এই রূপ চিন্তাদ্বারা ব্রহ্মের বিরাট ধ্যান হয়। এস্থলে জগৎই সমস্ত, জগতের সকল স্থূল-দৃশ্যই আমার প্রত্যক্ষীভূত রহিয়াছে; মুখ্যবস্তু এখানে কেবল জগৎ এবং ব্রহ্মবস্তু এখনও আমার গৌণভাবে রহিয়াছেন। জগতের সর্ব্ববিধ অবস্থা ও কার্য্যের মধ্য দিয়াই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভব করিতেছি, সুতরাং এ স্থলে জগৎই ব্রহ্মের তদাত্ম অবস্থা। ইহার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় ভাব, "ব্রহ্মই জগৎ" অর্থাৎ বিরাট ব্রহ্মাণ্ড বা পিণ্ডের সহিত ঈশ্বরের বা আমার কোনও ভেদ নাই, অথবা আমিই জগৎময় সমস্ত দৃশ্যের দ্রষ্টাস্বরূপ ঈশ্বর; এ স্থলে ব্রহ্মবাচ্য ঈশ্বরই মুখ্যবস্তু, জগৎ ক্রমে গৌণভাবে পরিণত হইয়াছে বা পরিদৃষ্ট হইতেছে। সেই কারণ ব্রহ্মই জগৎ এখন প্রধান ধ্যেয় বস্তু। এ স্থলে ব্রহ্মই জগতের তদাত্ম অবস্থা। অনন্তর আমিই সেই সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপ ধ্যান-সাধনার, জীব ও ঈশ্বরের ভেদজ্ঞান যখন বিদূরিত হইবে, তখনই ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণরূপে অনুভব হইবে।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মর্ম্মে মর্ম্মে যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মশক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহারই নাম প্রকৃতি এবং তাহার সহিত যে অদ্বিতীয় চৈতন্য-সত্তা সতত স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন, তাঁহারই নাম শিব। ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডের মধ্যে এই ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্মচৈতন্যের একতা অনুভব করাকেই ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানানুভূতি বলা যায়। একটী অভঙ্গ চণক বা ছোলার মধ্যে যে যে গুণ বিদ্যমান আছে, তাহার চূর্ণীভূত প্রতি কণিকার মধ্যেও যেমন সেই সেই গুণের অভাব থাকে না, সেইরূপ এক বিরাট চণকপ্রতিম এই ব্রহ্মাণ্ড, আর পিণ্ড

তাহারই অংশ বা কণিকাসদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু, সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, বিরাটে যাঁহা সমষ্টিভাবে আছে, পিণ্ডমধ্যেও সেই সেই শক্তি ও গুণ সতত ব্যষ্টিভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব ব্যষ্টিজীবরূপ যে কোন সমুন্নত সাধন-পরায়ণ মহাত্মা পূর্ব্বকথিতানুরূপ পিণ্ডের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ এবং তাহারই প্রতি পরমাণুর মধ্যে নিত্যস্থিত ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্মচৈতন্যের সমন্বয় অনুভব করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনার প্রসঙ্গে এইরূপ কথাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পুরুষ ও প্রকৃতি ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত ব্রহ্মচৈতন্য যেন মায়ারূপ বল্কলে চণকসদৃশরূপে সতত আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিকালে সেই বল্কল বা মায়াবরণ যেন ভেদ করিয়া শিবশক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা জীবপিণ্ডেও অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্মাদিশরীরও প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্মচৈতন্যময়। ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারাই এ দেহ চেতনাবান্, আবার তাঁহারই অভাবে এই স্থূলদেহ জড়বৎ প্রতীয়মান হয়।

সচ্চিদানন্দময় অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম যেন স্বীয় আবরণ উন্মোচন করিয়াই স্বয়ং দ্বিধাভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দরস উপভোগ করিবার জন্যই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তিরূপে পুরুষ ও প্রকৃতি বা শিব-শক্তিভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সাধক সেই বিচিত্র পিণ্ডবিজ্ঞান বা "আত্মতত্ত্ব" হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় "বিদ্যাতত্ত্ব" ও "শিবতত্ত্ব" বিজ্ঞান-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শিবশক্তির বা পুরুষ-প্রকৃতির দ্বিধাভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার একমাত্র পরব্রহ্মভাব অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য ও তাঁহার শক্তির ওতপ্রোত জড়িত একীভূত ভাব অনুভব করিতে

সমর্থ হন। সৃষ্টি-কল্পনায় অনুলোমভাবে তিনি যেমন দ্বিধাভূত হইয়া থাকেন, লয় বা সাধকের মুক্তিরূপ সমাধি-কল্পনায় প্রতিলোম-ভাবে তেমনি তিনি একীভূত হইয়া থাকেন। শিব-শক্তি বা পুরুষপ্রকৃতির এইরূপ একত্ব জ্ঞানই "ব্রহ্মতত্ত্ব" বিজ্ঞান বলিয়া জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগের শেষ সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। ফলকথা যতদিন জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সতত ভেদদৃষ্টি বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ জ্ঞান হইতে সাধক কিছুতেই নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবেন না; সুতরাং ততদিন তাঁহার পূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানও আয়ত্ত হইবে না।

বাহ্য-জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্তনমাত্র, তাহা অতিক্রম করিতে পারিলে অন্তর্জগতে প্রকৃতিজ্ঞান উপলব্ধ হয়, অনন্তর বাহ্য-জগতে সেই মায়ার লীলা দেখিয়া তাঁহার দ্রষ্ট্রার প্রতি ধ্যান পড়িলে ঈশ্বর-জ্ঞান হয়, তাহার পর যখন সেই মায়া ও ঈশ্বরের একত্ব-জ্ঞান অনুভব হয়, তখনই যোগিশ্রেষ্ঠদিগের ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভূত হইয়া থাকে।

মন্ত্রযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া হঠ, লয় ও রাজযোগাদি সাধন-ক্রমে আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভব পর্য্যন্ত জন্ম-জন্মান্তরের অবিরত সাধনায় সাধক-প্রবর যখন এই নির্দ্দন্দ্বস্থানে উপনীত হয়েন, তখনই তাঁহার জীবন্মুক্ত-দশা প্রাপ্তি হয়। এই অবস্থায় ব্রহ্মানন্দরসে তিনি তন্ময় হইয়া যান। তাঁহার সকল কর্ম্মবন্ধন তখনই নিবৃত্তি হয়। প্রারব্ধ কর্ম্ম-ভোগ ক্ষয় হইলে আর আগম কর্ম্মের আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং জীবন্মুক্ত পুরুষের আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তখন অনারব্ধ কর্ম্মবীজ-সমূহ নিষ্কাম সাধনায় ও জ্ঞানবলে দগ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং সেই

দগ্ধবীজ হইতে আর অঙ্কুর উদ্গমের সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রীভগবান "গীতায়" বলিয়াছেন :—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।"

হে অর্জ্জুন তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা সকল কর্ম্মই ভস্মীভূত হইয়া যায়। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ-মাত্রই হইয়া থাকে। সঞ্চিত কর্ম্মের সংস্কার-রূপ বীজ চিত্তাকাশে অবস্থান করিয়া থাকে। যখন জ্ঞানী-মহাপুরুষ অপরোক্ষ-জ্ঞানে জানিয়া অনুভব করিয়া থাকেন যে, আমি পঞ্চকোষাত্মক স্থূলাদি শরীরত্রয় নহি, আমি ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ড নহি, আমি এ সমুদায়ের দ্রষ্টামাত্র, তখনও পঞ্চকোষে চিত্তা-কাশে অবস্থিত সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার থাকে, কিন্তু সেই কর্ম্মসংস্কার জীব-ন্মুক্ত মহাত্মাকে বন্ধন করিতে পারে না। যেমন কুম্ভকার নিজের হস্ত ও দণ্ডকে চক্র হইতে পৃথক্ করিয়া লয়, তাহার পর চক্রের সেই বেগ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অবিরতভাবে সেই চক্র আপনা আপনি ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা জ্ঞানদ্বারা জীব-ন্মুক্তদশা প্রাপ্ত হইলেও শরীরের অন্তপর্য্যন্ত স্থূলশরীরের উৎপাদক পূর্ব্বসংস্কারজ প্রারব্ধ ভোগ করিয়া থাকেন। প্রারব্ধ কর্ম্ম কেবল ভোগের দ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

এই জীবন্মুক্ত দশায় মন, বাক্য ও কর্ম্ম এই তিনটী বিষয় যে জ্ঞানে লয় হইয়া যায়, তাহারই নাম ব্রহ্মজ্ঞান। স্বপ্ন ব্যতীত নিদ্রায় বা সুষুপ্তিতে যেরূপ অবস্থা হয়, ব্রহ্মজ্ঞানে কতকটা সেই-রূপ এক অপূর্ব্ব ও অব্যক্ত অবস্থা হইয়া থাকে। সে জ্ঞানে সাধক নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, শান্ত, চিন্তা ও নিদ্রাবর্জ্জিত হন এবং বালকের ন্যায় নির্ম্মলস্বভাব বিশিষ্ট হন, সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলে।

"জ্ঞান-সঙ্কলিনী"তে শ্রীসদাশিব সেই কথাই বলিয়াছেন :—

"মনো বাক্যং তথা কর্ম্ম তৃতীয়ং যত্র লীয়তে।
বিনা স্বপ্নং যথা নিদ্রা ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে॥
একাকী নিস্পৃহঃ শান্ত শ্চিন্তানিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ।
বালভাব স্তথাভাবো ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে॥"

এই ব্রহ্মজ্ঞান-তত্বই জীবন্মুক্ত পরমহংসদেবের অন্তিম অবলম্বন। তখন একমাত্র ব্রহ্মানন্দরসে তিনি তন্ময় হইয়া যান।

"অহমাত্মা পরংব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্।
ব্রহ্মবিজ্ঞানমানন্দং সতত্বমসি কেবলম্॥
অহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্ম অশরীর-মনিন্দ্রিয়ম্।
অহং মনোবুদ্ধিমরুদহঙ্করাদিবর্জ্জিতম্॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি মুক্তং জ্যোতিস্তদীয়কম্।
নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধিযুক্তং সত্যমানন্দমদ্বয়ম্।
যোঽসাবাদিত্য পুরুষঃ সোঽসাবহমখণ্ডওঁ॥"

আমিই সেই আত্মা পরব্রহ্ম, সত্য ও অনন্তজ্ঞানস্বরূপ, ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ও তাঁহার আনন্দসত্তা কেবল তত্বমসি-পদ-বাচ্য; আমিই অশরীরী ইন্দ্রিয়াদি বিহীন ব্রহ্মস্বরূপ; আমি মন বুদ্ধি বায়ু অহঙ্কারাদি বর্জ্জিত, জাগ্রৎ-স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যাদি অবস্থারহিত ব্রহ্ম-জ্যোতির্স্বরূপ, আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধিযুক্ত সত্য ও আনন্দরূপ অদ্বিতীয় যে আদিত্য পুরুষ অখণ্ড ওঁ প্রণবাত্মক তাহাও আমি। এইরূপ ধ্যান করিতে পারিলেই সাধকের সমাধি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"মহানির্ব্বাণে" শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন:—যিনি সর্ব্বত্র একমাত্র সত্য ও আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অবলোকন করিতেছেন, তিনি স্বভাবতঃই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পূজা ও ধ্যানাদি

কিছুই সম্ভবপর হইতে পারে না। যিনি সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম এইরূপ অনুভব করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে পাপ পুণ্য, স্বর্গ নরক, জন্ম জন্মান্তর, ধ্যেয় ধ্যাতা, কিছুই নাই। তিনি যে তখন আত্মস্বরূপ। আত্মা সদাই মুক্ত, তিনি কোন বস্তুতেই লিপ্ত নহেন, তাঁহার আবার বন্ধন কোথায়? মায়াবশেই বন্ধন। সে বশ্যতা দূর হইলে আত্মার আবার তখন মুক্তি কামনা কি? এই জগৎ ব্রহ্মের নিজ মায়া দ্বারাই বিরচিত হইয়াছে। দেবতারাও ইহার মর্ম্ম সহজে উদ্ভেদ করিতে পারেন না। পরব্রহ্ম পরমাত্মা এই জগতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের মত বিরাজিত রহিয়াছেন। যেমন সকল বস্তুরই অন্তরে ও বাহিরে আকাশ আছে, সেইরূপ সৎস্বরূপ ও সাক্ষীস্বরূপ আত্মা স্বরূপতঃ সর্ব্বত্রই বিরাজিত রহিয়াছেন। ইষ্টক, প্রস্তর বা মৃৎ-প্রাচীরের গৃহ নির্ম্মাণ করা হইল, অথবা বস্ত্রের কাণ্ডার রচনা করিয়া পটমণ্ডপ বা তাম্বুর ন্যায় গৃহবিন্যাস করা হইল, তাহাতে উন্মুক্ত অসীম আকাশ কিয়ৎক্ষণের জন্য কিঞ্চিৎ বেষ্টন করিয়া লওয়া হইল মাত্র। প্রাচীর কালের বশে ধ্বসিয়া পড়িয়া গেল, বস্ত্রাবরণ জীর্ণ হইয়া গলিয়া গেল, অথবা বিস্তৃত পটমণ্ডপ প্রয়োজন অভাবে খুলিয়া গুটাইয়া রাখা হইল। তখন সেই গৃহ বা পটমণ্ডপের অন্তর্গত সীমাবদ্ধ আকাশ অমনি উন্মুক্ত অনন্ত আকাশে মিলাইয়া মিশাইয়া গেল। সাক্ষীস্বরূপ আত্মা জীব-ভাবে মায়ার আবরণে আবদ্ধ থাকে মাত্র, জ্ঞানশস্ত্রে তাহার বিনাশ করিতে পারিলেই সেই আত্মা জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

"আত্মতত্ত্ব" বিচার অংশেও বলা হইয়াছে যে, ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মা বলিয়া কথিত হয়। তাহা ঠিক বাঁশের পর্ব্বের বা "পাঁবের" মধ্যস্থিত সেই প্রকৃতিবদ্ধ

আকাশের মতই পঞ্চকোষময় পিণ্ডের অন্তরস্থিত বা কুটস্থ আত্মাতে বুদ্ধি-কল্পিত হইয়া প্রকাশিত। ইহাকেই শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্যদেব প্রত্যগাত্মা "পারমার্থিক জীবস্বরূপ" বলিয়াছেন। কিন্তু জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চিদাভাসকে "প্রতিভাসিত জীবস্বরূপ" এবং স্বপ্নকল্পিত দেবতা মনুষ্যাদির তুল্য স্বপ্নবৎ এই স্থূলশরীরাদি "ব্যবহারিক জীবস্বরূপ" বলিয়াছেন। অবচ্ছিন্ন, চিদাভাস ও স্বপ্ন-কল্পিত অর্থাৎ পারমার্থিক, প্রতিভাসিক ও ব্যবহারিক এই ত্রিবিধ জীবস্বরূপ। এতন্মধ্যে অবচ্ছেদ কেবল উপাধি-যোগেই কল্পনামাত্র। যাহাতে অবচ্ছেদ কল্পনা করা যায়, সেই অবচ্ছেদ বস্তুই সত্য। অখণ্ড পরিপূর্ণ মহাকাশের মধ্যে ঘট উপাধি সংযোগে ঘটাবচ্ছিন্ন বলিয়া যেমন কথিত হয়, পরন্তু সেই অবচ্ছেদ কেবল কল্পিত বা মিথ্যামাত্র, কারণ ঘট সত্বে বা ঘটনাশে একমাত্র মহাকাশই যেরূপ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ অখণ্ড পরিপূর্ণ এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম বুদ্ধি-উপাধিযোগে বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন বলিয়া প্রকাশিত হয়েন। সেই অবচ্ছেদ কল্পিত এবং মিথ্যা হইবার কারণ বুদ্ধির সত্তায় বা নাশে সেই অখণ্ড এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যই সর্ব্বদা স্বভাবতঃ পূর্ণভাবে থাকেন। অতএব বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে জীবত্ব কল্পিত ও মিথ্যা। স্বভাবতঃ অখণ্ড এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যই সতত পূর্ণরূপে সত্য। তত্ত্বমসি সাধনাদ্বারা বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের একত্ব অনুভব হইবে। প্রতিভাসিক ও ব্যবহারিক জীব তাহা নহে।

যাহা হউক আকাশের ন্যায় আত্মারও জন্ম নাই, বাল্য-যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থাও নাই, তাঁহার জরা ও মৃত্যু অবস্থাও নাই। তিনি সততই একরূপ চিন্ময় ও বিকার বিবর্জ্জিত। মায়ার খেলায় পঞ্চ-

ভৌতিক দেহেরই জন্ম, যৌবন ও বিনাশ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু পরিণাম ও বিকারবিহীন আত্মাতে এতদ্‌সমুদায় সম্ভাবিত নহে। গৃহাদিপ্রস্তুত হেতু যেমন আকাশের অঙ্গ বিকৃত বা মলিনতা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মাও বিকৃত বা বিকলাঙ্গ হন না। মনুষ্যসমূহ মায়ার আবরণে জীবরূপে আবদ্ধ; তাহাদের বুদ্ধিও মায়াচ্ছাদিত হইবার কারণ, তাহাদের চারিদিকে, মায়ার আবরণ সীমার বাহিরে, আত্মার অনন্ততার ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহারা অজ্ঞানরূপ ক্ষুদ্র গবাক্ষপথের মধ্য দিয়া আত্মরূপ দেখিয়াও বুঝিতে পারে না। সলিলপূর্ণ প্রত্যেক ঘটের মধ্যেই যেমন একমাত্র সূর্য্য বা চন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ যে ঘটের মধ্যেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই সেই প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ মায়াপ্রভাবেই প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাসিকরূপে অবিচ্ছিন্ন আত্মারই চিদাভাস লক্ষিত হইতেছে। যেমন ঘটস্থিত সলিল আন্দোলিত হইলে সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতিবিম্বও চঞ্চল বোধ হয়, অর্থাৎ তাহাতে তখন সেই প্রতিবিম্ব স্পষ্ট প্রতীত হয় না, অজ্ঞান ব্যক্তিরাও সেইরূপ তাহাদের বুদ্ধি-চাঞ্চল্য হেতু আত্মার স্বরূপ সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারে না। গুরূপদিষ্ট যথা-রীতি ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞান যোগাদির সাধনা-দ্বারা বুদ্ধি ও চিত্ত সুস্থির হইলেই নিস্তরঙ্গ সলিলান্তরে নিপতিত নির্ম্মল স্থির প্রতি-বিম্ব-সদৃশ আত্মরূপ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। গৃহান্তর্গত বা ঘটমধ্যস্থ আকাশ, গৃহ বা ঘট নির্ম্মাণের পূর্ব্বে যেমন ছিল, সেই গৃহ বা ঘট ভগ্ন হইলে সেই আকাশ পূর্ব্বের ন্যায়ই অবিকৃত থাকিবে। আত্মাও সেইরূপ অবিদ্যার বশে ত্রিবিধ শরীর মধ্যে আবদ্ধ হইলেও বিদ্যার সাধনায় ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সূর্য্যের উদয়ে মায়ার সেই গভীর

অন্ধকার বিলুপ্ত হইবার ন্যায় শরীরত্রয় বিনষ্ট হইলে আত্মা পুনরায় পূর্ব্ববৎ সমভাবে বিরাজমান থাকেন।

"মহানির্ব্বাণে" শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেঽপি তাদৃশম্।
নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে॥
আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈক সাধনম্।
জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"

যেমন ঘট ভগ্ন হইলেও ঘটান্তর্গত আকাশ পূর্ব্বের ন্যায় থাকে, সেই প্রকার দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা পূর্ব্বের ন্যায়ই সমভাবে বিরাজমান থাকেন। অতএব হে দেবি, এইরূপ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র কারণ। যে ব্যক্তি এইরূপ জ্ঞাত হয়েন তিনিই মুক্ত পুরুষ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ কথা সত্য, সত্য, সত্য!

বেদান্তেও ইহার প্রতিধ্বনি :—

"ঘটাবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা।
ঘটো নীয়তে নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ॥"

ফলতঃ এই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র কারণ। যিনি ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি ইহলোকেই জীবন্মুক্ত মহাপূর্ণ পরমহংস হইয়া থাকেন।

তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য রহস্য।

তত্ত্বমসি রহস্য।

মুক্তিকামী পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, যখন শ্রীগুরু পরমহংসদেব তদীয় উপযুক্ত শিষ্যকে শেষ সন্ন্যাস-দীক্ষায় উপদেশক্রমে আজ্ঞা করিতেছেন :—

"তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞো হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর॥"

হে মহাপ্রাজ্ঞ "তৎ-ত্বম্-অসি" অর্থাৎ তুমি সেই ব্রহ্ম হও, তুমি আপনাকে 'হংস' ও সোঽহম্ এইরূপ ভাবনা কর এবং এক্ষণে মমতা-রহিত ও অহঙ্কার-পরিশূন্য হইয়া স্বভাবে অর্থাৎ আত্মভাবে বা ব্রহ্মভাবে তদ্‌গত হইয়া সুখে বিচরণ কর। মুমুক্ষু পাঠকের অবগতির জন্য এক্ষণে এই তত্ত্বমসি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিচার ও আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। এই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত।

"অবধূত গীতায়" উক্ত হইয়াছে :—

"তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেন স্বাত্মা হি প্রতিপাদিতঃ।
নেতি নেতি শ্রুতির্ব্রূয়াদনৃতং পাঞ্চভৌতিকম্॥"

'তত্ত্বমসি' এই বাক্য দ্বারা আত্মাকেই প্রতিপন্ন করা হইতেছে এবং নেতি নেতি অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে ইত্যাদি বিচার বাক্যের দ্বারা এই মিথ্যাভূত পাঞ্চভৌতিক জগৎকে নিরাশ করিয়া শ্রুতিবাক্যসমূহ এক পরিশুদ্ধ আত্মাকে প্রতিপন্ন করিতেছে।

তত্ত্বমসি বাক্য বিশ্লেষণ করিলে তৎ + ত্বং + অসি এই তিন শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'তৎ' অর্থে তিনি, "ত্বং" অর্থে তুমি এবং "অসি" অর্থে হওয়া. অর্থাৎ তিনিই তুমি হও। ইহার তাৎপর্য্য কি? শাস্ত্র বলিয়াছেন, তৎ বা তিনি শব্দের লক্ষ্য ব্রহ্ম। " পঞ্চদশীতে " উক্ত হইয়াছে :—

"জগতো যদুপাদানং মায়ামাদায় তামসীম্।
নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বাং তামুচ্যতে ব্রহ্মতদ্গিরা॥"

জগতের উপাদান-কারণ তমোগুণপ্রধান এবং নিমিত্ত-কারণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান যে মায়া, তদুপাধিবিশিষ্ট পরব্রহ্ম ' তৎ ' এই শব্দের বাচ্য অর্থ হন।

এই ' তৎ ' শব্দের লক্ষ্যার্থ সম্বন্ধে " শ্রীশঙ্করবিজয়ে " উক্ত হইয়াছে :—

"বেদান্তবাক্যসম্বেদং বিশ্বাতীতাক্ষরাদ্বয়ং।
বিশুদ্ধং যৎ স্বসম্বেদ্যং লক্ষ্যার্থস্তৎপদস্য সঃ॥"

বেদান্তবাক্য-বেদ্য, বিশ্বাতীত, অক্ষর, অদ্বয় যে বিশুদ্ধ স্বসম্বেদ্য তাহাই অর্থাৎ ব্রহ্মই এই তৎ বা তিনি শব্দের লক্ষ্য অর্থ। ত্বং বা তুমি শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ চৈতন্য জীব।

শ্রীশঙ্করবিজয়ে ইহার বাচ্যার্থ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :—

"দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্মান্ যঃ স্বাত্মন্যারোপয়ন্ মৃষা॥
কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানী চ বাচ্যার্থ ত্বং পদস্য সঃ॥"

দেহেন্দ্রিয়াদি ও অন্যান্য ধর্ম্মগুণসকল, নির্গুণ আত্মাতে আরোপ করিয়া যে কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানী হয়, তাহাই তুমি বা ত্বং পদের অর্থ। অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মে উপাধি ও ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া সগুণ জীব-ভাব বিবেচনা করা।

এই ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে :—

"দেহেন্দ্রিয়াদি সাক্ষী যস্তেভ্যো ভাতি বিলক্ষণঃ।
স্বয়ং বোধস্বরূপত্বা লক্ষ্যার্থস্ত্বং পদস্য সঃ॥"

যিনি স্বয়ং বোধস্বরূপ, দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষী এবং সকলরূপ প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন, তিনিই ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম।

" পঞ্চদশীতেও " দেখিতে পাওয়া যায় :—

"যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্ম্মাদিদূষিতাম্।
আদত্তে তৎপরং ব্রহ্ম ত্বং পদেন তদুচ্যতে॥"

কামনাদি বিষয় দোষ দূষিত, মলিন সত্ত্বপ্রধান, মায়ারূপ উপাধি-বিশিষ্ট সেই পূর্ব্বোক্ত নিত্যজ্ঞান-আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম " ত্বং" এই শব্দে উক্ত হন।

"ত্রিতয়ামপি তাং মুক্ত্বা পরস্পরবিরোধিনীম্।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে "

পরস্পরবিরোধী সেই পূর্ব্বোক্ত তমোগুণপ্রধান, বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান এবং মলিনসত্ত্বপ্রধান এই তিন প্রকারে বিভক্ত যে মায়া, তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ নিত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ অখণ্ড-চৈতন্য, ভোগত্যাগলক্ষণাদ্বারা মহাবাক্যে লক্ষিত হয়।

"একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ ত্বং তদিতীর্য্যতে॥
শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্ত্বত্র ত্বং পদেরিতম্।
একতা গৃহ্যতেঽসীতি তদৈক্য মনুভূয়তাম্॥"

সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের " তত্ত্বমসি " এই মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে পঞ্চদশীকার ঐ বাক্যের মধ্যে

প্রথমে ' তৎ ' পদের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন। প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান নামরূপাত্মক জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র নামরূপ বিবর্জিত সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন এবং এক্ষণেও তিনি তদ্রূপে অবস্থিত আছেন, তিনিই তৎ শব্দের বাচ্য হন। এবং ঐ বাক্যস্থিত ' ত্বং ' শব্দের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশপূর্ব্বক তদুভয়ের ঐক্য নিরূপণ করিতেছেন যে, প্রাণী-সকলের দেহান্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন যে অন্তঃকরণস্থিত চৈতন্য, তিনিই ত্বং পদের বাচ্য হন। 'অসি' এই পদদ্বারা তৎ ও ত্বং এই উভয় পদের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব এতদুভয়ের ঐক্য অনুভব করা কর্ত্তব্য।

অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মচৈতন্য-বোধক 'তৎ' শব্দ অর্থাৎ তিনি এবং প্রত্যক্ষ জীবচৈতন্য-বোধক 'ত্বং' শব্দ অর্থাৎ তুমি এই উভয় শব্দের তাৎপর্য্য এক চৈতন্যময় ব্রহ্ম হওয়ায় 'তৎ' ও 'ত্বং' শব্দদ্বয় ব্রহ্মচৈতন্যরূপ একাধিকরণে অবস্থিত হইল। যে হেতু এই উভয় শব্দের লক্ষ্যার্থ একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্য।

বেদান্তাদি শাস্ত্র এই 'তত্ত্বমসি' শব্দের বিচারে অধ্যারোপ, অপবাদ ন্যায় ও সমাধানাদি সম্বন্ধত্রয় দ্বারা, বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। ফলতঃ তৎ অর্থাৎ সেই পরমাত্মা এবং ত্বং অর্থাৎ এই জীবাত্মা এই উভয় পদের ঐক্য অসি পদের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষাদি জীবধর্ম্মসকল ত্বংপদ হইতে পরিত্যাগ করিলে এবং তৎপদ পরোক্ষত্বাদি ধর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিলে, কেবল শুদ্ধ কুটস্থ অদ্বৈত পরমবস্তু মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই অবশিষ্ট পরমবস্তুর লক্ষ্যার্থ ব্রহ্ম। সুতরাং তৎ ত্বং পদদ্বয়ের অত্যন্ত ঐক্য-জন্য তৎ + ত্বং + অসি = তত্ত্বমসি পদ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ

'তৎ'ই তুমি, এবং তুমিই 'তৎ' অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্ম। তুমি নিজেই যে পরমাত্মা তাহা বিস্মৃত হইয়াছ; তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে সেই অদ্বয়ানন্দ চিন্মাত্র শুদ্ধ আত্মাই যে তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে। বস্তুতঃ তুমি নিষ্প্রপঞ্চ ও নিত্য মুক্ত। অতএব তুমি শ্রীগুরুর কৃপায় তত্ত্বমসি-বিচার-সাধনায় অদ্বৈত অক্ষর নিজানন্দ স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া জীবন্মুক্ত বিশ্রান্ত ও শান্তি প্রাপ্ত হও। সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রদানসময়ে সেই কারণ ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে পুনঃ নমস্কার করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,

"ত্বমেব তৎ তৎত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তু-তে॥"

'শান্তিগীতা'য় শ্রীভগবান বলিয়াছেন:—হে পার্থ! জীব, কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া অনুভূত হইলেও, বস্তুতঃ জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্ম নাই। অতএব 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের অন্তর্গত 'ত্বং' পদের শোধনদ্বারা অগ্রে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি-বিহীন আত্ম-স্বরূপাত্মক অবধারণ করিবে। বেদবাক্য-অনুসারে সেই ত্বং পদ শোধনের তাৎপর্য্য বলিতেছি শ্রবণ কর।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিনটী দেহ এবং তদন্তর্গত অন্নময়, প্রাণ-ময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চ কোষের পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া তাহাদিগকে ভৌতিক, জড় ও নশ্বর জানিয়া পরি-ত্যাগ করিবে। যেমন কদলী বৃক্ষের বল্কল ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া তাহার অন্তর্গত ত্যাগের অযোগ্য অবশিষ্ট বস্তু (থোড়) গৃহীত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিচারদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষকে বল্কলের ন্যায় অনাত্মা বা জড়ভাবরূপ অনিত্য বস্তুসমূহক্রমে

পরিত্যাগ করিয়া অথবা 'নেতি' 'নেতি' বিচার দ্বারা* যখন আর কিছুই পরিত্যাগ যোগ্য অনুভব করিতে পারিবেনা, তখন তুমি সর্ব্ববিধ ত্যজ্য বস্তুর সাক্ষী অহং শব্দ ও প্রত্যয়ের অবলম্বনস্বরূপ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ জানিতে পারিবে। ইহাকেই ত্বং পদের শোধন বলা যায়। অগ্রে ত্বং পদের শোধন করিয়া এই প্রকারেই 'তৎ' পদের শোধন করিবে। 'তৎ' পদের শোধন-প্রণালী—মায়োপাধি, পরোক্ষত্ব, ঈশ্বরত্ব, জগৎকর্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদি লক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদ-শূন্য, মায়ার অধিষ্ঠান, অজ, অবিনাশী, পূর্ণ এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ বস্তুকে ব্রহ্ম জানিবে। ইহাকেই তৎপদের শোধন বলিয়া জানিবে।

এক্ষণে 'অসি' পদের দ্বারা শোধিত 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ অন্তঃকরণ-উপহিত, অসঙ্গ, অজ, অবিনাশী, প্রত্যগ্ চৈতন্যের সহিত শোধিত তৎপদের লক্ষ্যার্থ মায়া-উপহিত, দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদ-শূন্য, অজ, অবিনাশী ব্রহ্ম-চৈতন্যের অখণ্ডরূপে ঐক্য অবধারণ কর। যেরূপ ঘটস্থিত আকাশের সহিত বহিস্থ মহাকাশের কোনও প্রভেদ নাই, তাহা অখণ্ডরূপে এক, সেই প্রকার অন্তঃকরণ-উপহিত, প্রত্যগ-চৈতন্যরূপ প্রত্যগাত্মার সহিত মায়োপহিত ব্রহ্মচৈতন্যরূপ পরমাত্মার কিছুমাত্র ভেদ নাই, তাহাও অখণ্ডরূপে এক। ঘটোপাধি পরিত্যক্ত হইলে, যেমন ঘটাকাশই অখণ্ড মহাকাশরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ 'ত্বং' পদের

---

* মহামোহান্ধকারোদ্ধৃত শ্রীভগবান শঙ্করোক্ত "নির্ব্বাণাষ্টক" এই অনিত্য বস্তু পরিত্যাগ-বিচারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

অবিদ্যামূলক অন্তঃকরণ উপাধি ও 'তৎ' পদের মায়োপাধি এই পরস্পরবিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্ট উপাধিদ্বয় পরিত্যক্ত হইলে অন্তঃকরণ-উপহিত প্রত্যগ্ চৈতন্যই অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব এইরূপ তুমি পরস্পরবিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্ট উপাধিদ্বয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যগ ও ব্রহ্মচৈতন্যের অখণ্ডভাবে ঐক্য অবধারণ করিয়া মৌনবিলম্বন কর। যোগাদি-সিদ্ধ মহাপুরুষ এই প্রকারে প্রত্যগাত্মা ও পরমাত্মার অখণ্ডরূপ অভেদজ্ঞান লাভ করিয়া অবিচলিত চিত্তে স্বরূপাবস্থিতিপূর্ব্বক পরমানন্দ অনুভব করেন এবং প্রারব্ধবেগ নিবৃত্তিপর্য্যন্ত অর্থাৎ ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় তাহার গতির নিবৃত্তি কাল পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মভোগাত্মক শরীরে উপাধিস্থ হইয়াও ভোগকাল নিবৃত্তি পর্য্যন্ত আকাশের তুল্য উপাধির গুণধর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত ও অসঙ্গ থাকিয়া জীবন্মুক্তরূপে প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসান করেন। অজ্ঞানী ব্যক্তিই আত্মাকে দেহাদি উপাধি হইতে বিমুক্ত, নিত্যশুদ্ধ, নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ, চৈতন্যস্বরূপ ও মায়িক-সংঘাতের সহিত তাঁহার কোনও কালেও যে সম্বন্ধের গন্ধমাত্রও নাই, তাহা বুঝিতে পারে না। তত্ত্বমসি এই বাক্যের বিচারে পরমযোগী আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া ধন্য হইতে পারেন। অতএব তুমিও এইরূপ "তত্ত্বমসি" শোধনে পরিতৃপ্ত হও।

"তত্ত্বমসি" এই অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান যে পর্য্যন্ত না উপস্থিত হয়, সেই পর্য্যন্তই পুনঃ পুনঃ বিচারের দ্বারা তাহার সিদ্ধির জন্য যত্ন করিতে হইবে। যদি দেহান্ত-পর্য্যন্ত বিচার করিয়াও আত্মলাভ না হয়, তথাপি তাহা নিরর্থক হইবার নহে, কারণ, প্রতিবন্ধবশতঃ এ জীবনে লাভ না হইলেও, পর-

জীবনে নিশ্চয়ই তাহা সম্পন্ন হইবে। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন :—

বিচারয়ন্নামরণং নৈবাত্মানং লভেতচেৎ।

জন্মান্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি॥"

এই তত্ত্বমসিরূপ মহাবাক্য-বিচারে মরণ পণ করিয়া কেবল শুষ্ক শব্দালোচনায় রত থাকিলে কোনও ফলই হয় না, একথা ইতি-পূর্ব্বে নানাভাবে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীগুরুর উপদেশক্রমে বিধিপূর্ব্বক উপাসনা ও যোগাদির অনুষ্ঠানসহ স্তরে স্তরে সাধনমার্গে অগ্রসর হইলেই দর্শনসমূহের বিরোধ বিমুক্ত হইয়া সেই একমাত্র আত্মস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভব করিতে পারা যায়। বাস্তবিক ক্রিয়াবিহীন ব্রহ্মানুসন্ধানের ফলেই পাণ্ডিত্যা-ভিমানী বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপকগণের মধ্যে এই বিরোধ সৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই কারণ শ্রীসদাশিব "জ্ঞানসঙ্কলিনীতে" বলিয়াছেন :—

বেদ চতুষ্টয়াদি সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া যোগিগণই তাহার নবনীতরূপ সারবস্তু ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ বিষয়-নির্লিপ্ত-ধন অনুভব করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। এবং তাহার অবশিষ্ট তরল জলীয়-অংশপ্রধান তক্ররূপ তর্করাশি কণ্ঠস্থ করিয়া পণ্ডিতগণ বৃথা জ্ঞানাভিনয় করিয়া থাকেন।

"উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে।

নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ং॥"

সকল বিদ্যাই মুখে মুখে কথিত হইবার কারণ, সকল শাস্ত্রই একপ্রকার উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্যময় ব্রহ্মজ্ঞান-স্বরূপ তত্ত্বমসি-তত্ত্ব কখনই উচ্ছিষ্ট হইতে পারে না। অর্থাৎ ইহা বাক্যে স্বরূপে প্রকাশ হয় না।

সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদুদ্ধৃত "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের ন্যায় ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় উপনিষদুদ্ধৃত "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" বা "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" মহাবাক্যের বিষয়েও এই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম-রহস্য।

"পঞ্চদশীকার" বলিয়াছেন :—

"যেনেক্ষতে শৃনোতীদং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ।
স্বাদ্বস্বাদ্ বিজানাতি তৎ প্রজ্ঞানমুদীরিতম্॥
চতুর্মুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু।
চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মময্যপি॥"

মুমুক্ষুদিগের মোক্ষের সাধন আত্মৈকত্বজ্ঞানের সিদ্ধি নিমিত্ত মহাবাক্য চতুষ্টয়ের অর্থপ্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় উপনিষদের অন্তর্গত "প্রজ্ঞানংব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের প্রজ্ঞান-শব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন যে, চৈতন্য-জ্যোতিঃ-দ্বারা দৃশ্য-পদার্থসকল দর্শন হয়। যাঁহার দ্বারা শব্দের শ্রবণ, গন্ধের ঘ্রাণ, বাক্য কথন এবং সুস্বাদ ও বিস্বাদসকল অবগত হওয়া যায়, সেই বুদ্ধিস্থ জীবচৈতন্য প্রজ্ঞানশব্দের বাচ্য হন।

পূর্ব্বোক্তপ্রকার মহাবাক্যস্থ প্রজ্ঞান শব্দের অর্থ নিরূপণ করিয়া এক্ষণে তদ্বাক্যস্থ ব্রহ্মশব্দের তাৎপর্য্য বিবরণপূর্ব্বক তদুভয় চৈতন্যের ঐক্য প্রতিপাদন করিতেছেন যে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাতে বা মনুষ্য, অশ্ব ও গো আদি জন্তুতে অথবা সকলের মধ্যেই একমাত্র সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করেন। সুতরাং আমাতেও তিনি অবস্থিত রহিয়াছেন। অতএব একাধার-স্থিত উভয় চৈতন্য অর্থাৎ প্রজ্ঞান ও ব্রহ্ম এই উভয়েরই ঐক্য

প্রতিপাদিত হইতেছে। তাহাতে প্রজ্ঞান-চৈতন্যই ব্রহ্ম ইহা সিদ্ধ হইল।

শাস্ত্রবাক্যে কথিত আছে :—

"প্রজ্ঞানং তচ্চ গায়ন্তি বেদশাস্ত্রবিশারদাঃ।
আনন্দব্রহ্মশব্দাভ্যাং বিশেষেণ বিশেষিতম্ ॥"

বেদশাস্ত্র-বিদ্ পণ্ডিতগণ সেই বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন কূটস্থ চৈতন্যকে প্রজ্ঞান শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। আনন্দ ও ব্রহ্ম শব্দদ্বয় কেবল তাঁহার বিশেষণ মাত্র।

উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'প্রজ্ঞানংব্রহ্ম' এই মহাবাক্যের বাক্যার্থ ও পদার্থ নির্ণয়াভিপ্রায়ে প্রজ্ঞান ও ব্রহ্ম এই পদদ্বয়ের মধ্যে প্রথমতঃ প্রজ্ঞান শব্দের অর্থ সংক্ষেপতঃ নির্ণীত হইতেছে। যে অধিষ্ঠানরূপ চৈতন্যের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া সাভাস অন্তঃকরণবৃত্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা নানাবিধ রূপকে দর্শন করে, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দসমূহকে শ্রবণ করে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধসমূহকে আঘ্রাণ করে, রসনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সকল রসের আস্বাদ গ্রহণ করে ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহায়তায় শীতোষ্ণাদিসকল অনুভব করে, এইরূপ যে চৈতন্যের সত্তাকে আশ্রয় করিয়া অন্তঃকরণবৃত্তি বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শব্দ উচ্চারণ ও সকল শারীরিক কর্ম্ম সম্পাদন করে, সেই অন্তঃকরণ-উপহিত অধিষ্ঠানরূপ নির্ব্বিকার সাক্ষী 'প্রজ্ঞান' শব্দে উক্ত হয়। এই অধিষ্ঠান প্রজ্ঞান-চৈতন্য যে অসঙ্গ নির্ব্বিকার সাক্ষীস্বরূপ, তাহা "বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর" মহোদয় নিম্নলিখিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন :—

"কর্ত্তারঞ্চ ক্রিয়াস্তদ্বদ্ব্যাবৃত্ত বিষয়ানপি।
স্ফোরয়েদেকযত্নেন যোহসৌ সাক্ষ্যত্র চিদ্বপুঃ ॥

ঈক্ষে শৃণোমি জিঘ্রামি স্বাদয়ামি স্পৃশাম্যহম্ ।
ইতি ভাসয়তে সর্ব্বং নৃত্যশালাস্থদীপবৎ ॥
নৃত্যশালাস্থিতো দীপঃ প্রভুং সভ্যাংশ্চ নর্ত্তকীম্ ।
দীপয়েত্তু বিশেষেণ তদভাবেঽপি দীপ্যতে ॥
অহঙ্কারং ধিয়ং সাক্ষী বিষয়ানপি ভাসয়েৎ ।
অহঙ্কারাদ্যভাবেঽপি স্বয়ং ভাত্যেব পূর্ব্ববৎ ॥"

চিদাভাসবিশিষ্ট অহঙ্কার দেহাদিতে আত্মাভিমান বশতঃ ব্যবহারিক জীবস্বরূপ কর্ত্তা, অন্তর্বৃত্তি ও বহির্বৃত্ত্যাত্মক মনোরূপ ক্রিয়া এবং শ্রবণ, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সকলকে যিনি এককালে প্রকাশ করেন, তিনিই সাক্ষী চৈতন্য স্বরূপ আত্মা। আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, ঘ্রাণ লইতেছি, স্পর্শ অনুভব করিতেছি, সাভাস অহঙ্কার বিশিষ্ট জীবের অভিমানযুক্ত এই সমস্ত ব্যবহার, নৃত্যশালাস্থিত দীপের ন্যায় একমাত্র অধিষ্ঠান সাক্ষী-চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে ভাসিত হয়। নৃত্যশালাস্থিত দীপ যেমন গৃহস্বামীকে, সমাগত দর্শকদিগকে ও নর্ত্তক বা নর্ত্তকীকে সমভাবে প্রকাশ করে এবং তাহাদিগের অভাবেও দীপ্যমান থাকে, তেমনই এই দেহরূপ গৃহের স্বামী অহঙ্কারকে, বুদ্ধিরূপ নর্ত্তকীকে ও শব্দস্পর্শাদি বিষয়-রূপ সভ্য বা দর্শকগণকে অধিষ্ঠান সাক্ষী-চৈতন্যস্বরূপ আত্মা নির্ব্বিশেষে প্রকাশ করেন এবং সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাতে তাঁহাদের অভাবে তিনি স্বয়ম্প্রকাশভাবে প্রকাশমান থাকেন।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যদেব বলিয়াছেন :—

"রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্ তদ্দৃশ্যং দ্রষ্টৃমানসম্ ।
দৃশ্যা ধীবৃত্তয়ঃ সাক্ষী দৃগেব ন তু দৃশ্যতে ॥"

রূপবিশিষ্ট সকল পদার্থ দৃশ্য, অধিষ্ঠান সাক্ষীস্বরূপ প্রজ্ঞান-চৈতন্যের সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সাভাস অন্তঃকরণবৃত্তিযোগে দর্শনেন্দ্রিয় তাহার দ্রষ্টা হয়। যে দর্শনেন্দ্রিয় সকল রূপেরই দ্রষ্টা, প্রকৃতপক্ষে তাহাও দৃশ্য। কারণ আমি অন্ধ, আমি মন্দদৃষ্টি অথবা আমি সুদর্শন ইত্যাদি নেত্রেন্দ্রিয়ের বিকারিত্ব ভাবসমূহ একমাত্র অধিষ্ঠান সাক্ষীস্বরূপ প্রজ্ঞান চৈতন্যের সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সাভাস অন্তঃকরণবৃত্তি তাহার দ্রষ্টা হয়। যে সাভাস অন্তঃকরণ নেত্রকে অপেক্ষা করিয়া দ্রষ্টা হয়, সেও দৃশ্য। কারণ কাম-সঙ্কল্পাদি বিবিধ প্রকার বৃত্তির সহিত বিকারী সেই সাভাস অন্তঃকরণ একমাত্র অধিষ্ঠান-সাক্ষী-স্বরূপ প্রজ্ঞান-চৈতন্যের দ্বারা ভাসিত হয়। অতএব রূপাদিমান দেহ হইতে সাভাস অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই দৃশ্য, একমাত্র অধিষ্ঠান-সাক্ষীস্বরূপ প্রজ্ঞান-চৈতন্য তাহার দ্রষ্টা। তাঁহার আর অন্য দ্রষ্টা না থাকাতে তিনি কাহারই দৃশ্য নহেন। তাই বলিয়াছেন :—

"নোদেতি নাস্তমেত্যেষা ন বৃদ্ধিং যাতি ন ক্ষয়ম্।
স্বয়ং তথাবিধান্যানি ভাসয়েৎ সাধনং বিনা॥"

তাঁহার জন্ম, বিনাশ, বৃদ্ধি ও ক্ষয় নাই, তিনি অসঙ্গ ও নির্ব্বিকার-ভাবে অবস্থিত থাকিয়া বিনা যত্নে ও বিনা সাধনে সাভাস অন্তঃ-করণ হইতে দেহাদি ও বাহ্যবিষয়সমূহকে প্রকাশ করেন। যেমন্ অগ্নিসংযোগে লৌহ ও জল ইত্যাদি উত্তপ্ত হইয়া সমস্ত বস্তুকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, তেমনই আশ্রয়-সাক্ষি-স্বভাব নির্ব্বি-কার প্রজ্ঞান-চৈতন্যের আভাসে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃকরণাদি সকল পদার্থ সচেতন পদার্থের ন্যায় ব্যাপারবান্ হয়। অতএব আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি আদি সাভাস অন্তঃকরণের বৃত্তি-

যোগে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপলব্ধি এক-মাত্র অধিষ্ঠান নির্ব্বিকার সাক্ষী-চৈতন্যে অবভাসিত হয়। এই অধিষ্ঠানরূপ নির্ব্বিকার সাক্ষী-চৈতন্যই ' প্রজ্ঞান " শব্দে কথিত হয়েন।

এ স্থলে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন :—
দেবাদি উত্তম শরীরে, মনুষ্যাদি মধ্যম শরীরে, পশু পক্ষী কীটাদি অধম শরীরে, আকাশাদি পঞ্চমহাভূতে, জগৎ·উৎপত্তির অধিষ্ঠান-কারণস্বরূপ যে একমাত্র চৈতন্য প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই প্রজ্ঞান সমষ্টিরূপ ব্রহ্ম শব্দে কথিত হয়েন। এই প্রজ্ঞানই আনন্দ-রূপ। তাই শ্রুতিতে " প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম " ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রজ্ঞানরূপ চৈতন্যের আনন্দময়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দৃশ্যবস্তুসকল অনাত্মা ও জড়ভাবে নিরাস করিয়া তদবচ্ছিন্ন কূটস্থ চৈতন্যরূপ স্বীয় আত্মাকে সুসূক্ষ্মবুদ্ধিতে জানা যায়। যিনি সংবিৎ তিনিই আত্মা, তিনিই চৈতন্য, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই পূর্ব্বোক্ত ত্বং পদের ও তৎপদের লক্ষ্য। ত্বং পদের লক্ষ্য ঘটাকাশের ন্যায় কূটস্থ-চৈতন্য ও তৎপদের লক্ষ্য মহাকাশের ন্যায় ব্রহ্মচৈতন্য, এ উভয়ই এক এবং অভিন্ন ও অখণ্ডরূপ জানিয়া ব্রহ্মময় বা পূর্ণরূপ হও।

যেমন নানা আধারে একই আকাশ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তেমনি নানা উপাধিতে একই আত্মা পূর্ণ ও অদ্বয়ভাবে প্রকাশিত হয়েন। সহস্র সহস্র প্রজ্জলিত দীপে বা কাষ্ঠাদিতে যেমন একই অগ্নি, সকল ধেনুর ক্ষীর এবং ঘৃত যেমন এক প্রকার, যেমন নানা অরণি-প্রস্তরে একই অগ্নি ভেদবিবর্জ্জিত, নানা জলশয়ে একই

জল অভিন্ন, নানা বর্ণের পুষ্পে একই প্রকার মধু, সেইরূপ সকল ভাবে, সকল পদার্থে ও সকল শরীরে একই আত্মা চৈতন্যরূপ অদ্বয় পূর্ণভাবে বিরাজিত।

এইরূপ যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌স্থিত "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যের বিষয়ে শাস্ত্রে লিখিত আছে :—

অহং ব্রহ্মাস্মি-রহস্য।

"পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি।
বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে ॥
স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ।
অস্মীত্যৈক্যপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্ ॥"

'অহংব্রহ্মাস্মি' এই মহাবাক্যের অর্থ বিচারের অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ অহং শব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন :— পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা মায়াশক্তিবশতঃ এই মায়িক সংসারমধ্যে শমদমাদি সাধনদ্বারা বিদ্যাসম্পাদনযোগ্য পাঞ্চভৌতিক শরীরে অন্তঃ-করণের সাক্ষিরূপে প্রকাশমান হইয়া অবস্থিতিকরত অহং শব্দের বাচ্য হন।

উক্ত মহাবাক্যস্থিত ব্রহ্ম শব্দের তাৎপর্য্য নিরূপণপূর্ব্বক অহং-শব্দ-বাচ্য চৈতন্যের সহিত তাঁহার ঐক্য নির্ণয় করিতেছেন। স্বতঃসিদ্ধ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাই ব্রহ্মশব্দের বাচ্য হন এবং অস্মি এই শব্দদ্বারা অহংশব্দবাচ্য চৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে ? যদি অহং শব্দ-বাচ্য জীব চৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্য এই উভয়ের ঐক্য নিশ্চিত হইল, তবে জীবন্মুক্ত পুরুষের "আমিই ব্রহ্ম" এই ব্যবহার, নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইল।

এই ভাবে অথর্ব্ববেদোক্ত "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের বিষয়ে শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

অয়মাত্মা-ব্রহ্ম-রহস্য।

"স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বময়মিত্যুক্তিতো মতম্।
অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে ॥
দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগতস্তত্ত্বমীর্য্যতে।
ব্রহ্মশব্দেন তদ্‌ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্ ॥"

"অয়মাত্মাব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের অর্থ বিচার করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ অয়ং ও আত্মা এই উভয় শব্দের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন :—স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ অপরোক্ষ জীবচৈতন্য অয়ং শব্দের বাচ্য হন এবং অহঙ্কারাদি দেহপর্য্যন্ত সমুদায়ের অভ্যন্তরে বর্ত্তমানতা প্রযুক্ত তিনিই আত্মশব্দে কথিত হন। অতএব উক্ত উভয় শব্দেই জীবচৈতন্য উক্ত হইল।

উক্ত বাক্যস্থ ব্রহ্মশব্দের অর্থাবিষ্করণপূর্ব্বক জীব ও পরব্রহ্মের ঐক্য নির্ণয় করিতেছেন—এই সমুদায় দৃশ্যমান জগতের মূলাধার এক কারণস্বরূপ পরব্রহ্ম চৈতন্য ব্রহ্মশব্দে উক্ত হন। তিনিই স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, অতএব পূর্ব্বোক্ত জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের স্বরূপের অভিন্নতা হেতু ঐক্য প্রতিপাদিত হইল।

এই চতুর্ব্বেদান্তর্গত মহাবাক্যচতুষ্টয়ের ন্যায় বেদসম্মত অন্যান্য শাস্ত্র ও সম্প্রদায়নির্দ্দিষ্ট সকল মহাবাক্যই সেই এক মাত্র অদ্বয় পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই প্রতিবিম্বরূপ, ঘটস্থ বা কূটস্থ-চৈতন্য-রূপের সমন্বয়ে তত্ত্বমসি-বিচার-সাধনায় তন্ময় হইয়া অদ্বিতীয় মুক্তির উপায় নির্ণয় করিয়াছেন।

শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"শ্রুতিসিদ্ধান্তসারোঽয়ং তথৈব ত্বং স্বয়া ধিয়া।
সংবিচার্য্য নিদিধ্যাস্য নিজানন্দাত্মকং পরং॥
সাক্ষাৎ কৃত্বা পরিচ্ছিন্নাদ্বৈত ব্রহ্মাক্ষরং স্বয়ং।
জীবন্নেব বিনির্মুক্তো বিশ্রান্তঃ শান্তিমাশ্রয়॥"

ইহাই বেদাগমে সিদ্ধান্তবাক্য জানিবে। অতএব তুমি স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা বিচার ও নিদিধ্যাসন পূর্ব্বক অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বৈত, অক্ষর, পরম নিজানন্দ স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া জীবন্মুক্ত বিশ্রান্ত ও শান্তি-প্রাপ্ত হও।

প্রণব রহস্য।

"প্রণবাদ্যাস্ত্রয়ো বেদাঃ প্রণবে পর্য্যবস্থিতাঃ।
তস্মাৎ প্রণব-মেবৈকং পরমহংসঃ সদা জপেৎ॥"

বেদত্রয় বা বেদসমূহ প্রণবমূলক, এজন্য পরমহংস সন্ন্যাসী ও সর্ব্বদা প্রণবমন্ত্র 'ওঁ' কার জপ করিবেন। এ স্থলে বেদচতুষ্টয় না বলিয়া বেদত্রয় বলিবার কারণ সাম, ঋক্ ও যজুঃ মূল বেদ, অথর্ব্ব-বেদ এই তিনের সমাহারজাত।

শব্দব্রহ্মস্বরূপ বেদপ্রসূ মন্ত্রযোনি প্রণবের রহস্য অধুনা অনেকেই অবগত নহেন; সেই কারণ এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশদ-ভাবেই আলোচনা করা যাইতেছে। আশাকরি মুমুক্ষু পাঠক

বিশেষ মনোযোগ সহকারে এই অংশ পাঠপূর্ব্বক প্রণবরহস্য চিন্তা করিবেন। মহাপূর্ণ পরমহংসদেব হইতে সন্থ উপনয়ন সংস্কৃত নবীন ব্রহ্মচারী পর্য্যন্ত প্রত্যেকের এই পরম পবিত্র প্রণবরহস্য চিন্তা করা আবশুক।

পরম পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী শ্রীমন্মহর্ষিবৃন্দ বৈদিক ও তান্ত্রিকাদি সমস্ত অধ্যাত্মতত্ত্বেরই ত্রিবিধ অর্থবোধের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। যথা আধিভৌতিক বা লৌকিক অর্থ, আধিদৈবিক অর্থাৎ পরকীয় বা পৌরাণিক অর্থ এবং আধ্যাত্মিক বা আত্ম-বিজ্ঞান-বিষয়ক অর্থ। এই ত্রিবিধভাবেই সুপবিত্র প্রণব-শব্দের বিশ্লেষণদ্বারা শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, এ স্থলে তাহারই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি।

যোগিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্কদেব প্রণবের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে বলিয়াছেন:—"বেদের আদি অক্ষররূপী প্রণব সাক্ষাৎ ব্রহ্মেরই-রূপ। যাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবরূপী ত্রিগুণাত্মক দেবতাত্রয় অধিষ্ঠিত আছেন, সেই ত্রিদেবাত্মক বেদ অতি গুহ্য ও দুরবগাহ গভীর বিষয়। ইহলোকে যিনি প্রণবরহস্য অবগত হইতে পারেন, তিনি সর্ব্ববেত্তা মহাপুরুষ বলিয়া সকলেরই পূজ্য হইতে পারেন। সকল-প্রকার যোগসাধনের সারধন প্রণবের রহস্যবোধ ব্যতীত কেবল বেদ-পাঠাভ্যাসী ব্রাহ্মণদিগকে বলিবর্দ্দ ও গর্দ্দভের সহিত তিনি তুলনা করিয়াছেন। দেবদুর্লভ অমৃত পানে পরিতৃপ্ত হইলে যেমন কেহ আর সামান্য জলপানের আশা করে না, সেইরূপ প্রণব-রহস্যজ্ঞের আর কোনও জ্ঞানেরই প্রয়োজন হয় না। এক প্রণব জ্ঞানের দ্বারা সকল জ্ঞানই তখন তাঁহার করতলগত হইয়া যায়। এই অদ্ভুত প্রণবে রবিশ্লেষণগত অর্থ-সম্বন্ধে শ্রীসদাশিব

"মহানির্ব্বাণে" বলিয়াছেন :—

"অকারেণ জগৎপাতা সংহর্ত্তা স্যাদুকারতঃ।
মকারেণ জগৎস্রষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ॥"

অ+উ+ম এই তিন অক্ষরের সমাহারে ওঁকার রূপ প্রণবমন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে। অকারের অর্থ জগৎপাতা, উকারের অর্থ জগতের সংহারকর্ত্তা এবং মকারের অর্থ জগতের সৃজন-কর্ত্তা; এইরূপ প্রণবের অর্থ কথিত হইয়াছে। তন্ত্রান্তরে শ্রীভগবান ইহারই পুনরুল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :—

"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্টঃউকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারেনোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ॥"

অর্থাৎ অ, উ ও ম এই অক্ষরত্রয়ের সমাবেশে যে বিচিত্র ত্র্যক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রথম অক্ষর অকার বিষ্ণুর উদ্দেশে, উকার মহেশ্বরের এবং মকার ব্রহ্মার বাচকরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই হেতু এই তিন অক্ষরময় ওঁকার প্রণব সাক্ষাৎ পরমাত্মা ব্রহ্মের বাচক বলিয়া বেদ ও তন্ত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রে একবাক্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে, বিশেষ "শ্রুতিতে" অকার-ব্রহ্মা, উকার-বিষ্ণু ও মকার-মহেশ্বরের নামে প্রয়োগ হইয়াছে। ইহারই যেন প্রতিধ্বনিতে শ্রীভগবান "গীতাসারে" বর্ণ-বিভেদে বলিয়াছেন :—

"অকারো রক্তবর্ণঃ স্যাদুকারঃ কৃষ্ণ উচ্যতে।
মকারঃ শুক্লবর্ণাভ স্ত্রিবর্ণঃ সিদ্ধিরুচ্যতে॥"

অকার রক্তবর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্মা; উকার কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ বিষ্ণু এবং মকার শুক্লবর্ণাভ অর্থাৎ মহেশ্বর। আবার গুণ বিভেদ হইতে

অকারাদি বর্ণত্রয়ের উৎপত্তি বিষয়ে বলিয়াছেন :—

"অকারঃ পীতবর্ণশ্চ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
উকারঃ সাত্ত্বিকঃ শুক্লো মকারঃ কৃষ্ণতামসঃ॥

অকার পীতবর্ণ রজোগুণাত্মক প্রথমা শক্তি হইতে, উকার শুক্লবর্ণ সত্ত্বগুণাত্মক দ্বিতীয়া শক্তি হইতে এবং মকার কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণাত্মক তৃতীয়া শক্তি হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছে।

"অকারেতু উকারেতু মকারেতু ধনঞ্জয়ঃ।
ইদমেকং সুনিস্পন্নং ওমিতি জ্যোতিরূপকম্॥"

হে ধনঞ্জয়, অকার, উকার ও মকার এই ত্রিবর্ণের ঐক্য হইয়া জ্যোতির্বিশিষ্ট ওঁ এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

'মনু' বলিয়াছেন :—

"অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চমকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূর্ভুবঃস্বরিতীতি চ॥"

বেদবক্তা ব্রহ্মা ঋগ্বেদ হইতে অকার, যজুর্ব্বেদ হইতে উকার এবং সামবেদ হইতে মকার যথাক্রমে দোহন করিয়া অর্থাৎ উক্ত বেদত্রয়ের সারস্বরূপ বাহির করিয়া ওঁকার প্রকাশ করিয়াছেন। এই কারণ সন্ধ্যারহস্যে পূর্ব্ব বা প্রাতঃ সন্ধ্যায় ব্রাহ্মী বা গায়ত্রীহস্তে ঋগ্বেদ, মধ্য বা মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় বৈষ্ণবী বা সাবিত্রীহস্তে যজুর্ব্বেদ এবং শেষ বা সায়ং সন্ধ্যায় রুদ্রাণী বা সরস্বতী হস্তে সামবেদ বর্ণিত আছে। আবার এই ত্রিবর্ণাত্মক প্রণবের এক এক বর্ণের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাহা লয় বা অন্তর্হিত হইয়া যায় সে সম্বন্ধে গীতাসারে শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"পৃথিব্যামগ্নি ঋগ্‌বেদো ভূরিত্যেব পিতামহঃ।
অকারে তু লয়ং প্রাপ্তে প্রথমে প্রণবাংশকে॥

অন্তরীক্ষং যজুর্বায়ুর্দ্বৈবো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
উকারে তু লয়ং প্রাপ্তে দ্বিতীয়ে প্রণবাংশকে॥
দিবি সূর্য্যঃ সামবেদঃ হরিস্ত্রৈব মহেশ্বরঃ।
মকারেতু লয়ং প্রাপ্তে তৃতীয়ে প্রণবাংশকে॥"

প্রণবের প্রথমাংশ অকার লয়প্রাপ্ত হইলে পৃথিবীতে বা সাধকের স্থূলদেহে অন্নময়-কোষযুক্ত মূলাধারাদি প্রথম ত্রিচক্র সহিত নিম্নখণ্ডে অগ্নি, ঋগ্বেদ, ভূতত্ত্ব ও পিতামহ বা প্রথম শিবরূপ ব্রহ্মা বা ব্রহ্মগ্রন্থি এই কয়েকটী লয় পাইয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রণবাংশের অর্থাৎ উকারের লয় হইলে অন্তরীক্ষ বা সাধকের সূক্ষ্মদেহে প্রাণময়-কোষযুক্ত অনাহত-চক্র সহিত মধ্য খণ্ডে যজুর্ব্বেদ, বায়ু দ্বিতীয় শিবরূপ সনাতন বিষ্ণু বা বিষ্ণুগ্রন্থিসহ এই গুলি লয় পাইয়া থাকেন, এবং তৃতীয় প্রণবাংশ মকার লয় প্রাপ্ত হইলে আকাশে বা সাধকের কারণ-দেহে মনোময়াদি কোষযুক্ত আজ্ঞা ও গুপ্ত চক্রাদি সহিত উর্দ্ধ খণ্ডে সূর্য্য, সামবেদ, স্বর্গ ও তৃতীয় শিবরূপ মহেশ্বর বা রুদ্রগ্রন্থি সহ সমুদায় লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মহর্ষি ব্যাসদেব "মৎস্যপুরাণে" বলিয়াছেন :—

"গুণেভ্যঃ ক্ষোভমানেভ্য স্ত্রয়ো দেবা বিজজ্ঞিরে।
একামূর্ত্তি স্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাময়ী ব্রহ্মশক্তি বা মূলপ্রকৃতিতে গুণক্ষোভ হইয়াই সেই একমাত্র ব্রহ্মমূর্ত্তি ত্রিধাভাবে পরিণত হইয়াছেন। সেই ত্রিমূর্ত্তিই গুণত্রয়ের এক একটীর প্রাধান্য ভেদে যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর হইয়াছেন।

মোটের উপর উক্ত তিনটী অক্ষরই তিন গুণের মধ্যে এক এক গুণ প্রধান ত্রিমূর্ত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বাচক

বিন্দুরূপে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিশ্বসংসার ত্রিগুণেরই বৈষম্যময় বিকাশমাত্র। ইহাতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপ ক্রিয়াত্রয় শ্রীভগবানেরই তিনগুণ হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই কারণেই সগুণ ব্রহ্মরূপ পরমাত্মাকে পরমেশ্বররূপে চিন্তা করিতে হয়। জীবের উপাস্য-উপাসক-ভাব শ্রীভগবানের এই ত্রিগুণাত্মক সগুণ ঈশ্বররূপ অর্থাৎ তটস্থরূপের সঙ্গেই সম্ভবপর; স্বরূপ-ব্রহ্ম উপাস্য-উপাসক-ভাবরহিত। সনাতন ধর্ম্মের সারধন উন্নত সাধন-বিজ্ঞানে উপাসনার সময় ব্রহ্মের সগুণ ভাবেরই অবলম্বন অলঙ্ঘ্যনীয় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। যাহাহউক উক্ত তিন গুণের প্রাধান্য অনুসারে উহার আবার তিনটী আধার আছে। অর্থাৎ রজোগুণের প্রাধান্য-সত্তার দ্বারা ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া সৃজন, সত্বগুণের প্রাধান্য-সত্তার দ্বারা বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া পালন, তমোগুণের প্রাধান্য-সত্তার দ্বারা শিবরূপ ধারণ করিয়া এই বিশ্বের লয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে সেই এক অদ্বিতীয় নির্ব্বিকার জগদীশ্বর পরমাত্মা তুরীয় ভাবে আদি অর্দ্ধনারীশ্বরের আভাসে স্বশক্তিস্বরূপিণী ইচ্ছা-ক্রিয়া-জ্ঞানময়ী মহামায়ার দ্বারা তিন স্বতন্ত্রভাব ধারণ করিয়া এই কার্য্য-সগুণ-ব্রহ্মরূপে বিরাট্ স্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। সুতরাং আদ্যাশক্তিযুক্ত চৈতন্যময় ব্রহ্মই প্রণবের অভিধেয়। পরন্তু ওঁকার শব্দে অপর ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম ইহা অবগত হইয়া যিনি যে উপাসনাদ্বারা যে ফল ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইতে পারেন। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন ঃ—

"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥"

এই প্রণব সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"ত্রিস্থানঞ্চ ত্রিমাত্রঞ্চ ত্রিব্রহ্ম ত্রিতয়াক্ষরম্ ।
ত্রিমাত্রঞ্চার্দ্ধমাত্রঞ্চ যো বেত্তি স তু বেদবিদ্ ॥"

যে ব্যক্তি ত্রিস্থান, ত্রিমাত্রবিশিষ্ট, তিন অক্ষর যুক্ত, ত্রিমাত্রসহ অর্দ্ধমাত্র বিশিষ্ট ওঁকারের স্বরূপ অবগত আছেন তিনিই বেদবেত্তা। ওঁকারের সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণে শ্রীভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন :—

"সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্ ।
ওঁকারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥"

যিনি সপ্তমাঙ্গ, চতুষ্পাদ, ত্রিস্থানবিশিষ্ট এবং পঞ্চদেবতাস্বরূপ প্রণবরহস্য অবগত নহেন, তিনি কেমন করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন? অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্মণপদ-বাচ্য হইতে হইলে প্রণবতত্ত্ব অবশ্য পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।

শাস্ত্রে উপদেশ আছে "ব্রহ্মং জানাতি ব্রাহ্মণঃ" সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রাহ্মণকুমার হইলেও কেহ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। সেই ব্রহ্মের স্বরূপ অবশ্যই জানা কর্ত্তব্য।

এই প্রণব প্রথমতঃ সপ্ত অঙ্গ বিশিষ্ট। যথা :—(১) 'অ'কার, (২) 'উ'কার, (৩) 'ম'কার, (৪) 'ঁ' নাদ, (৫) '০' বিন্দু, (৬) কলা এবং (৭) কলাতীত, এই সাত অঙ্গ।

দ্বিতীয়তঃ ইহা চতুষ্পাদ বিশিষ্ট। যথা :—(১) স্থূল, (২) সূক্ষ্ম, (৩) বীজ ও (৪) সাক্ষী, প্রণবের এই চারিপাদ।

তৃতীয়তঃ ইহা ত্রিস্থানযুক্ত। যথা :—(১) জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন ও (৩) সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়যুক্ত, প্রণবের এই ত্রিস্থান।

চতুর্থতঃ ইহা পঞ্চদৈবত। যথা :—(১) ব্রহ্মা, (২) বিষ্ণু,

(৩) রুদ্র, (৪) ঈশ্বর, ও (৫) মহেশ্বর রূপ, প্রণব সগুণ ব্রহ্মরূপে এই পঞ্চদেবতার স্বরূপ।

প্রণবের অধিকতম সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে শাস্ত্র বলিয়াছেন, প্রণব বিশেষ ভাবে তিন প্রকার। যথা:—১ম। অপরপ্রণব, ২য়। পরপ্রণব এবং ৩য়। মহাপ্রণব।

অপর, পর ও মহাপ্রণব ভেদ।

১ম। এই অপর প্রণব আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে যে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাহাহউক এই অপর-প্রণবই সাক্ষাৎ শব্দ-ব্রহ্মস্বরূপ। পূর্ব্বকথিত সপ্ত অঙ্গের মধ্যে 'অ, উ, ম,' রূপ প্রধান স্থূল অঙ্গত্রয় যেন বিশ্লেষণ-সিদ্ধ মূল বা অমিশ্র বস্তু। 'নাদ, বিন্দু ও কলা' ইহা ত্রিগুণের আদি সংযোগ-বিশেষ দ্বারা সমষ্টিভূত নিগুর্ণ ভাবাত্মকরূপে প্রথমেই উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব এই তিনকেই মিশ্র-বস্তু বলিতে পারা যায় এবং 'কলাতীত' স্বয়ং চৈতন্য নিগুর্ণ ও নির্লিপ্ত হইয়াও ভাব বা গুণযোগে উক্ত মিশ্র বস্তুর মধ্যেই মিশ্রাতীত কোন অনির্ব্বচনীয় সত্তায় পরিগণিত হইয়াছেন।

প্রথমোক্ত অমিশ্র তিন অঙ্গের অন্তরের মধ্যেই সূক্ষ্মানুসন্ধানে প্রণবের সূক্ষ্মতম চতুর্থ অঙ্গ (৺) "নাদ" অনুভূত হয়। এতদ্ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত অমিশ্র তিন অঙ্গের বা তিন গুণের সংযোগ-বিশেষের দ্বারা উৎপন্ন তিন শক্তি, যথা বামা, জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী এই শক্তি-ত্রয়ের সমাহারভূত যে আদিবস্তু তাহারই নাম নাদ। ইহাঁদের মধ্যে সাত্ত্বিক শক্তিকে বামা, রাজসিক শক্তিকে জ্যেষ্ঠা এবং তামসিক শক্তিকে রৌদ্রী বলা হইয়াছে।

প্রণবের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতরবস্তু পঞ্চম অঙ্গ (৹) "বিন্দু"। ইহাও

সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণ-ভেদে তিন প্রকার। এই সূক্ষ্ম বিষয় ইতি-পূর্ব্বে সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইয়াছে, পাঠক তাহা পুনরায় মনোযোগ সহকারে অবশ্য দেখিয়া লইবেন।

প্রণবের সূক্ষ্মতম ষষ্ঠ অঙ্গ "কলা" বা অঙ্কুর। ইহার তাৎপর্য্য ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির সমাহারস্বরূপ। চণকাকাররূপিণী ব্রহ্মবস্তু, যখন স্বীয় মায়ারূপ বল্কল পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং বিকশিত হন, তখন তাহার অন্তর্গত দুইটীদল যথাক্রমে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অথবা পুরুষ ও প্রকৃতির যোগে সেই চণকসদৃশ অলৌকিক রূপের অন্তরে প্রথমে যে অঙ্কুরের বা 'ওঁ'কুরের আভাসে আনন্দেচ্ছার উদ্ভব হয়, তাহা-কেই 'কলা' বলে। এই কলা হইতে উৎপন্ন মহেশ্বররূপ পূর্ব্বোক্ত তামসিক বিন্দু হইতে শব্দাদি পঞ্চ-তন্মাত্র এবং আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত; এই প্রকার ঐ কলা হইতেই সমুৎপন্ন ব্রহ্মরূপ রাজসিক বিন্দু হইতে শব্দাদি পঞ্চশক্তি ও বাগাদি পাঞ্চভৌতিক পঞ্চ কর্ম্মে-ন্দ্রিয়; এই ভাবেই ঐ কলাজাত বিষ্ণুরূপ সাত্ত্বিক বিন্দু হইতে শব্দাদি পঞ্চ জ্ঞান ও শ্রবণাদি পাঞ্চভৌতিক পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনসাদি চারি ভাগে বা শাস্ত্রান্তরে নির্দ্দিষ্ট পাঁচভাগে বিভক্ত অন্তঃ-করণ উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রণবের শেষ বা সূক্ষ্মতমাতীত বস্তু সপ্তম অঙ্গ 'কলাতীত।' পূর্ব্ব বর্ণিত ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির সমাহারভূত এক অদ্বিতীয় অনাদি ও অনন্তবস্তু। ইহা পূর্ব্বালোচিত ছয় অঙ্গের মধ্যেই স্বতঃ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। ইহাই উক্ত প্রণবের সপ্তম অঙ্গস্বরূপ পরব্রহ্ম বা সর্ব্বাত্মক চৈতন্য। প্রণবের পূর্ব্বোক্ত সপ্তাঙ্গের ইহাই তাৎপর্য্য।

স্থূল সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষীরূপ, "প্রণবের-পাদ-চতুষ্টয়ের" তাৎ-

পর্য্যার্থ শাস্ত্রে উক্ত আছে :—১ম, যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহাই "স্থূল"; ২য়, যাহা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহাই "সূক্ষ্ম"; ৩য়, গুণমাত্রে স্থিত হইলে, বীজ এবং ৪র্থ, নির্গুণ অবস্থাপন্নকে "সাক্ষী" বলে। এই চারিটী অবস্থাকেই প্রণবের "চতুষ্পাদ" বলে।

"ত্রিস্থান" শব্দের তাৎপর্য্যার্থে উক্ত হইয়াছে যে,—বিশ্ব অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং বিরাট্ অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টিশব্দ ব্রহ্মরূপ প্রণবের প্রথম স্থান; হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং তৈজস্ অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি শব্দব্রহ্মরূপ ব্রহ্মের দ্বিতীয় স্থান; অব্যাকৃত অর্থাৎ সুষুপ্ত্যবস্থায় অনুভূয়মান অজ্ঞানাধিকৃত আনন্দ ও প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সুষুপ্ত্যবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি ব্রহ্মরূপ অপরপ্রণবের তৃতীয় স্থান। সুতরাং সৃষ্টির সমষ্টি ও ব্যষ্টিভূত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির এই তিন অবস্থাই প্রণবের "ত্রিস্থান" বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"পঞ্চদৈবত" শব্দের তাৎপর্য্য—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর এই পঞ্চদেবতাই শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবের স্বরূপ।

"সারদাতিলেক" শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"অথ বিন্দ্বাত্মনঃ শম্ভোঃ কালবন্ধোঃ কলাত্মনঃ।
বভূব চ জগৎসাক্ষী সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বরঃ॥
মহেশ্বরাদ্ভবেদীশ স্ততো রুদ্রস্য সম্ভবঃ।
ততো বিষ্ণুস্ততো ব্রহ্মা তেষামেব সমুদ্ভবঃ॥"

অতঃপর অনাদি ও অনন্তকালের সাহচর্য্যে শক্তিসহিত একীভূত বিন্দুরূপ পরশিব বা ব্রহ্ম হইতে জগতের সাক্ষীস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে সেই মহেশ্বর হইতে ঈশ্বর,

ঈশ্বর হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে বিষ্ণু এবং বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। এই পঞ্চদেবতাই আবার পঞ্চশিব বলিয়া যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। "গুরুপ্রদীপে" ষট্‌চক্র-নিরূপণ-অংশে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্‌শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব বা মহেশ্বর এই পঞ্চশিব এবং ইহার উপরিস্থিত পরশিবকে লইয়া ষট্‌শিব আখ্যায় কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই ছয় শিব যোগবিজ্ঞানোক্ত মূলাধার হইতে আজ্ঞা-চক্র পর্য্যন্ত ষট্‌চক্রের মধ্যে অবস্থিত আছেন এবং ষট্‌চক্রের অতীত সহস্রার চক্রে পরমশিব নামে সপ্তম শিব সতত অবস্থিত আছেন।

জীব-সমষ্টিরূপ শব্দ-ব্রহ্ম প্রণবের "বিরাট" মূর্ত্তিতেও এই ব্যষ্টি-রূপ জীব-শরীরের অনুরূপ বিরাট ষট্‌চক্র বিরাজিত রহিয়াছে। তাহার মূলাধারে ব্রহ্মা ও পৃথ্বীতত্ত্ব, স্বাধিষ্ঠানে বিষ্ণু ও জলতত্ত্ব, মণিপুরে রুদ্র ও তেজস্তত্ত্ব, অনাহতে ঈশ্বর ও বায়ুতত্ত্ব, বিশুদ্ধচক্রে মহেশ্বর ও আকাশতত্ত্ব এবং আজ্ঞাচক্রে বিন্দুরূপ পরশিব ও আত্ম-তত্ত্ব, তৎপরে সহস্রারে পুরুষ-প্রকৃতির বা আত্ম-পরমাত্মার একী-ভূত পরমশিব বা পরমব্রহ্মতত্ত্ব বিরাজিত রহিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, উক্ত সপ্তচক্রস্থিত সপ্ততত্ত্বেরই সপ্ত বিরাটমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছেন। এবং সকলেরই মূল বিরাট-সহস্রারস্থিত প্রকৃতি ও চৈতন্যের একীভূত সূক্ষ্মতমাতীত-অবস্থা হইতে প্রথমে বিন্দু ও তদাত্মক পরশিবের বিরাট-মূর্ত্তি, তাহা হইতে সূক্ষ্মতম আকাশাত্মক মহেশ্বরের বিরাটমূর্ত্তি, ক্রমে তাহা হইতে তেজসাত্মক

রুদ্রের বিরাট্-মূর্ত্তি, আবার রুদ্র হইতে জলাত্মক বিষ্ণুর বিরাট-মূর্ত্তি, পরিশেষে সেই বিষ্ণু হইতে পৃথ্ব্যাত্মক ব্রহ্মার বিরাট-মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। এই শেষোক্ত রহস্যই পুরাণে পৌরাণিক ভাষায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, নীল-নীরদসদৃশ বিষ্ণুর বিরাট্-দেহস্থিত নাভিকমল হইতে বিরাট-ব্রহ্মার সূক্ষ্মতম সৃষ্টি হইয়াছে। এই পরিদৃশ্যমান জগতই সেই ব্রহ্মার স্থূল পরিণতি পৃথ্বীতত্ত্ব।

এতদ্ব্যতীত পঞ্চদেবতার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রযোগের 'পঞ্চাঙ্গ-সেবন' অংশে ব্রহ্মের নিগুর্ণ সত্তা ব্যতীত তাঁহার সগুণ বা সাকার সত্তামূলক সূর্য্যাদি পঞ্চ উপাস্য দেবতার বিষয় বলা হইয়াছে। পাঠকের তাহা অবশ্যই স্মরণ আছে। শ্রীসদাশিব 'ভৈরব যামলেও' সেই কথা বলিয়াছেন :—

" একং ব্রহ্ম নিরাকারং সাকারত্বমুপাগমৎ।
ধ্যানার্থং স্বাত্ম-ভক্তানাং সৃষ্ট্যাদৌ পঞ্চমূর্ত্তিভিঃ ॥
সূর্য্যো গণপতির্বিষ্ণুর্মহেশো ভগবত্যপি।
পঞ্চৈতা দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রুতিভি র্ব্রহ্মমূর্ত্তয়ঃ ॥
এতৈ র্বিমুচ্যতে জন্তু র্জন্মসংসারবন্ধনাৎ।
পঞ্চদেবৈ র্বিনা মুক্তি র্ন ভবেদন্যদেবতৈঃ ॥"

একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্ম সাধকের ধ্যান সৌকার্য্যার্থেই সাকার পঞ্চমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া থাকেন। (১) সূর্য্য, (২) গণপতি, (৩) বিষ্ণু, (৪) মহেশ ও (৫) ভগবতী, এই পঞ্চ দেবতা। শ্রুতি বা বেদেও এই পঞ্চমূর্ত্তির উল্লেখ আছে। জীব এই পঞ্চ সগুণ ব্রহ্ম-মূর্ত্তির উপাসনাদ্বারাই ক্রমে নিগুর্ণ ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়া কালে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই পঞ্চদেবতা

ব্যতীত অন্য কোনও দেবতা বা উপদেবতা সিদ্ধি প্রদান করিতে সমর্থ হইলেও মুক্তিদান করিতে পারেন না।

যাহা হউক অপরপ্রণবরূপ শব্দব্রহ্ম হইতেই সমস্ত দেবতা, সকল স্বর, সচরাচর ত্রৈলোক্যের সকল পদার্থই উৎপন্ন হইয়াছে। এই কথাই শ্রীভগবান্ "গীতাসারে" খুলিয়া বলিয়াছেন।

"ওঁকারপ্রভবা দেবাঃ ওঁকারপ্রভবা স্বরাঃ।
ওঁকারপ্রভবং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥"

আবার ওঁকারের মধ্যেই তাঁহার বিরাট-স্বরূপ চতুর্দ্দশ ভুবন সম্বন্ধেও বলিয়াছেন :—

"পাদয়োস্তু তলং বিদ্যাত্তদূর্দ্ধং বিতলং তথা।
সুতলং জঙ্ঘদেশে তু গুল্‌ফদেশে রসাতলম্॥
তলাতলঞ্চোরুদেশে গুহ্যদেশে মহাতলম্।
পাতালং সিদ্ধিদেশে তু সপ্তমং পরিকীর্ত্তিতম্॥
ভূর্লোকং নাভিদেশস্থঃ ভুবর্লোকঞ্চ কুক্ষিগম্।
হৃদিস্থং স্বর্গলোকঞ্চ মহর্লোকঞ্চ বক্ষসি॥
জনলোকঞ্চ কণ্ঠস্থং তপোলোকং মুখে স্থিতম্।
সত্যলোকঞ্চ মূর্দ্ধ্নিস্থং ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥"

অর্থাৎ ওঁকারের পাদমূলে তল অবস্থিত, তদূর্দ্ধে বিতল, জঙ্ঘাদেশে সুতল, গুল্‌ফে রসাতল, উরুদেশে তলাতল, গুহ্যদেশে মহাতল, সন্ধিদেশে পাতাল, নাভিদেশে ভূর্লোক, কুক্ষিতে ভুবর্লোক, হৃদয়ে, স্বর্লোক, বক্ষে মহর্লোক, কণ্ঠে জনলোক, মুখে তপোলোক এবং মস্তকে সত্যলোক, এইরূপে চতুর্দ্দশ ভুবন বিরাজমান রহিয়াছে।

শ্রীসদাশিব "সারদাতিলকে" এই শব্দ-ব্রহ্মের সম্বন্ধে আরও

সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন :—

"ভিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দো রব্যক্তাত্মাপরোঽভবৎ।
শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ॥
শব্দব্রহ্মেতি শব্দার্থং শব্দমিত্যপরে জগুঃ।
ন হি তেষাং তয়োঃ সিদ্ধি জড়ত্বাদুভয়োরপি।
চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতিঃ॥"

পরম-বিন্দু ভিদ্যমান হইয়া অব্যক্তস্বরূপ অপর প্রণব উৎপন্ন হইলেন। তন্ত্র-বিশারদ মহাত্মগণ ইহাকেই শব্দব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শব্দস্ফোট-বাদীরা শব্দকে এবং অর্থস্ফোট-বাদীরা শব্দার্থকে শব্দব্রহ্ম বলেন, কিন্তু তদ্বারা তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, কারণ শব্দ ও শব্দার্থ উভয়ই জড়পদার্থ। অতএব যিনি সর্ব্বভূতের চৈতন্য তিনিই শব্দব্রহ্ম। অর্থাৎ শব্দ ও শব্দের-অর্থ যাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, তিনিই শব্দব্রহ্ম। শব্দ ও শব্দার্থ শব্দব্রহ্মের বিরাট-মূর্ত্তির অন্তর্গত। সুতরাং শব্দকে ও শব্দার্থকে শব্দব্রহ্ম বলাতে গৌণভাবে তাদৃশ দোষ বলা যায় না। কারণ অর্থ ও চৈতন্য-সমবেত শব্দ এবং শব্দ ও চৈতন্য-সমবেত অর্থ অবশ্যই সে ভাবে শব্দব্রহ্ম হইতে পারে। এ সম্বন্ধে পরে আরও বিচার করিব। এক্ষণে এই অপরপ্রণব, পরপ্রণব ও মহাপ্রণবের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক।

২য়। ব্রহ্ম যখন অনুপহিত ও নিষ্ক্রিয় থাকেন, তখন তিনি পরমব্রহ্ম, তদাত্মক প্রণবকে তখন "পরপ্রণব" বলা যায়। অনুপহিত চৈতন্য তখন পূর্ব্ববর্ণিত "অপরপ্রণবের" সকল অঙ্গই লয়প্রাপ্ত হইয়া আছে; সুতরাং তখন তিনি নিশ্চয়ই বাক্য ও

মনেরও অগোচর। সে অবস্থায় তিনি পরব্রহ্মস্বরূপ এবং তদাত্মক "পরপ্রণব" বলিয়া জীবন্মুক্তযোগযুক্ত বা স্বরূপাবিস্থাপন্ন মহাপুরুষের অনুভবনীয়। আর ব্রহ্ম যখন প্রকৃতিতে উপহিত অথবা প্রকৃতি-স্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করিতে থাকেন, তখন প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অবধি এই স্থূল জগৎ পর্য্যন্ত সমুদায়ই সগুণ ব্রহ্ম এবং তদাত্মক প্রণবকে তখনই "অপর-প্রণব" বা শব্দব্রহ্ম বলা হয়।

৩য়। এই পরব্রহ্মাত্মক "পরপ্রণব" অর্থাৎ অনুপহিত-চৈতন্য এবং শব্দব্রহ্মাত্মক "অপরপ্রণব" অর্থাৎ উপহিত-চৈতন্য এতদুভয়ের সমষ্টি "মহাপ্রণব" বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

মহাপ্রণবের সপ্তমাঙ্গ-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, শিবের সপ্তাম্নাই মহাপ্রণবের সপ্তাঙ্গ। "ব্রহ্মানন্দদেব ও মঠাম্নায়" শীর্ষক অংশের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে ব্যক্তাম্নায়-চতুষ্টয় ও অব্যক্ত-আম্নায়-ত্রয়ের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিচয়ে তাহা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। পাঠক সেই অংশ পুনরায় পাঠ করিলেই এতদ্বিষয়ের মর্ম্ম সহজে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীসদাশিব স্থানান্তরে মহাপ্রণবকেই মূল বিরাট-শিব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সপ্তমুখই সপ্তাম্নায়, তন্মধ্যে দুইমুখ গুপ্ত ও পঞ্চমুখ ব্যক্ত বা প্রকাশিত। এই কারণেই শিব সাধারণতঃ পঞ্চবক্ত্র বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হন। ওঁকাররূপ মহাপ্রণবেরও পাঁচ-অঙ্গ অর্থাৎ অ+উ+ম+ঁ (নাদ)+• (বিন্দু), এই পাঁচ অঙ্গ মিলিয়া ওঁ রূপে ব্যক্ত আছেন। কলা ও কলাতীত নামক অবশিষ্ট অঙ্গদ্বয় অব্যক্তভাবে রহিয়াছে। মহাপ্রণব বা সপ্ত-আম্নায়-বিশিষ্ট শিবের সপ্তমুখের নাম "মন্ত্রযোগ" ও "আম্নায় পরিচয়" শীর্ষক

অংশের মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই কতক কতক উল্লিখিত হইয়াছে। তথাপি পাঠকগণের বিশেষভাবে অবগতির জন্য এস্থলে পুনরায় উক্ত হইতেছে যথাঃ—১ম। তৎপুরুষ (অকার), ২য়। অঘোর (উ কার), ৩য়। সদ্যোজাত (ম কার), ৪র্থ। বামদেব (নাদ), ৫ম। ঈশ্বর (বিন্দু), ৬ষ্ঠ। নীলকণ্ঠ (কলা), ও ৭ম। চৈতন্য (কলাতীত)। শিবের এই সপ্ত আম্নায়ই মহাপ্রণবের সাতটী অঙ্গ বুঝিতে হইবে। ইহার মধ্যে কলা ও কলাতীত অর্থাৎ নীলকণ্ঠ ও চৈতন্য উভয় বস্তু যোগীন্দ্রেরই বোধগম্য।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়কেই মহাপ্রণবের "পাদ-চতুষ্টয়" বলা যায়।

মহাপ্রণবের "ত্রিস্থান"-সম্বন্ধে শ্রীভগবানের আজ্ঞা এই যে, সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের আধারই তাঁহার তিন স্থান।

সত্বগুণ:—দীপশিখাসদৃশ সতত উর্দ্ধগামী, লঘু, প্রকাশক ও সুখ-সন্তোষস্বরূপ এই মহাপ্রণবের উর্দ্ধাংশ; রজোগুণ:—নাতি-লঘুগুরু, বাসনা, অনুরাগ ও মোহময় এবং কাম ক্রোধাদির আকর, এইগুলিই মহাপ্রণবের মধ্যাংশ; তমোগুণ:—গুরু, দুঃখময়, আবরক, নিদ্রা ও আলস্যাদির কারণ; এইগুলিই মহাপ্রণবের নিম্নাংশ। গুণত্রয় এইভাবে মহাপ্রণবের "ত্রিস্থান" আশ্রয় করিয়া অনন্তরূপে বিশ্বে প্রকাশিত রহিয়াছে।

মহাপ্রণবের পঞ্চদেবতা সম্বন্ধে আদেশ আছে যে, হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সশক্তিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের সমষ্টিস্বরূপ—প্রথম দেবতা; সশক্তিক ঈশ্বর—দ্বিতীয়দেবতা; সশক্তিক মহেশ্বর—তৃতীয়দেবতা; মহাপ্রকৃতিসহ একীভূত পরশিব—চতুর্থ দেবতা এবং পরম-ব্যোম, পরমশিব বা পরম-ব্রহ্ম তাঁহার—পঞ্চম দেবতা। শ্রীসদা-

শিব বলিয়াছেন :—"আমিই সেই বিরাট অপর, ও মন্ত্রপ্রণব এবং আমিই সময়ে পরপ্রণবও হইতেছি। আমি অনেকস্থলে বলিয়াছি যাহা বিরাটে তাহাই পিণ্ডে প্রতিভাত হইয়াছে। আমার মূলাধারে পৃথিবীমূর্ত্তিস্বরূপ ব্রহ্মা, স্বাধিষ্ঠানে জলমূর্ত্তিস্বরূপ বিষ্ণু, মণিপুরে তৈজসমূর্ত্তিস্বরূপ রুদ্র, অনাহতে বায়ুমূর্ত্তিতে নাদস্বরূপ ঈশ্বর; বিশুদ্ধায় আকাশমূর্ত্তিতে বিন্দুস্বরূপে মহেশ্বর, আজ্ঞায় মনোমূর্ত্তিতে কলাস্বরূপ পরশিব এবং সহস্রারে কলাতীতস্বরূপ পরব্রহ্ম ও পরমাপ্রকৃতির মহাসমন্বয় হইতেছে। আমাতেই ধর্ম্মার্থাদি পাদচতুষ্টয়, সত্বাদি গুণত্রয় এবং আমিই হিরণ্যগর্ভাদি পঞ্চদেবতার আধার। সুতরাং আমিই প্রণব। যিনি প্রণবস্বরূপ "আমাকে" জানিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, জীবন্মুক্ত; তিনিই পরব্রহ্মস্বরূপ, তিনিই "আমি"।"

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ত্রিকালদর্শী মহর্ষিবৃন্দের আজ্ঞানুসারে প্রণবের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইতেছে। পাঠক মনোযোগসহকারে চিন্তা করুন।

শ্রীভগবান যেমন রজঃ সত্ব ও তমোগুণভেদে স্বতন্ত্র হইয়া আধ্যাত্মিকরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রকাশক, সেই প্রকার পঞ্চভূতাত্মক আধিভৌতিক রাজ্যের কারণরূপে সূক্ষ্ম নাদরূপ প্রণবের অন্তরস্থিত অ, উ, ম, এই ত্রি-শব্দময় আধারত্রয়ে যথাক্রমে বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার তিন আধিভৌতিকস্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যেরূপ ত্রিগুণাত্মক শক্তিসমূহের সম্মিলনফলে ত্রিগুণময় লীলাধারী জগদীশ্বরের উক্ত আধ্যাত্মিক সগুণ স্বরূপের নির্ণয় হইয়া থাকে, সেইরূপেই ত্র্যক্ষরময় ওঁকার দ্বারা

শ্রীভগবানের শব্দ-ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই অতি সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহর্ষি পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন যে,:—

"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।"

অর্থাৎ শ্রীভগবান শব্দ-ব্রহ্মময় প্রণবের তদাত্ম সম্বন্ধে থাকিবার কারণ প্রণবের জপ এবং প্রণবের রহস্য বিচার করিতে করিতে সাধক মুক্তিপদ পাইতে পারেন।

পূজ্যপাদবৃন্দ বেদাঙ্গরূপী শিক্ষাশাস্ত্রদ্বারা অতি সরলভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রণবের মধ্যে তিন গুণের তিন শক্তি পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিবার কারণ প্রণব শব্দ হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত এই তিন স্বরের সহায়তা বিনা উচ্চারণ হইতে পারে না। এই কারণ প্রণব "ত্রিনাদ" বলিয়াও উক্ত হইয়া থাকে।

"ওঁকারস্তু প্লুতোজ্ঞেয়স্ত্রিনাদ ইতি সংজ্ঞিতঃ॥"

এই ত্রিনাদ বা তিন মাত্রার কাল নির্ণয়ে শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ— হ্রস্ব স্বর একমাত্রা, একবার জানুতে হাত বুলাইতে যে সময় লাগে, ততটুকু সময় হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণ কাল বা একমাত্রা। দীর্ঘস্বর ঐ-রূপে দুইবার জানুতে হাত বুলাইতে যে সময় লাগে, তাহাই দীর্ঘ-স্বরের উচ্চারণ কাল বা দুই মাত্রা এবং প্লুতে এই ভাবে তিন বার জানুতে হাত বুলাইতে যে সময় লাগে, তাহাই প্লুতস্বরের উচ্চারণ কাল বা তিন মাত্রা। পাণিনি-সূত্রকার বলিয়াছেন ঃ— ইহার উচ্চারণ কাল কুক্কুটের শব্দের কালমাত্রার অনুরূপ। অর্থাৎ কুক্কুট যেমন কু উ কু উ কু উ অর্থাৎ প্রথক কু একমাত্রার, দ্বিতীয় কু দুইমাত্রার এবং তৃতীয় কু তিনমাত্রা কাল ব্যাপিয়া উচ্চারণ করে, প্রণবও সেইরূপ অ উ ম এই তিন অক্ষরের

সমাহারে ওঁ ত্রিনাদে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

গান্ধর্ব্ব-উপবেদ বা আর্য্য-সঙ্গীতশাস্ত্রমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, ষড়জ আদি সপ্তস্বর এক মাত্র ওঁ কারেরই অন্তর্বিভাগমাত্র। ষড়জ অর্থাৎ যাহা হইতে আর ছয়টী-স্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা উদ্ভূত হইয়াছে। অতএব মূলটী ও তাহা হইতে জাত আর ছয়টীকে লইয়া সাতটী স্বর।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, প্রণব সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট। সেই বিরাট-স্বরূপ প্রণবের সাত অঙ্গের চিহ্নরূপে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ বিভূতি সূর্য্যকিরণমধ্যে সাতবর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার মধ্যে আবার লোহিত, নীল ও পীত এই তিনটী তাঁহার প্রকৃতি-স্বরূপ ত্রিগুণের প্রকাশক ত্রিবর্ণ। লোহিত রজোবর্ণ, নীল তমো-বর্ণ এবং পীত সত্ত্বর্ণ, অবশিষ্ট চারিটী যৌগিকবর্ণ। এই বিষয়ে "সাধনপ্রদীপোক্ত" গায়ত্রী-রহস্যে ও "সন্ধ্যারহস্য" আদি অন্যান্য গ্রন্থেও বলা হইয়াছে। এই ভাবে জগতের যে কোন বস্তুর মধ্যেই শব্দ-ব্রহ্ম বিরাট-প্রণবের সপ্তাঙ্গের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে সপ্তশিব, সপ্তআম্নায়, সপ্তঋষি, সপ্তব্যাহৃতি, সপ্তস্বর্গ বা সপ্ত-উর্দ্ধলোক, সপ্তচক্র, সপ্তজ্ঞানভূমি, সপ্ত অধোলোক বা সপ্তপাতা-লাদি বিষয়ে বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সপ্তবার, সপ্তপুরি, সপ্তদীপ, সপ্তসমুদ্র, সপ্তপুণ্যনদী, সপ্তমুক্তিতীর্থ, ভূগর্ভে সপ্তস্তর, জলরাশিতে সপ্তস্তর, বায়ুতে সপ্তস্তর, (সপ্ত গুণিত সপ্ত ৭×৭ বায়ু=৪৯ উণ-পঞ্চাশবায়ু, অগ্নির সপ্তজিহ্বা, সপ্ত আকাশ, বৃক্ষত্বকে সপ্তস্তর, চর্ম্মমাংসাদিতে সপ্তস্তর, অর্থাৎ অন্নময় কোষের অন্তর্গত রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতুর প্রত্যেকের সপ্তস্তরে পরিপুষ্ট উণপঞ্চাশস্তরই পূর্ব্বকথিত উণপঞ্চাশবায়ু শব্দে শাস্ত্রে নির্ণীত

হইয়াছে। বায়ু অর্থে এ স্থলে বাতাস বা হাওয়া নহে, যে বহন করিয়া লইয়া যায় সেই বায়ু। জীবের ভোজ্য অন্ন হইতে রসাদি উক্ত সপ্তধাতুর প্রত্যেকের এক এক দিনে পুষ্টি হইয়া বা তাহা এক এক দিনে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে প্রতি সাতদিনে প্রত্যেক ধাতুর সাত স্তর পূর্ণ হইয়া পরবর্ত্তী ধাতুর পুষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বা সেই অন্নরস ক্রমে এই ভাবে উণপঞ্চাশদিনে পরিপূর্ণ হইয়া সপ্তাতীত ওজঃ ধাতুতে জীবনীশক্তির সহায়ক রূপে পরিণত হয়। এইরূপে পিণ্ড ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য ও অন্তর সর্ব্বত্র এই সপ্তস্তর বা সপ্ত-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই বিধি অনুসারেই একমেবা-দ্বিতীয় শব্দ-ব্রহ্মরূপী ওঁকার প্রথমে ষট্‌জ বা ষড়্‌জ হইতে ঋষভাদি সাত বিভাগে বিভক্ত হইয়া পরে পরস্পর-সংযোগে বিয়োগে সন্নিবিষ্ট হইয়া শব্দ-জগতে অসংখ্য স্বরের বিকাশ হইয়াছে। তাহা ষড়ঋতুর ভাবপ্রকাশক ছয়রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীতে পরিব্যাপ্ত। আবার শব্দব্রহ্মরূপী ওঁকার আপন ভাবে সমস্ত মন্ত্রেরই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কারক; অর্থাৎ সকল মন্ত্রই ওঁকার হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সকল মন্ত্রই ওঁকারে বিলীন হইয়া যায়। শ্রীভগবান সদাশিব বলিয়াছেন :—

"মন্ত্রাণাং প্রণবঃ সেতু।"

অর্থাৎ যেমন সেতুব্যতীত পথ অবিরোধী হইতে পারে না, সেইরূপ ওঁকারের সহায়তা ব্যতীত কোন মন্ত্রই সম্পূর্ণ বলশালী হইতে পারে না। অথবা লক্ষ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। * এইস্থলে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, মুখে প্রণবশব্দ যে ভাবে সাধারণতঃ উচ্চারিত হয়, তাহা সেই অলৌকিক প্রণব-

---

* সপ্তধাতু সম্বন্ধে পঞ্চমোল্লাসের মধ্যে "পঞ্চকোষ" দেখ।

নাদের অতিস্থূল প্রতিশব্দ মাত্র। প্রকৃত পক্ষে ইহা কেবল লৌকিক সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীভগবান সদাশিব আগমের মধ্যে অতি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, মুখে উচ্চারণ-যোগ্য ওঁকার ধ্বনিরূপ হইলেও তাহা অতি গভীর সাধনগম্য, অতি সূক্ষ্মভাবে মূলাধার কমল হইতে উদ্ভূত হইয়া সকল চক্র স্পর্শ-পূর্ব্বক সহস্রারস্থিত পরমপুরুষে বা পরমশিবে যাইয়া লয় হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে আলোচিত অপর, পর ও মহাপ্রণব-প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। পাঠক তাহা স্মরণ করিলে অধিকতর সরলভাবে ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। এই ওঁকার-নাদ সিদ্ধ হইলেও সাধক ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারেন। অতএব গুরু-পদেশ ক্রমে "ওঁকার"-নাদ সাধনাসহ উচ্চারণ করা বিধেয়। বাস্তবিক প্রণবমন্ত্র অদ্ভুত শক্তিশালী বিচিত্র বস্তু। সেই কারণ যে কোনও মন্ত্র পাঠ বা উচ্চারণ কালে প্রথমেই প্রণবমন্ত্র উচ্চারণ করা আবশ্যক। মন্ত্রসমূহ ওঁকারের সহিত যুক্ত হইয়াই পূর্ণ-বলশালী হইয়া থাকে, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। কোন মন্ত্রে যদি ভ্রমক্রমে কোনও অক্ষর হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়া যায় অথবা অনুস্বার ও বিসর্গাদির অযথা ব্যবহার হইয়া যায়, কিম্বা কোনও প্রকারে কোন মন্ত্র যদি যজ্ঞ-নিয়ম-বিহীন, অপবিত্র, খণ্ডিত বা স্বরূপচ্যুত হইয়া যায়, কিন্তু সেই মন্ত্রের সহিত যদি প্রণবমন্ত্র সং-যুক্ত থাকে, তাহা হইলে সেই মন্ত্রের দোষ বিনষ্ট হইয়া তাহা পূর্ণ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ইহাই ওঁকারের আধিভৌতিক রহস্য।

সংহিতাপাঠে অবগত হওয়া যায় যেঃ—

"কার্য্যং যত্রবিভাব্যতে কিমপি তৎ স্পন্দেন সব্যাপকম,
স্পন্দশ্চাপি তথা জগৎসু বিদিতং শব্দান্বয়ী সর্ব্বদা।

স্পষ্টশ্চৈব তথাদিমাকৃতি বিশেষত্বদ্‌ভূৎ স্পন্দিনী,
শব্দশ্চোত্তবত্তদা প্রণব ইতোঙ্কাররূপঃ শিবঃ ॥"

অর্থাৎ যথায় কোনপ্রকার কর্ম্ম হয়, তথায় অবশ্যই স্পন্দন বা কম্পন হওয়া সম্ভবপর, যথায় স্পন্দন আছে, তথায় শব্দ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। ফলতঃ সৃষ্টিরূপী কার্য্যের সময় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাময়ী প্রকৃতির মধ্যে যে প্রথম স্পন্দন বা হিল্লোল-ধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছে, তাহাই আর্য্য-সাধন-বিজ্ঞানে অপূর্ব্বশিবরূপী নাদাঙ্গীভূত বিন্দুর বিশ্লেষণরূপ অ+উ+ম=ওঁকার। সাম্যাবস্থাময়ী প্রকৃতিতে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমতা থাকিবার কারণ জ্ঞানের পূর্ণ-বিকাশ বিদ্যমান থাকে, সেই কারণ ভগবান পূর্ণজ্ঞানময় এবং বৈষম্যাবস্থায় প্রকৃতিতে গুণত্রয়ের অল্পাধিক বা তারতম্য বশতঃ যেমন ভাবের অনন্তত্বা বর্দ্ধিত হইতে থাকে তেমনই জ্ঞানের সম্পূর্ণতা বা ন্যূনতা হইয়া যায়। এই কারণ বৈষম্যাবস্থাবিশিষ্ট প্রকৃতিতে অসংখ্য লৌকিক শব্দ সমাবিষ্ট হইতেছে। কিন্তু সাম্যাবস্থা প্রকৃতির সেই প্রথম হিল্লোলে কেবল একমাত্র আলৌকিক শব্দ প্রণবই সমুদ্ভূত হইয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সাম্যাবস্থাময়ী সেই প্রকৃতির নাম বিদ্যারূপিনী মহামায়া আর বৈষম্যাবস্থাবিশিষ্টা প্রকৃতির নাম অনন্তরূপধারিণী অবিদ্যা। জীবের সহিত অবিদ্যানাম্নী প্রকৃতির অধিক সম্বন্ধ থাকিবার কারণ জীব অল্প ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যারূপিনী মহামায়া বা মহাপ্রকৃতি সর্ব্বদা শ্রীভগবানে শক্তি-রূপে অবস্থিতা রহিয়াছেন; এই কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্ব-

* "সাধন প্রদীপে," "মন্ত্রতত্ত্ব, ও মন্ত্রযোগরহস্তে" জপ অংশে দেখ।

জ্ঞানময়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল ক্রিয়া ও সমস্ত জ্ঞানেরই তিনি আধার স্বরূপ। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানময় হইবার কারণ সমস্ত ক্রিয়া-জ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াও তিনি সকলের অতীত বা কলা ও কলাতীত। অর্থাৎ তিনি কোনও কর্ম্মের অধীন নহেন, তথাপি এই সৃষ্টিক্রিয়া তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহাতেই স্থিত আছে, পরে তাঁহাতেই লয় হইয়া যাইবে। যাহাহউক বিদ্যারূপিনী মহামায়ার যে সমতাযুক্ত ভাবের সহিত সৃষ্টির আদি কারণের সম্বন্ধ আছে, সেই নিত্যলীলারূপী শ্রীভগবান-পদের সহিত প্রণবরূপী বাচক শব্দের তদাত্ম-সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে। এই হেতু ইহা বিজ্ঞান-সিদ্ধ হইয়াছে যে, যদিও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবানুসারে বিরাট-পুরুষ, শ্রীভগবান, ব্রহ্মময়ী মহামায়া, ব্রহ্ম ও ওঁকারাদি সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু অভেদ সম্বন্ধহেতু এই পদই এক অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংজড়িত। উদাহরণ দ্বারা সহজেই বোধগম্য হইবে, যেমন চেতন ও ক্রিয়া বা ইতিপূর্ব্বে স্থানান্তরে বর্ণিত ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি এই দুই স্বতন্ত্র-ভাব-অনুসারে, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই ঈশ্বর ও মহামায়ানামে দ্বৈত বা দুই বিভিন্ন ভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে, তেমনি সৃষ্টি ক্রিয়া ও তদ্স্পন্দনধ্বনির বিচার দ্বারা বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বর ও প্রণবের তদাত্ম সম্বন্ধ স্থিরনিশ্চয় হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই প্রণব, যাহা তিনটী বর্ণের সংযোগে উৎপন্ন হয়, তাহা ঈশ্বরবাচক আদি ওঁকারধ্বনির প্রতিশব্দমাত্র। উপনিষদের মধ্যে তাহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছেঃ—

"তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ". ইত্যাদি।

অর্থাৎ প্রণবধ্বনি তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ও দীর্ঘ ঘণ্টানিনাদের অনুরূপ অবিশ্রান্ত মধুরশব্দ; ঘণ্টারধ্বনি সকলের

শ্রুতিগোচর হইয়া যেমন তদঙ্গেই ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া যায়, ঈশ্বরবাচক আদি ওঁকার প্রণব ধ্বনিও সেইরূপ আধার-কমলরূপ দিব্য ঘণ্টা হইতে বিনির্গত হইয়া অবিরতভাবে 'দশশতকমলদলের' অঙ্গেই কি যে এক অভিনবভাবে বিলয়-প্রাপ্ত হয়, তাহা যোগযুক্ত যোগিগণই যখন সাম্যাবস্থা প্রকৃতির সমীপবর্ত্তী হন, তখনই অনুভব করিতে পারেন। বাস্তবিক তাহা সাধারণভাবে মুখে উচ্চারিত হইতেও পারে না, অথবা স্থূল শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহায়তায় তাহা ঠিক শুনিতেও পাওয়া যায় না। তাহাই সরল বংশদণ্ড-সদৃশ সপ্তগ্রন্থি বিশিষ্ট, জীবন্মুক্ত পরমহংস-বৃন্দের একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মদণ্ড বা ব্রহ্মবীণা। ইহার প্রকৃত রহস্য শব্দ-সম্পদে অভিব্যক্ত হইতে পারে না। ভাগ্যবান মহাপুরুষেরই তাহা একমাত্র বোধগম্য। তাঁহারাই সেই ব্রহ্মবীণায় নাদব্রহ্মরূপী সপ্তস্বরা বিশ্বপ্রসূ মূলপ্রকৃতি মহামায়ার অলৌকিক স্পন্দন-ভাবাত্মক অপূর্ব্ব প্রণবধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধন্য হন।

এই ধ্বনি বাচ্য-বাচক সম্বন্ধে অনাদি ও অনন্তস্বরূপ, তবে অক্ষর দ্বারা যে এই প্রণব লিখিতে পারা যায় ও উচ্চারণ করিতে পারা-যায়, তাহা কেবল উহার প্রতিশব্দ মাত্র। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ যোগযুক্ত সময়ে সমাধি-বুদ্ধি-দ্বারা সুপবিত্র বেদের অবির্ভাব করি-বার পূর্ব্বেই এই আলৌকিক প্রণবধ্বনির প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই ওঁকার বিজ্ঞানের অধিদৈব রহস্য।

বেদে কথিত আছে, ওঁকাররূপী অক্ষরের উপাসনা করিলে সাধক পরমাত্মা প্রণবেই স্থিত হইয়া থাকেন।

ওঁ তৎ সৎ পদ বিচার।

গীতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়:—

"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধ স্মৃতঃ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদান তপঃ ক্রিয়াঃ ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥"

অর্থাৎ ওঁ তৎ ও সৎ এই তিন শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যুক্ত হইয়াও এক মাত্র ব্রহ্মেরই বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর সেই বাচ্য-বাচক সম্বন্ধও কেবল কাল্পনিক বা লৌকিক নহে। এই সম্বন্ধ অনাদি। এবং অনাদিভাবেই এই তিনের রহস্যসহ ব্রাহ্মণ, বেদে ও যজ্ঞের সম্বন্ধ আদি সৃষ্টিতে স্থাপিত হইয়াছে। পুনরায় ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, ওঁকাররূপী মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মবাদীদিগের যজ্ঞ, দান ও তপঃ ক্রিয়া সর্ব্বদা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মোক্ষকামার্থীরা ফল-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক "তৎ" শব্দের উচ্চারণ করিয়া নাগযজ্ঞ, তপস্যা ও দানক্রিয়া করিয়া থাকেন। সৎভাবে আর সাধুভাবে "সৎ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মাঙ্গলিক কর্ম্মেও সৎশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যজ্ঞ, তপস্যা ও দানরূপী ধর্ম্ম-কর্ম্মে অবস্থান করাকেও সৎ বলে, সিধা কথায় সৎ অর্থে সত্য বুঝিতে হইবে; সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মও সৎ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। গীতার এই অংশের জ্ঞান অতি গূঢ়। ইহাদ্বারা প্রণবমন্ত্রের আধ্যাত্মিক রহস্য অতি বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা এতই গভীর বিজ্ঞানসম্মত যে, তাহা ভাষায় ঠিক বর্ণন করা যায় না। তথাপি সংক্ষেপে এই ভাব মাত্র প্রকাশ করা যায় যে, যেমন ব্রহ্মভাব, ঈশ্বরভাব এবং বিরাটপুরুষভাবের দ্বারা ভগবানের অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূতরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তেমনই অলৌকিক ক্রমানুসারে ওঁ তৎ ও সৎ এই তিন মন্ত্রের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে শ্রীভগবানের বাচকত্ব সপ্রমাণিত হই-

তেছে। ফলতঃ গীতার এই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানও যে শিবোক্ত প্রণবের অধ্যাত্মিক রহস্য-প্রকাশক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব মুক্তিকামী পাঠক, এই অপূর্ব্ব প্রণবরহস্য ধীরভাবে চিন্তা করুণ। সদ্যোপবীতধারী ব্রাহ্মণকুমার হইতে সিদ্ধসাধক হংস ও পরমহংস সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত সকলেরই এই অপূর্ব্ব প্রণবরহস্য আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ওঁ তৎসৎ সদাশিব ওঁ।

সপ্তমোল্লাস।

মুক্তিতত্ত্ব।

শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তোভবতি মানবঃ॥"

আপনি আপনাকে জানিতে পারিলেই মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে। সকল জীবের পক্ষেই, আত্মা পরম প্রিয়বস্তু। সেই পরম প্রেমাস্পদ আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই। আত্ম-সম্বন্ধানুসারেই ইহলোকে স্থূল বিষয়ের প্রতি জীবের এতাধিক প্রীতি হইয়া থাকে। পরন্তু জ্ঞানিগণ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতারূপ ত্রিতয়ের তত্ত্ব বিচার করিয়া সকলের সারধন সেই প্রিয়তম আত্মাকেই জানিতে পারিয়া তাহাতেই তন্ময় হইয়া ধন্য হইন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সকল কারণের কারণ সেই চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, সেই চিন্ময় আত্মাই জ্ঞেয় বস্তু এবং সেই চিন্ময় আত্মাই স্বয়ং জ্ঞাতা।

যিনি এই সাক্ষাৎ নির্ব্বাণমুক্তির কারণ সেই নিত্যধর্ম আত্মাকে জানিতে পারেন, তিনিই আত্মবিৎ বা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। অতএব সেই আত্মজ্ঞানই মুক্তি বা মোক্ষপদ বাচ্য।

"নিরালম্বোপনিষদে" উক্ত হইয়াছেঃ—

"নিত্যানিত্যবস্তুবিচারাদনিত্যসংসারসমস্তসঙ্কল্পক্ষয়োমোক্ষঃ ॥"

নিত্যানিত্য-বস্তু-বিচার দ্বারা নিত্যবস্তু বা আত্মা নিশ্চিত হইলে অনিত্য সংসারের অনাত্মমূলক সমস্ত সংকল্প ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, জীবের সেই সঙ্কল্প-ক্ষয়ের নামই মুক্তি। কারণ

"সংকল্পমাত্রং বন্ধঃ"।

অর্থাৎ চিত্তে কোন বিষয়ের সঙ্কল্পমাত্র উত্থানের নামই বন্ধন। কামাদি সঙ্কল্পের ন্যায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও মন্ত্রাদি যোগ সাধনা-বিষয়ক সঙ্কল্পও বন্ধনের কারণ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তবে এই হিসাবে যোগাদির সংকল্প 'বন্ধন'-পদবাচ্য হইলেও পক্ষান্তরে মুক্তির কারণ বলিয়া তাহা সতত অবলম্বনীয়। কিন্তু ইক্ষুর রস গ্রহণের পর তাহার অসার অংশ বা ছিব্‌ড়া ফেলিয়া দিবার ন্যায় সেই সকল অনুষ্ঠানের পুনঃ সঙ্কল্পও চিত্ত হইতে পরিত্যাগ করিতে হয়। মুক্তি-বিরোধক সেই সঙ্কল্প-সৃষ্টি-বিষয়ে "শ্রীমদ্ভাগবতে" উক্ত হইয়াছেঃ—

"বৈকারিকাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনস্তত্ত্বমজায়তে।
যৎসঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং বর্ত্ততে কামসম্ভবঃ॥"

বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ সৃষ্ট্যর্থ উন্মুখ হইলে, তাহা হইতে মনস্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। তখন মনের সঙ্কল্প অর্থাৎ কোনও কর্ম্ম-করিবার ইচ্ছা এবং বিকল্প অর্থাৎ ইহা করি কি উহা করি, অথবা করি কি না করি, এইরূপ ভাবের পর-

স্পর বিরুদ্ধ-বিষয়ক চিন্তাদ্বারা কাম বা কামনার উদ্ভব হয়। এই কামই সংসারে সকল দুঃখের কারণস্বরূপ। তাই শ্রীভগবান "গীতায়" বলিয়াছেনঃ—

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

সঙ্গ বা আসক্তি হইতে কাম অর্থাৎ কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ হইতে সংমোহ হয়, সংমোহ হইতে স্মৃতিভ্রম বা আত্মবিস্মৃতি এবং আত্মবিস্মৃতি হইতেই বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে প্রমাদ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ তাহার বা জীবের তখন মৃত্যুতুল্য অবস্থা হয়। সুতরাং কামনাই সকল দুঃখের কারণ, আবার সেই কামনার কারণ সঙ্কল্প যাহাতে হৃদয়ে আদৌ স্থান পাইতে না পারে, তাহাই মুমুক্ষুর প্রাণপণে করা কর্ত্তব্য। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশে উক্ত যোগাদি ক্রিয়ার অবিরত সাধনানুষ্ঠানের দ্বারা মানসাদি অন্তঃকরণের চতুর্ব্বিধ অবস্থাকে স্থির করিয়া পূর্ব্বকথিত নিত্যানিত্যবস্তুর বিচার-দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প বর্জ্জিত হইতে পারিলেই জীবের মুক্তি হয়।

শ্রীমদ্ভগবান বশিষ্টদেব বলিয়াছেন ঃ—

"যত্তু চঞ্চলতাহীনং তন্মনো মৃতমুচ্যতে।
তদেব চ তপঃ শাস্ত্রসিদ্ধান্তো মোক্ষ উচ্যতে॥"

মনের চঞ্চলতা নাশ হইলে অর্থাৎ যখন মনের পূর্ণ একাগ্রতা জন্মে, তখন সেই মন শাস্ত্রবাক্যে মৃত বলিয়া উক্ত হয়। সেই মৃত মনই তপস্যাযুক্ত হইয়া সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তেই মোক্ষ-শব্দবাচ্য হয়।

"মুক্তিকোপনিষদে" উক্ত হইয়াছে :—

"চিত্তৈকাগ্রাদ্ যতো জ্ঞানং মুক্তিঃ সমুপজায়তে ॥"

অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা হইলেই মনুষ্যের জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞান হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে।

শ্রীমন্মহর্ষি অষ্টাবক্রদেব, আদর্শজীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শ্রীমৎ রাজর্ষি জনককে জীবের বন্ধন ও মুক্তি বিষয়ের উপদেশক্রমে বলিয়াছেন :—

"তদাবন্ধো যদাচিত্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি শোচতি।
কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্নাতি কিঞ্চিৎ হৃষ্যতি কুপ্যতি ॥"

যখন চিত্ত কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে, কোন বিষয়ের জন্য শোক করে, কিছু ত্যাগ করে, কোনও বস্তু গ্রহণ করে, কোন বিষয়ে আনন্দিত হয়, আবার কোন বিষয়ে ক্রুদ্ধ হয়, তখনই জীবের বন্ধন বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ তখন সেই বিষয়ানুরাগীরূপ অবিদ্যা-বিলসিত আত্মাই জীবশব্দে উক্ত হইয়া থাকে।

"তদামুক্তি র্যদা চিত্তং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্নাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ॥"

যখন চিত্তের কোন বিষয়ে বাসনা থাকে না, চিত্ত কাহারও জন্য শোক করে না, কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ করে না, কোনও বিষয়ে আনন্দিত বা ক্রুদ্ধ হয় না অর্থাৎ চিত্ত যখন রাগ অর্থাৎ আসক্তি বা অনুরাগ ও দ্বেষ বা বিরাগ বর্জ্জিত হয়, তখনই মুক্তি অবস্থা জানিবে।

"তদাবন্ধো যদাচিত্তং সক্তং কাস্বপি দৃষ্টিষু।
তদা মোক্ষো যদা চিত্তং ন সক্তং সর্ব্বদৃষ্টিষু ॥"

যখন পরিদৃশ্যমান কোন বস্তুর উপর চিত্তের আসক্তি থাকে,

তখনই বন্ধন, আর যখন কোনও বস্তুর উপরেই চিত্তের কোন-প্রকার আসক্তি থাকে না, তখন জীবের মুক্তি অবস্থা জানিবে।

এই স্থানে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক, আসক্তিবর্জ্জিত অবস্থাকে দ্বেষ বলা যায় না, দ্বেষ স্বতন্ত্র বস্তু; দ্বেষ ভাবে আসক্তি বা বিষয়ানুরাগ গুপ্তভাবে থাকে অথবা অন্য বিষয়ের আসক্তিতে তাহা তখন প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। সেই কারণ মুক্তিকামীর রাগ ও দ্বেষ উভয় ভাব হইতেই বর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ তাঁহাতে যেমন কোন বিষয়ের অনুরাগ থাকিবে না, সেইরূপ কোন বিষয়ে বিদ্বেষও থাকিবে না। কারণ যে স্থানে অনুরাগ আছে সেই স্থানে অবস্থাভেদে বিদ্বেষও আছে বা অবস্থাভেদে দ্বেষও উৎপন্ন হয়।

"যদা নাহং তদা মোক্ষো যদাহং বন্ধনং তদা।
মত্বেতি হেলয়া কিঞ্চিন্মাগৃহাণ বিমুঞ্চ মা॥"

যতক্ষণ পরমাত্মার সহিত আমার পৃথক্ জ্ঞান আছে, অর্থাৎ যতক্ষণ আমি আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ, ততক্ষণ আমার বন্ধন দশা। অর্থাৎ ততক্ষণই আমি জীব-শব্দবাচ্য এবং আমার আত্মাভিমান না থাকার অবস্থাই আমার মুক্তি। এই বন্ধন ও মুক্তির কারণ অবগত হইয়া অবহেলাক্রমেও চিত্তে কোনও বিষয়ের গ্রহণ বা বর্জ্জন করিবে না বা পূর্ব্বকথিত মত রাগ-দ্বেষময় দ্বন্দ্বের বশীভূত হইবে না। "মণিরত্নমালার" প্রশ্নোত্তরে এই কথাই কেমন সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছেঃ—

"বন্ধোহি কো? যো বিষয়ানুরাগঃ।*
কো বা বিমুক্তিঃ? বিষয়ে বিরক্তিঃ॥"

---

* সপ্তধাতু সম্বন্ধে পঞ্চমোল্লাসের মধ্যে "পঞ্চকোষ" দেখ।

প্রশ্ন—বন্ধন কাহাকে বলে ? উত্তর—বিষয় ভোগে মনের যে অনুরাগ, তাহারই নাম বন্ধন। পুনরায় প্রশ্ন—আর মুক্তি কাহাকে বলে ? উত্তর—বিষয়-বাসনা-রাহিত্য বা বিষয়ে বিরক্তি হওয়ার নামই মুক্তি। এ স্থলেও বিরক্তি অর্থে দ্বেষ নহে। এই সঙ্গে চতুর্থোল্লাসের "বৈরাগ্য ও চতুর্থাশ্রম" অংশও পাঠকের পুনরায় পাঠ করা কর্ত্তব্য।

মন ও মনের অবস্থা ভেদ।

"অমনস্ক গীতায়" উক্ত আছে :—

"মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈর্নির্ব্বিষয়ং স্মৃতং ॥"

মানুষের মন যেমন বন্ধনের কারণ, তেমনই মোক্ষেরও কারণ। যেহেতু মন বিষয়াসক্ত হইলেই বন্ধনের হেতু হয় এবং নির্ব্বিষয় হইলেই বা বিষয়সমূহে বৈরাগ্য জন্মিলেই মন মুক্তির হেতু হইয়া থাকে। মণীষিবৃন্দ এই মনের বিক্ষিপ্ত, গতায়াত, সুশ্লিষ্ট ও সুলীন ভেদে চারি প্রকার অবস্থার বর্ণন করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ও গতায়াত মনের এই দুইটী অবস্থাকে শাস্ত্রে বিষয়-গ্রাহী বলিয়াছেন; সুতরাং মনের এই দুই অবস্থা সংসারাসক্তির কারণ এবং সুশ্লিষ্ট ও সুলীনক নামক অবস্থাদ্বয় বিষয়-বিঘাতী সুতরাং মনের এই দুই অবস্থা বৈরাগ্যপ্রদ।

"বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাশ্চ ॥"

পঞ্চবিধ মনোবৃত্তি ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্টভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি বৃত্তিগুলি ক্লেশের কারণ বলিয়া ক্লিষ্ট এবং শ্রদ্ধা, ভক্তি, ইত্যাদি বৃত্তিগুলি সুখের কারণ বলিয়া অক্লিষ্ট। মন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ করিবামাত্র অন্তঃকরণে যে বিষয়ানুরাগ বা তদাকারভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই "বৃত্তি" কহে। তাহা পাঁচ

প্রকার। যথা (১) প্রমাণ, (২) বিপর্য্যয়, (৩) বিকল্প (৪) নিদ্রা ও (৫) স্মৃতি।

(১) প্রমাণবৃত্তি ;—ইহা আবার তিন প্রকার। যথাঃ—

"প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥"

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমকে প্রমাণ বলে। কোন ও বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয় সংলগ্ন হইলেই বস্তুর স্বরূপ বোধ হওয়ার নাম প্রত্যক্ষ। কোনও প্রত্যক্ষবস্তুর আনুসঙ্গিক বস্তুর দ্বারা যে প্রতীতি তাহার নাম অনুমান। যথা ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান, পুষ্করিণী মধ্যে জলের বিম্ব ও কম্পন দেখিয়া [illegible] বা কোন জলের জীবের অনুমান। বিশ্বাস-যোগ্য বাক্যশ্রবণের দ্বারা কোন বস্তুর জ্ঞান হওয়ার নাম আগম। অতএব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রকার অবস্থাকেই মনের প্রমাণ বৃত্তি বলা যায়। মন সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হউক, অপ্রত্যক্ষ হউক অথবা কাহারও মুখে শুনিয়াই হউক, কোনও বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সেই বিষয়ের সহিত তদাকার বিশিষ্ট হইয়া চঞ্চল হইয়া পড়ে। মন স্থির করিতে হইলে, এই প্রমাণ নামক বৃত্তি দ্বারা যাহাতে চিত্ত বিষয়ে তন্ময় হইতে না পারে, মুক্তিকামী যোগী সর্ব্বদা তাহাতে সাবধান হইবেন।

(২) বিপর্য্যয়বৃত্তি ;—ভ্রমাত্মক বা মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্য্যয় বলে, অর্থাৎ এক বস্তুতে যেমন অন্যবস্তুর ভ্রান্ত কল্পনা হয়। যথা রজ্জু দেখিয়া সর্পভ্রম।

(৩) বিকল্পবৃত্তি ;—যে বস্তুর অস্তিত্ব নাই অথচ তাহার নাম আছে, এমন বস্তুর জন্য যে মনোভাব উদিত হয়, তাহারই নাম বিকল্প। যথা, আকাশ-কুসুম, অশ্বডিম্ব। আবার একই বস্তু

কিন্তু দুইটীনাম হইবার কারণ মনের বিকল্পবৃত্তি উপস্থিত হয়। যথা, আত্মা ও চৈতন্য একই বস্তু ; কিন্তু আত্মার চৈতন্য বলিলে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাকেও বিকল্পবৃত্তি কহে।

(৪) নিদ্রাবৃত্তি ;—যাহাতে সমুদায় মনোবৃত্তি লয় প্রাপ্ত হয় বা অজ্ঞান-অবলম্বিত মনোবৃত্তির নামই নিদ্রা।

(৫) স্মৃতিবৃত্তি ;—পূর্ব্বে অনুভূত বা প্রত্যক্ষবস্তুর ভাব, যাহা পরবর্ত্তী সময়ে চিত্তে উদয় হয়, তাহার নাম স্মৃতি।

মনের এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি দ্বারা মন বিচলিত হয়। এই কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মন নিশ্চল বা মৃত হইলেই তপস্যাযুক্ত হইয়া মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত পাতঞ্জল-যোগ-সূত্রের ভাষ্যকার মনের এইরূপ পঞ্চবিধ অবস্থার কথা নিম্নলিখিত রূপে বর্ণন করিয়াছেন। যথা—(১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ় (৩) বিক্ষিপ্ত (৪) একাগ্র ও (৫) সমাধি। এই সকল কথা যোগসাধনাদি আলোচনা প্রসঙ্গেও উক্ত হইয়াছে।

ক্ষিপ্তাবস্থা, চিত্তের চাঞ্চল্য অবস্থার নাম ক্ষিপ্ত ; ইহা রজোগুণের কার্য্য। মূঢ়াবস্থা তমোগুণের কার্য্য, বারম্বার বুঝাইলেও যখন চিত্ত বুঝেনা ; বিক্ষিপ্তাবস্থা, সত্ত্বগুণের কার্য্য হইলেও ইহাতে মনের অনিত্য বিশুদ্ধ সুখ ভোগের ইচ্ছা হয়। এই তিন অবস্থাই মুক্তির বিরোধি ; কেবল একাগ্র অর্থাৎ চিত্তস্থিরতা ও সমাধি এই অবস্থাদ্বয় চিত্তকে নিশ্চল ও দৃঢ় করিয়া দেয় ; ইহা গুণত্রয়ের সংযম ও গুণত্রয়াতীতের কার্য্য; সুতরাং চিত্তের এই দুই অবস্থাই মুক্তির কারণ। অতএব মুক্তিকামী সাধক সাধ্যমতে চিত্তের বৈরাগ্য ও নিশ্চলপ্রদ অবস্থার রক্ষা করিয়া বিষয়বন্ধনপ্রদ সংকল্প হইতে আত্মরক্ষা করিবেন। জীব অন্তঃকরণের দৃঢ়তার অভাবেই বিষয়-

সুখের সঙ্কল্পে আত্মবন্ধন করিয়া বসে। আমিই কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাবিয়া নিত্য নৈমিত্তিক যাগ, ব্রত, তপস্যা ও দানাদি বিবিধ কর্ম্মের সঙ্কল্পবিচারে ফলেব অনুসন্ধানের দ্বারা জন্ম মৃত্যুর কারণরূপ জীবের কর্ম্ম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া অবিরত নানাবিধ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া অতীব কাতর হয় ও সতত দুঃখ অনুভব করে। এ সমস্তই অবিদ্যার ক্রিয়া। অবিদ্যাই অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, দুঃখকে সুখ এবং অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া ভ্রম বা বিপরীত জ্ঞানের অনুভব করাইয়া দেয়, তাই পরে তাহা বন্ধনের কারণরূপে ত্রিবিধ দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। অবিদ্যা হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়াছে, অবিদ্যাদ্বারাই চৈতন্যময় জীব আপনাআপনি জড়ময় ভাবিয়া মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং এই অবিদ্যাই নানা ক্লেশের কারণ-স্বরূপ। এই অবিদ্যার আত্মশক্তিবিকাশের চারিটী ক্ষেত্র বা স্তর আছে। "পতঞ্জলি" বলিয়াছেন :—

"অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাংপ্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারণাম্॥"

যথা (১) প্রসুপ্ত, (২) তনু (৩) বিচ্ছিন্ন এবং (৪) উদার (এই চারি প্রকার অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপে তাহা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে)।

(১) প্রসুপ্ত ;—যখন ঐ অবিদ্যা নিদ্রিতভাবে অন্তঃকরণে অবস্থিত থাকে, অর্থাৎ বহিরঙ্গের সহিত যতক্ষণ উহার কোন-প্রকার সম্বন্ধ প্রতীত না হয়, ততক্ষণ উহাকে প্রসুপ্ত বলা যায়। সে বৃত্তি অন্তরে যেন নিদ্রিত আছে, জাগাইলেই জাগে। যেমন সদানন্দময় বালকের অন্তরেও ক্রোধাদি বৃত্তি আছে সত্য, কিন্তু তাহা প্রায়ই প্রসুপ্ত অবস্থায় থাকে। যতক্ষণ এমন কোন বাহ্য কারণ উপস্থিত না হয়, যাহার দ্বারা সেই বৃত্তিগুলি উদ্দীপিত হয়,

ততক্ষণ তাহাকে নিদ্রিত বা প্রসুপ্ত বলা যায়।

(২) তনু ;—যখন এক বৃত্তির দ্বারা অন্য বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া থাকে, যেমন কোনও পরাক্রান্ত ব্যক্তির অধীনে কোন দুর্ব্বল শত্রু শান্ত হইয়া থাকে মাত্র, কিন্তু তাহার অন্তরে শত্রুতাবৃত্তি সততই ক্ষীণভাবে জাগিয়া থাকে, তাহাকেই অন্তঃকরণের তনুবৃত্তি বলা যায়।

(৩) বিচ্ছিন্ন,—এক বৃত্তির উদয়ে অন্যবৃত্তি যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহা সরিয়া যায়। যেমন কোন বিষয়ের কামনা হইয়াছে, কিন্তু সেই কামনা পূর্ণ না হইবার কারণ ক্রোধের উদয় হইল ; যখন অন্তঃকরণে ক্রোধ রিপুর উদয় হইল, তখনই কামনা অন্তর হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল। ইহাকেই অন্তঃকরণের বিচ্ছিন্নাবস্থা বলা যায়।

(৪) উদার ;—যখন কোনও বৃত্তির দ্বারা অন্তঃকরণ পূর্ণভাবে ভরিয়া যায়, তখন তাহাকে উদার বলা যায়। পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাই সূক্ষ্মভাবে বটবীজের ন্যায় ক্রমে নানা বৃত্তিতে বিকশিত হইয়া বিরাট বটবৃক্ষের ন্যায় সমগ্র দুঃখের সৃষ্টির কারণ হয়।

জীবের এই দুঃখ-ভোগ করা দার্শনিকভাষায় "হেয়" শব্দে হইয়াছে।

"সাংখ্যদর্শনে' উক্ত হইয়াছে :—

"ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ম্॥"

অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক জীবের এই তিন প্রকার দুঃখের নাম হেয়।

"তদত্যন্তনিবৃত্তির্হানম্।

উক্ত দুঃখত্রয়ের সম্পূর্ণ নিবৃত্তিকে 'হান' অর্থাৎ মুক্তি বলা

যায়। "সাংখ্যপ্রবচনের" প্রথম সূত্রেও এই কথাই উক্ত হইয়াছে :—

"অথ ত্রিবিধদুঃখাদেরত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ॥"

ত্রিবিধ-দুঃখের যে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি তাহাই পরম পুরুষার্থ নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের উপশম হইলে বা অনন্তকাল পর্য্যন্ত ঐ ত্রিবিধ দুঃখের কোন প্রকারেই আর অভিভূত হইব না, এই প্রকার বোধ জন্মিলেই তাহাকে পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্তি কহে।

মহর্ষি পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন :—

"বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবাহানোপায়ঃ॥"

সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী বিবেক-প্রসূত প্রজ্ঞাই অবিদ্যা-নাশের বা মুক্তির উপায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশে কথিত যোগানুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে যেমন সেই চিত্তমল বিদূরিত হইয়া থাকে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নির্ম্মল জ্ঞানের অতি প্রভাময়ী প্রজ্ঞা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত রাজযোগনির্দ্দিষ্ট সপ্তজ্ঞানভূমির ন্যায় মহর্ষি পতঞ্জলিও সেই জ্ঞানবিকাশের সাতটী অবস্থারই উল্লেখ করিয়াছেন।

"তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ ॥"

অর্থাৎ সেই প্রজ্ঞার সাত প্রকার অবস্থা। তাহার মধ্যে চারি প্রকার কার্য্য বিমুক্তি অবস্থা এবং তিন প্রকার চিত্ত-বিমুক্তি অবস্থা। প্রজ্ঞার এই সাত প্রকার অবস্থা পূর্ণ হইলেই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যোগসাধনার পরিসমাপ্তি হয়, তখনই আত্মসাক্ষাৎকার হয়; অর্থাৎ যোগীর জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনসম্ভূত সমাধি হয়। প্রথম চারি প্রকার কার্য্য-বিমুক্তি অবস্থা। যথা :—(১) পূর্ব্বে যে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল, এক্ষণে তাহা সমস্তই জ্ঞাত হইয়াছি।

(২) পূর্ব্বে মনে রাগ দ্বেষাদি দোষ ছিল, এক্ষণে আর তাহা নাই। (৩) যাহা পাইবার আশা ছিল সে সমস্তই পাইয়াছি, আর কিছু আমার প্রাপ্তব্য নাই। (৪) পূর্ব্বে প্রকৃতি ও পুরুষ একীভূত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই, এক্ষণে তাহার ভিন্নতা অনুভব করিয়াছি।

দ্বিতীয় তিন প্রকার চিত্ত-বিমুক্তি অবস্থা। যথা,—(১) পূর্ব্বে সুখ-দুঃখের বোধরূপ বুদ্ধির বিকাশ ছিল, এক্ষণে তাহা আর নাই। (২) বুদ্ধি বিকাশের বীজ এক্ষণে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, আর অঙ্কুরিত হইবে না। (৩) পূর্ব্বে নানা বিষয়ের বিচার বুদ্ধি ছিল, এক্ষণে আর বিচার্য্য বিষয় কিছুই নাই। এক্ষণে চিত্ত শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অটল হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে দীপ্তিময়ী প্রজ্ঞা সপ্ত-স্তরে বিকশিত হইলে, অবিদ্যা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ প্রকৃতি-পুরুষের সমন্বয়ে সমাধিপথে যোগিবরের জীবন্মুক্তি অবস্থা উপনীত হয়।

"বিবেকচূড়ামণিতে" উক্ত হইয়াছে :—

বন্ধনাত্মক কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান প্রমাদ।

"ন প্রমাদানর্থোঽন্যো জ্ঞানিনঃ স্বস্বরূপতঃ।
ততোমোহস্ততোঽহংধীস্ততো বন্ধস্ততো ব্যথা॥"

জ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির স্বস্বরূপ বা ব্রহ্মভাবে যে প্রমাদ বা অনবধানতা, তাহা অপেক্ষা অনিষ্টকর আর কিছুই নাই। কারণ সেই প্রমাদ হইতে মোহ, মোহ হইতে অহংবুদ্ধি এবং অহংবুদ্ধি হইতেই বন্ধন। পরে সেই বন্ধন হইতেই উক্ত দুঃখ রাশির উৎপত্তি হয়। যেমন সাধকের তপস্যার প্রমাদে ক্রোধ, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, দান ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-প্রমাদে দম্ভ, উপাসনার প্রমাদে আলস্য বা অবসাদ উপস্থিত হয়, তেমনই জ্ঞানের প্রমাদে অহংকার

উৎপন্ন হয়। সুতরাং জ্ঞান-প্রমাদরূপ অহঙ্কার পুনঃ পুনঃ বন্ধনের কারণ জানিয়া মুমুক্ষু যোগীর সর্ব্বদা সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

সাধনপরায়ণ কঠোর তপস্বীদিগের যথাবিধি তপস্যার ব্যতিক্রমে স্বভাবতঃ ক্রোধ উৎপন্ন হয়, সেই ক্রোধই তপস্যার পতনের কারণ হয়; কর্ম্মীর দান-যজ্ঞাদি-অনুষ্ঠানের ফলে ও বুদ্ধি-বিচারের অভাবে স্বভাবতঃ দম্ভ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ আমি এমন দানী, আমি এত যজ্ঞাদি করিয়াছি ইত্যাদি, এই দম্ভই তাহার পতনের বা কর্ম্মবন্ধনের কারণ হয়; এইরূপ উপাসক ইষ্টদেবতায় নির্ভর করিতে করিতে উপযুক্ত গুরুর উপদেশের অভাবে সহসা ক্রমোন্নত উপাসনাও ত্যাগ করিয়া বসে, "ঠাকুর যা করেন তাই হইবে" ইত্যাদি প্রমাদ আসিয়া তাহাকে যেন নিষ্ক্রিয় বা অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। সুতরাং কর্ম্ম, তপ, উপাসনা ও জ্ঞানের সাধনায় প্রমাদ উপস্থিত হইলেই পতনের কারণ হইবে।

যাহাহউক সেই ভীষণ দুঃখপ্রদ বন্ধন বা পাশসমূহ যাহাতে কাটিয়া যায়, মোক্ষাভিলাষীর সেই বিষয়েই সতত প্রযত্ন করান বিধেয়। এই কারণেই শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন যে :—

"পাশবদ্ধোভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ (সদাশিবঃ) ভবেচ্ছিবঃ।"

সংসার-পাশ বা মায়াবন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হইলেই জীবের জীবত্বদশা উপস্থিত হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে এই অবস্থাকেই পশুভাব বলা হইয়াছে। পশু অর্থাৎ অজ্ঞান, যিনি অজ্ঞানতারূপ অষ্টপাশে আবদ্ধ, তিনিই পশু। অনন্তর পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে উক্ত ব্রহ্ম-শক্তি-জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সাধকের চিত্তে দৃঢ়তা জন্মিতে থাকে, তেমনি তিনি ধীরে ধীরে বীর, পরে দিব্যদশার মধ্য দিয়া ক্রমে সেই

বন্ধন বা পাশাষ্টক হইতে বিমুক্ত হইয়া সাধকপ্রবর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বা সাক্ষাৎ শিব-পদবাচ্য হইতে ...

শ্রীভগবান "ভৈরবযামলে" বলিয়াছেন, পাশ অষ্টবিধ। পূর্ব্বেও এ সকল কথা বলা হইয়াছে।

অষ্টপাশ রহস্য ও জীবন্মুক্তি।

"ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলঞ্চ মানঞ্চ অষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

তন্ত্রান্তরে আছে :—

"ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

প্রথম শ্লোকানুসারে ঘৃণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও মান এই আট প্রকার পাশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকানুসারে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি আর কুল শীল ও জাতি এই তিন অভিমান লইয়া আট প্রকার পাশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, জুগুপ্সা, কুল ও শীল এই ছয়টী সাধারণ আর উভয় শ্লোকের মধ্যে প্রথমোক্তের শঙ্কা ও মানের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণিত শোক ও জাতি বর্ণিত হইয়াছে। যাহাহউক তাহাতে বিশেষ আসিয়া যায় না। উহাদের মধ্যে সাধারণ ছয়টী পাশ অর্থাৎ ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, জুগুপ্সা, কুল ও শীল হইতে সাধক মুক্ত হইতে পারিলে অন্য গুলি আপনা আপনিই দূর হইয়া যায়। সে জন্য আর বিশেষ প্রযত্নের আবশ্যক করে না। এই কারণেই সাধারণ্যে এক প্রবাদ প্রচলিত আছে যে,

"ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়।"

বাস্তবিক উক্ত অষ্ট-পাশের মূল প্রথম তিনটী অর্থাৎ ঘৃণা লজ্জা

ও ভয়-বৃত্তি নিবৃত্তি হইলেই সাধকের অন্য সমস্ত বন্ধন আপনিই শিথিল হইতে থাকে। এক্ষণে উক্ত অষ্ট পাশের অর্থ বিষয়ে যাহা শাস্ত্রে কথিত আছে তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাউক।

(১ 'ঘৃণা' অর্থাৎ অত্যন্ত অশ্রদ্ধা। দুষ্ট, পাপাত্মা আদি কাহারও প্রতি বা কোনও বস্তুর প্রতি দয়া অথবা হেয় ও তুচ্ছবোধে অনুকম্পা বা অবজ্ঞা আদি ভাব প্রকাশ করাকে ঘৃণা বলা যায়। মুক্তিকামী সাধক ঘৃণাপাশে আবদ্ধ থাকিলে নরকগামী হইয়া থাকে।

(২) 'লজ্জা' অর্থাৎ কোন কর্ম্ম কাহারও নিকট, বিশেষ গুরুজনের নিকট সম্ভ্রম নষ্ট হইবার ভাব উপস্থিত হওয়া বা কোনও অপকর্ম্ম করিবার জন্য মনে মনে অপমান বোধ করাকে লজ্জা বলে। লজ্জাপাশে সাধকের সাধনা হানি ত হয়ই, তৎসঙ্গে তাঁহার ক্রমে অধোগতি হইতে থাকে।

(৩) 'ভয়' অর্থাৎ আত্মরক্ষাবিষয়ে হতাশ্বাস হইবার কারণে মনের আশঙ্কা; অথবা কোনও বিষয় দেখিয়া, বিশেষ শবসাধনাদি ক্রিয়ার সময়ে কোন অলৌকিক দৃশ্য দৃষ্টে মৃত্যুর আশঙ্কাকেও ভয় বলে। এই ভয় রূপ পাশ নষ্ট না করিতে পারিলে সাধকের কোন বিষয়ে সিদ্ধি হয় না।

(৪) 'জুগুপ্সা' অর্থাৎ নিন্দা বা আত্মপরকে অপমান করা। পিতামাতাদি গুরুজন বা দেবতান্তরের উপাসকদিগের প্রতি নিন্দা করাকে অথবা এক কথায় আত্মপর যে কোন নিন্দার নামই জুগুপ্সা। এই নিন্দা পাশে আবদ্ধ সাধকের ক্রমাগতই ধর্ম্ম-বিঘ্ন হয়।

(৫) 'কুল' অর্থাৎ বংশের অভিমান। জাতি ও স্ত্রীলোককে

কুল বলে। আমি এমন কুলের সন্তান, এইরূপ অভিমানকে কুল নামক পাশ বলা যায়। এই পাশে আবদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত সাধককে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ জন্য জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সুতরাং ইহাও মুক্তির ঘোর বিরোধী।

(৬) 'শীল' অর্থাৎ চরিত্রাভিমান। স্বভাব ও চরিত্রের নাম শীল, আমি এমন শীলবান, এইরূপ অভিমানকে শীল নামক পাশ বলা যায়। এই শীলপাশে আবদ্ধ সাধক মোহে অভিভূত হয়।

(৭) 'শোক' অর্থাৎ আত্মীয় বা বন্ধুবিচ্ছেদের জন্য মনস্তাপ। এবং প্রথমশ্লোকোক্ত 'শঙ্কা' অর্থাৎ মনের বিশ্বাসরাহিত্যভাব। কোন বিষয়ে, বিশেষ বেদাগম ও গুরুবাক্যে সর্ব্বদা সংশয়ভাব পোষণের নাম শঙ্কা। ইহাতেও সাধকের অধোগতি হয়।

(৮) জাতি - আপনার জাতির বা বর্ণের অভিমান। ইহাও কতকটা কুলাভিমানের অনুরূপ। এবং প্রথম শ্লোকোদ্ধৃত অষ্টম পাশ 'মান' অর্থাৎ বিবিধ ঐশ্বর্য্য-সিদ্ধিকর গর্ব্ব ও অভিমান। ইহাও আত্মোন্নতির অতীব বিঘ্নকর।

এই অষ্ট পাশেই আত্মা জীবরূপে আবদ্ধ। যখন এই সকল বৃত্তি ও অভিমান দ্বারা সাধকের চিত্তে কোন প্রকার বিকার উৎপাদন করিতে পারিবে না, তখনই জীব প্রকৃত পাশমুক্ত হইতে পারিবে, নতুবা,—

এতৈর্ব্বদ্ধঃ পশুঃ প্রোক্তো মুক্ত এতৈঃ সদাশিবঃ॥"

যিনি এই অষ্টপাশে আবদ্ধ তিনি পশুরই অনুরূপ এবং এই অষ্ট-পাশ হইতে যিনি মুক্ত তিনিই সাক্ষাৎ সদাশিব। অর্থাৎ তিনিই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। তাই পাশ-বিমুক্তির প্রার্থনায় এই

জীব-"সচ্চিদানন্দ" আপনমনে কাতর অন্তরে একদিন মূলতানে গাহিয়াছিল :—

"দেরে দে আমায় ভিক্ষা দে—
এ যাত্রা আমায় ছেড়ে দে॥
বহু দিন হোতে আমি মাতৃহারা,
মা বিহনে আমি হতেছি যে সারা।
মা আমার কোথা জানিস্ যদি তোরা,
দয়া কোরে আমায় বোলে দে॥
মা আমার আদ্যা আদিভূতা মায়া,
তিনিই ত জগৎ-তারিণী তুরীয়া।
তাঁরে চিনেছে যাঁহারা বিমুক্ত তাঁহারা,
তাঁদেরই সাথে আমায় যেতে দে।
শ্রীগুরুর আদেশ আশা হৃদিভরা,
মা আমার ঐ দিতেছেন যে সাড়া॥
শেষ সাধে বাদ সাধিস্‌নে গো তোরা,
মায়ের কাছে আমায় যেতে দে॥
অষ্ট-পাশে বদ্ধ জীব যে আমরা,
সাধ্য কার মাগো তাহে মুক্ত করা।
ভববন্ধনহরা তুই গো মা পরা,
সচ্চিদানন্দের পাশ কেটে দে॥

"শ্রীভাগবতপুরাণে" কথিত হইয়াছে :—

"নির্ব্বেদ আশা পাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসি।
নহ্যসংজাতনির্ব্বেদো দেহবন্ধং জিহাসতি॥

পুরুষের আশাপাশ বিনাশ করিবার পক্ষে বৈরাগ্যই একমাত্র

অসিস্বরূপ। যাঁহার বৈরাগ্য জন্মে নাই, তিনি মায়ার আধার এই জীব-দেহ-বন্ধন হইতে কিছুতেই মুক্ত হইতে পারেন না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশে বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে যে, সাধনাদির দ্বারা মনোস্থিরতা প্রাপ্ত হইলেই চিত্তের বৃত্তি শূন্য হয়, তখন বিজ্ঞান ও বাসনাসমূহ আপনা আপনি ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই বাসনা ক্ষয় হইলেই আর কোনও বিষয়ে স্পৃহা থাকে না; সুতরাং আত্মার আর তখন কোনরূপ বন্ধন থাকে না, সেই বন্ধন-শূন্য আত্মাই তখন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। অনাত্ম বা মিথ্যা বাসনাসমূহ সর্ব্বদা পরমাত্ম-বাসনাকে আবৃত করিয়া রাখে, সেই কারণ সতত আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা সেই অনাত্ম-বাসনাগুলিকে বিনষ্ট করিতে না পারিলে পর-বাসনা স্বয়ং প্রকাশ হইতে পারে না। সেই কারণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, সংসার কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে, উর্দ্ধলোক-বাসনা' 'শাস্ত্র-বাসনা' ও 'দেহ-বাসনা' নামক ত্রিবিধ বাসনা-রূপ শৃঙ্খল উন্মোচন করিতে হইবে। তাই "মুক্তিকোপনিষদে" কথিত হইয়াছে :—

"হৃদয়ে নষ্ট সর্ব্বেহো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥"

হৃদয়ের বাসনা সকল নষ্ট হইলেই আত্মা মুক্ত হইয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে এই মুক্তির ভেদ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে নানা মুনির নানা মত প্রসিদ্ধ ও লিপিবদ্ধ আছে। যিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়া মুক্তি পদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছেন বা মুক্তির সম্ভাবনা অনুভব করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সেই সাম্যা-বস্থাময়ী ত্রিগুণাত্মিকা মহামায়া বা মূলপ্রকৃতির যত সমীপবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন, তিনি তাহাই ততদূর সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীগুরুপ্রসাদে ভক্তি, কর্ম্ম বা জ্ঞান-প্রধান

কোনও না কোন সাধনোপাসনার দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া পরমাত্মায় আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই বা তাঁহার সহিত একাকার হইতে পারিলেই, সর্ব্ববাদিসম্মত মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

এই মুক্তি যে চতুর্ব্বিধ, তাহাও পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে। শ্রীভগবান স্বয়ং ব্রহ্মা, সনৎকুমারের প্রতি উপদেশ করিতেছেন :—

"মুক্তিস্তু শৃণু মে পুত্র সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধাং।
সাল্যোক্যং লোক প্রাপ্তিঃ স্যাৎ সামীপ্যং তৎসমীপতা॥
সাযুজ্যং তৎস্বরূপত্বং সার্ষ্টিস্তু ব্রহ্মণো লয়ং।
ইতি চতুর্ব্বিধা মুক্তির্নির্ব্বাণঞ্চ তদুত্তরং॥
জীবে ব্রহ্মণি সংলীনে জন্মমৃত্যু বিবর্জ্জিতা।
যা মুক্তিঃ কথিতা সদ্ভিস্তন্নির্ব্বাণং প্রচক্ষ্যতে॥"

পুত্র! আমি সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তির বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। উপাস্য বা নিজ ইষ্টদেবতার লোকে বাস করিবার অধিকার প্রাপ্তির নাম সালোক্য, সদা তাঁহার সমীপবর্ত্তী থাকিবার অবস্থা প্রাপ্তিকে সামীপ্য, তাঁহারই ন্যায় রূপ-প্রাপ্তির নাম সারূপ্য এবং তৎস্বরূপে অবস্থিতি বা হিরণ্যগর্ভাদির দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ তাহাতে লীন হইয়া দৈবী-বিষয় ভোগ করার নাম সাযুজ্য এবং সগুণ ব্রহ্মের মূর্ত্তিভেদে উপাস্য বা ইষ্টদেবতার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া তাঁহাতে লয় হইয়া যাইবার নাম সার্ষ্টি-মুক্তি। এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির পর জীবাত্মার নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। তখনই জীবের জন্ম-মৃত্যুরূপ পুনরাগমন-বৃত্তি বিনষ্ট হয়। পরব্রহ্মে এই ভাবে বিলীন হওয়াকেই নির্ব্বাণমুক্তি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। শ্রীভগবান মহেশ্বর রাঘবকে বলিয়াছেন :—

"সালোক্যমপি সারূপ্যং সার্ষ্টিং সাযুজ্যমেব চ।
কৈবল্যঞ্চেতি তাং বিদ্ধি মুক্তিং রাঘব পঞ্চধা।

হে রাঘব, মুক্তি পাঁচ প্রকার, যথা—সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য এবং কৈবল্য। ইহার মধ্যে পঞ্চম অন্তিম বা শেষ মুক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"যস্তু শান্ত্যাদিযুক্তঃ সন্মামাত্মত্বেন পশ্যতি।
স জায়তে পরং জ্যোতিরদ্বৈতঃ ব্রহ্ম কেবলম্।
অতঃ স্বরূপাবস্থানং মুক্তিরিত্যভিধীয়তে॥"

যিনি শান্ত্যাদি গুণযুক্ত হইয়া আমাকে আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করেন, তিনি পরমজ্যোতিঃস্বরূপ অদ্বৈত কেবল ব্রহ্মরূপে সম্পন্ন হয়েন। তাই বলিয়াছেন, ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিতির নামই কৈবল্য বা পরম মুক্তি। সালোক্যাদি মুক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক বারই বলা হইয়াছে, তাহা কেবল উপাসনা বিশেষের ফলশ্রুতি বা সাধনসিদ্ধ মুক্তি-সৌধের ক্রমোন্নত সোপান মাত্র। প্রকৃত নির্ব্বাণ বা কৈবল্য-মুক্তি, উল্লিখিত সকল মুক্তিরই উপরিস্থিত সর্ব্বোচ্চ সোপানস্তর বা সাধনসৌধের একমাত্র চূড়াস্বরূপ। বেদান্তবাক্যেও উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতির নামই এক মাত্র মুক্তি"। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই স্বরূপ অবস্থায় ইহা অনুভব করিতে পারেন। এই কারণ শাস্ত্রে জীবন্মুক্তকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা হইয়াছে। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্দত্তাত্রেয়দেব বলিয়াছেন :—

"গর্ভধ্যানেন পশ্যন্তি জ্ঞানিনাং মন উচ্যতে।
সোঽহং মনো বিলীয়ন্তে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

মানসিক চিন্তা-সহযোগে জ্ঞানীদিগের অন্তরের মধ্যেইযে আত্ম-দর্শন হয়, তাহাকেই মন কহে। সেই মনই জীবাত্মা নামে অভি-

হিত হয়। সেই বায়ুসদৃশ মন আকাশস্বরূপ অনন্ত পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়। আমিই সেই পরমাত্মা, যিনি এই প্রকার জানেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন। ব্রহ্মাণ্ড ও আত্মা উভয়ই পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় পরস্পর নির্লিপ্ত অথচ ইহাদের মধ্যে কোনপ্রকার বিচ্ছিন্নতা নাই। যিনি ইহা স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। অন্যত্র উক্ত মহাপুরুষ বলিয়াছেন :—

"জীবঃ শিবঃ সর্ব্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
এবমেবাভিপশ্যন্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান এই যে জীবসমষ্টি দেখিতে পাইতেছ, ইনিই সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। কারণ একমাত্র সর্ব্বব্যাপী নিরাকার পরব্রহ্মই চৈতন্যস্বরূপে সর্ব্বদেহে সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই ভাবে যিনি সর্ব্বত্র একমাত্র পরমাত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে যিনি দর্শন বা অনুভব করিতে পারেন, তিনিই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া জানিবে।

এই অনির্ব্বচনীয় জীবন্মুক্তির অবস্থা-বিচার-বিষয়ে শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে যে,—

"পূর্ব্বং বদ্ধোঽধুনামুক্তোঽস্ম্যহমিত্যেব বন্ধনাৎ।
যদি মন্যেত বৈ দেহী ন মুক্তিং প্রাপ্তবাংস্তু সঃ॥"

পূর্ব্বে আমি বদ্ধ ছিলাম, এক্ষণে মুক্ত হইয়াছি, যিনি এইরূপ মনে করেন, তিনি তখনও প্রকৃত বিদেহ বা কৈবল্য-মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। অথবা

"পূর্ব্বমপ্যভবন্মুক্তো মধ্যে ভ্রান্তিস্তু বদ্ধবৎ।
যদি মন্যেত বৈ দেহী ন মুক্তিং প্রাপ্তবাংস্তু সঃ॥

বন্ধ্যাপুত্রাদিবৎসর্ব্বমপ্যভূদসদিত্যপি।
যদি মন্যেত বৈ দেহী ন মুক্তিং প্রাপ্তবাংস্তু সঃ॥
আবিদ্যকং তমোধ্বস্তং স্বপ্রকাশেন বা ইতি।
যদি মন্যেত বৈ দেহী ন মুক্তিং প্রাপ্তবাংস্তু সঃ॥
স্বপ্নেঽপি নাহং ভাবোঽস্তি মমদেহেন্দ্রিয়াদিষু।
যদি মন্যেত বৈ দেহী ন মুক্তিং প্রাপ্তবাংস্তু সঃ॥”

পূর্ব্বেও আমি মুক্ত ছিলাম, মধ্যে কেবল ভ্রান্তিবশতঃ বন্ধের ন্যায় হইয়াছিলাম, এরূপ যিনি মনে করেন, অথবা যিনি নিজেকে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় আমার সমস্তই অসৎ হইয়া গিয়াছে মনে করেন, কিম্বা যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে আমার আর অহংভাব নাই, এরূপ স্বপ্নেও চিন্তা করেন, তাঁহার যথার্থ বিদেহ-মুক্তি-প্রাপ্তি এখনও হয় নাই। অর্থাৎ এ সকল ভাবনাও কৈবল্য-মুক্তির নিম্নেরই অবস্থা। কারণ এখনও দেহীরূপে চিন্তা বিদ্যমান রহিয়াছে, অহংভাবের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে।

“অরূপনষ্টমনসো বিদেহত্বং প্রকীর্ত্ত্যতে।
তৎ কথং মন্যমানস্য যৎ কিঞ্চিৎ স্যাদনাত্মনঃ॥”

যাঁহার রূপ ও মন উভয়ই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মরূপ মহার্ণবে যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, তিনিই যথার্থ বিদেহ বা কৈবল্য-মুক্তি-প্রাপ্ত মহাপুরুষ। নতুবা কেবল চিন্তামাত্র দ্বারাই যিনি মনে করেন যে, আমি বিদেহ মুক্ত, এরূপ অনাত্মার সেই অনির্ব্বচনীয় বিদেহ-পদ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সেই বিদেহ-মুক্তিরূপ নির্ব্বাণের অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থায় নিত্যানিত্য-বস্তু-বিচার-সম্বন্ধে ভগবান শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন :—

"মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং, নচ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবো-
ঽহম্।
ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ুর্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্‌পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ূ শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্
শিবোঽহম্॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং, ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা
ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবো-
ঽহম্ শিবোঽহম্॥
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ, মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্য-
ভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্
শিবোঽহম্॥
"ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে মাতা চ জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবো-
ঽহম্।
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো, বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বাবন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবো-
ঽহম।

আমি মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, চক্ষু, আকাশ, ভূমি, তেজ কিম্বা বায়ুও নহি, আমি চৈতন্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ সেই শিব বা ব্রহ্ম।

আমি প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামক পঞ্চবায়ু নহি। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র নামক সপ্ত ধাতু নহি। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামক পঞ্চকোষ নহি এবং বাক্য, পাণি, পদ, পায়ু ও উপস্থও নহি। আমি চৈতন্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ শিব বা ব্রহ্ম।

আমি পুণ্য, পাপ, সুখ, দুঃখ, মন্ত্র, তীর্থ, বেদ, যজ্ঞ, ভোজন ভোজ্য বা ভোক্তাও নহি, আমি সেই একমাত্র জ্ঞান, চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ শিব বা ব্রহ্ম।

আমার দ্বেষ, রাগ (অনুরাগ), লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য-ভাবও নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম কিম্বা মোক্ষও নাই, আমি জ্ঞান-চৈতন্যস্বরূপ আনন্দময় শিব বা ব্রহ্ম।

আমার মৃত্যু, শঙ্কা, জাতিভেদ, পিতা, মাতা, জন্ম, বন্ধু, মিত্র, গুরু কিম্বা শিষ্য কিছুই নাই, আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব বা পরব্রহ্ম।

আমি নির্ব্বিকল্প, নিরাকার, সকল ইন্দ্রিয়ের বিভু ও সর্ব্বব্যাপী। আমার বন্ধন, মুক্তি কিম্বা ভয় কিছুই নাই, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ শিব পরব্রহ্ম।

বেহাগ—একতালা।

"মন আর (বৃথা) বিষয়ানন্দে মজো না॥
স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপী, অন্নাদি পঞ্চকোষব্যাপী,
পঞ্চভূত সপ্তধাতু তন্মাত্রাদি তারই সাথী,
মন বুদ্ধি চিত্ত আর অহঙ্কার কার হেরনা।
মন আর বিষানন্দে মজো না॥
ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ড ভেদ রচনা, সমষ্টি ব্যষ্টি তার তুলনা,

ব্রহ্মাণ্ডেতে যা বিরাজে, পিণ্ডতেই তাই দেখনা।
মন আর বিষয়ানন্দে মজো না ॥
(এই) স্থূল ব্যাপিয়াই সূক্ষ্ম আছে, স্থূল ছাড়িয়া যাও
তাঁরই কাছে,
আত্মারামে স্থিত হয়ে আত্মানন্দে থাক না।
মন আর বিষয়ানন্দে মজো না ॥
ব্রহ্মানন্দে লক্ষ্য রাখি, "সচ্চিদানন্দ" স্বরূপে থাকি
নির্ব্বিষয় নিত্যবস্তু, স্থির চিত্তে তাই ভাব না,
মন আর বিষয়ানন্দে মজো না ॥"

অহরহঃ এইরূপ বিচার সাধনাদ্বারা অবিদ্যারূপ আবরণ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করণানন্তর আত্মমুক্তি লাভ করিতে হইবে।

ওঁ হংসঃ পরমশিব ওঁ ॥

—॰—

(কাজের লোক)—"*** এমন গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করেন নাই। ** একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। (সাহিত্য-সংবাদ)—"*** ইহা পাঠে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয়, বিষয়-বিন্যাস কৌতূহল-প্রদ।" *** (ব্রহ্মবিদ্যা)—"যিনি বহু বৎসর কাশীতে বাস করিয়া স্থানীয় তথ্য সকল নিজে আয়াসসহ অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যে অন্যদৃষ্ট ও অন্য-লিখিত বিবরণের অনুবাদাদি অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য ও সত্য, তাহার সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে অবশ্য-জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ের অভাব দেখিলাম না। ***" (বঙ্গবাণী)—"** এককথায় ইহা কাশীর ইতিহাস ও কাশীযাত্রীর "গাইড-বুক"; *** ("THE BENGALI," 33-1-12)—"The book is full of valuable information about the sacred city—information which we believe would be both interesting and instructive to all lovers of antiquity and particularly to patriotic Hindus." ("INDIAN DAILY NEWS" 10-9-12.)—"This is an illustrated guide book to Benares in Bengali ***which cannot fail to be of use to Bengali pilgrims to that Holy City. ("AMRITA BAZAR PATRIKA." 7-10.12) —"***The reader will find in the book detailed descriptions of not only all the temples, wells, ghats, muths, mosques, and other relics of antequarian interest but also of all the modern institutions which have added lustre to the fair fame of the fascinating city. There are also in the book elaborate accounts of the various religious sect with.

their institutions, that have established themselves in the city. The book contains various illustrations. ***In the accounts which the learned author has given, he has left nothing unsaid and the most minute objects of interest have not escaped his observant eye. The language is chaste, lucid and dignified, and the general get-up of the bock excellent.***("THE TELEGRAPH")—"**A topographical review of Kasi and its surroundings. When we say topographical we do not imply thereby that he has written only notes on the Holy City as regards its geography but an exhaustive and interesting history, social, religious and political, of Benares with minute description an accounts of places of interest. ***It has one great attraction, we mean, it never tries the patience of readers ; we think it is valuable as a book of reference and useful to all intending pilgrims to the Holy City."

বর্ণচিত্রণ 'পেন্টিং' বা চিত্র-শিল্প-বিষয়ক অপূর্ব্ব গ্রন্থ, সৎসাহিত্যের ন্যায়ই ইহা সকলের সুখ-পাঠ্য ও উপভোগ্য।

ইহাও উক্ত আচার্য্য-প্রবর প্রবীন সাহিত্যিক সাহিত্যকলা বিদ্যার্ণব মহাশয় প্রণীত একখানি অসাধারণ পুস্তক। মূল্য—বিলাতি বাঁধাই ১৲ টাকা মাত্র।

'বর্ণচিত্রণ'-সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :—

(বঙ্গবাসী)—"কেবল চিত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞতা থাকিলে, গ্রন্থ-রচনা হয় না, সাহিত্য-রচনায় শক্তি থাকা চাই। শ্রদ্ধেয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাহিত্য-রচনায় চিরকুশল। তুলিকায় যে ছবি উঠে, লেখনীতে তাহা ফুটাইতে হইলে, সাহিত্য-রচনা-শক্তির প্রচুর প্রয়োজন হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুই শক্তিই দীপ্তিময়ী। এই আলোচ্য-গ্রন্থ চিত্রসম্বন্ধে আদর্শ-গ্রন্থ হইয়াছে। চিত্রবিদ্যায় যাঁহাদের ঝোঁক, তাঁহাদের কাছে ইহার আদর ত হইবেই, **সাহিত্য হিসাবেও প্রত্যেক বাঙ্গালীর ইহা আদরণীয়। এক কথায় বলি, বাঙ্গালায় এমন গ্রন্থ নাই বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না।"** (**ব্যবসায়ী**)—"*** সকলকেই এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।" (**এডুকেশন গেজেট**)—"এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম। ভারতীয় শিল্পকলার সঞ্জীবনের ইতিহাসে এই পুস্তকখানি ভবিষ্যতে স্মরণীয় হইবে। *** গ্রন্থকার শ্রেষ্ঠশ্রেণীর লোক। **" **সাহিত্য-সংবাদ**)—"*** গ্রন্থখানিকে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের চিত্রবিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' বলিলেও বলা যাইতে পারে। চিত্রশিক্ষার্থী এই পুস্তকের সাহায্যে চিত্রশিক্ষার বহু তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। বাঙ্গালা ভাষায় এ শ্রেণীর পুস্তক বিরল। প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবম্বিধ গ্রন্থ প্রণয়নে বাঙ্গালা-সাহিত্যের এক দিকের বিশেষ অভাব পূরণ করিতেছেন। ***" ("THE

ফটোশিল্পীই এই পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষার ইহাই আদি ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক বিলাতি বাঁধাই মূল্য ৷৵০ বার আনা মাত্র।

'আলোকচিত্রণ' সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :—

(হিতবাদী)—"ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। *** "শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপযুক্ত।" (বঙ্গবাসী)—"যাঁহারা ফটোগ্রাফি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ উপযোগী।" (সময়)—"এ শ্রেণীর পুস্তক এই নূতন।" (বান্ধব)—"*** চক্রবর্ত্তী মহাশয় একই আধারে বিখ্যাত শিল্পী ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক। সুতরাং সাহিত্যসেবী ব্যক্তিমাত্রেরই সাদর-পূজাস্পদ সুহৃদ। এদেশে ইদানীং বাঙ্গালীর জাতীয়-সাহিত্যের একটী বিরাট প্রতিমা ধীরে ধীরে গঠিত হইতেছে। তাঁহার ন্যায় সূক্ষ্ম-শিল্পীরা 'আলোকচিত্রণ' প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারা সূক্ষ্ম-শিল্পের যে সকল তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন, তাহা সে প্রতিমার বিশেষ অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিবে।

ছায়াবিজ্ঞান বা ফটোগ্রাফি শিক্ষার ২য় পুস্তক। (৪র্থ সংস্করণ) অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাও উক্ত আচার্য্যপ্রবর চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রণীত। 'আলোকচিত্রণে' যে সকল বিষয় নাই, 'ছায়াবিজ্ঞানে' তাহাই বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ফটো-শিক্ষার্থীর ইহাও বিশেষ প্রয়োজনীয় পুস্তক। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

ঠাকুরমা "ইহাও সাহিত্যকলাবিত্মার্ণব চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রণীত স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক অতি উপাদেয় উপহার পুস্তক। (দ্বিতীয় সংস্করণ) আমূল সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। মূল্য-বিলাতি বাঁধাই ৷৹ আট আনা মাত্র।

'ঠাকুরমা' সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :—

(**বঙ্গবাসী**)--"গ্রন্থকার বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। বাঙ্গালী পাঠক ইহার লিপিপটুতার পরিচয় পাইয়াছেন। সাহিত্যের রচনায় ইহার শিল্প-নৈপুণ্য উজ্জ্বল। এখানকার অনেক মেয়ে, শিক্ষা ও সদুপদেশের অভাবে, পরন্তু কু-শিক্ষার প্রভাবে বিগড়াইয়া যায়। ঠাকুরমার শিক্ষাপ্রভাব কমিতেছে, পাশ্চাত্য হাওয়ার তেজ বাড়িতেছে; কাজেই এখনকার মেয়েরা সেই হাওয়ায় উপদেবতা-গ্রস্ত হইতেছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তাহাদিগকে "সায়েস্তা" করিবার উদ্দেশ্যে, এই 'ঠাকুরমা' গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থে ঠাকুরমার সঙ্গে নাতিনীর কথোপকথন। ঠাকুরমা বেশ সোজা সরল ভাষায় নাতিনীকে গৃহস্থালীর অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি শিখাইয়া দিতেছেন। *** এই সব বিষয়ের রচনা পড়িতে পড়িতে লিপিমাধুর্য্যে মনে হয়, যেন উপন্যাস। এ দুর্দ্দিনে এরূপ পুস্তকের প্রকাশে আনন্দ। **এ গ্রন্থ সাদরে পাঠ্য।**" (**সময়**)—পুস্তকখানি স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানগর্ভ ও জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ। শুধু শিক্ষাপ্রদ বলিয়াই যে, এ গ্রন্থের প্রশংসা করিতেছি, তাহা নহে। পুস্তক-খানি সুলিখিতও বটে। **বালিকা-বিদ্যালয়ে বালিকা-দিগের পাঠ্যরূপে এই পুস্তক নির্ব্বাচিত**

হইলে যে খুবই ভাল হয়, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। বিলাস-ব্যাধি আমাদের শুদ্ধান্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। এ অবস্থায় এরূপ গ্রন্থ গৃহে গৃহে বালিকাদের পাঠ করান কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থ পড়িয়া ইহার উপদেশ অনুসারে চলিতে পারিলে, গৃহস্থ-সংসারের স্বাস্থ্য অনেকটা ফিরিতে পারে, সংসার অনেক অসুবিধার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে *।"

(**কাজের লোক**)—"একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দু-স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক। বালিকা বয়স হইতে প্রসূতি অবস্থা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের যাহা কিছু সাংসারিক বিষয় জানা আবশ্যক, ঠাকুরমার উপদেশে তাহার কোনটীই বাদ পড়ে নাই। "ঠাকুরমা" আমাদের আধুনিক মহিলাগণের পরিচালিকাস্বরূপ হইলে, সংসারে যে শান্তি বিরাজ করিতে পারিবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।***"ঠাকুরমা" অত্যাবশ্যকীয় উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীপাঠ্য মধ্যে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

("THE TELEGRAPH")—" * * Highly recommend this book. ** * for a text-book in all Hindu Girls' Schools in the Province." ("THE INDIAN STUDENT.') —" * * * It is very useful and instructive to the females for whom it is specially intended."

প্রসিদ্ধ সাধন ও যোগ-বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীমৎ পরমহংস স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত সাধন-বিষয়ক অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী।

মন্ত্রাদি চতুর্ব্বিধ যোগ-তন্ত্র ও সাধন-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এরূপ সরস ও উপাদেয় পুস্তকাবলী ইতঃপূর্ব্বে আর কোন ভাষাতেই লিপিবদ্ধ

হয় নাই। সাধনার দুজ্ঞেয় তত্ত্বসমূহ যাহা তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট ভিন্ন জানিবার উপায় নাই, তাহারই গূঢ় আভাষ এই সমস্ত গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। **প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধক-সমাজে উচ্চভাবে প্রশংসিত।**

—ঃ০ঃ—

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর গ্রন্থাবলীঃ—

সাধনপ্রদীপ। [সনাতন সাধন-তত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য (১ম খণ্ড)]। (তৃতীয় সংস্করণ)—আমূল সংশোধিত ও নব নব বিষয়সংযোগে বিশেষভাবে পরিবর্দ্ধিত। স্বর্ণাক্ষর-লিখিত সুন্দর বিলাতিবৎ বাঁধান ও **শ্রীশ্রীদক্ষিণা-কালিকার সুরঞ্জিত সুন্দর চিত্রসহ,** মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সাধনপ্রদীপ সম্বন্ধে অভিমত—

(**'এডুকেশন গেজেট'**)—"এই পরম উপাদেয় পুস্তকখানি ঠিক সময়েই মহামায়ার কৃপায় বঙ্গভূমিতে প্রচারিত হইল, ইহা পাঠে কলির বেদ আগম-শাস্ত্র-সম্বন্ধে ভ্রম-ধারণা সকল দূর হইবে এবং বাঙ্গলায় পুনরায় 'স্মরহর সমান ক্ষিতিতলে' বীরপুরুষদিগের আবির্ভাবের পথ মুক্ত হইবে। ***এই পুস্তকের কথাগুলি***সযত্নে পাঠ করা উচিত***।"

(**'হিতবাদী'**)—"গ্রন্থপ্রণেতা দুরবগাহ তন্ত্রসাগরের পরিচয় রাখেন, তন্ত্রের **এমন ব্যাখ্যা-পুস্তকের যথেষ্ট প্রচার হওয়া ভাল।**"

("THE TELEGRAPH")—"It is a treatise on the fundamental principles of Hindu religion. * * * The manner in which the book has been dealt with by the author is highly commendable. He is a profound thinker and an expounder of the difficult and intricate problems of religion. We gladly admit that it is a happy production of its kind and we recommend it to every member of the Hindu household * * *

('সময়')—"জটিল ও নীরস বিষয়সকলও সরল ও সরস করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা স্বামীজির যথেষ্ট পরিমাণে আছে। যুক্তি-তর্কের সমাবেশ ও লিখনপ্রণালীর গুণে সত্য সত্যই পুস্তকখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ('মেদিনীপুর হিতৈষী')—গ্রন্থখানি সাধকের লিখিত—সাধনার সামগ্রী, ভক্তির অভিব্যক্তি। **যাঁহারা তন্ত্রকে ঘৃণা করেন, আধুনিক বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহারা একবার পাঠ করুন,** একবার তন্ত্র কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করুন—আত্মহারা হইবেন, দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন।"

('ব্রহ্মবিদ্যা')—"*** এই গ্রন্থে তন্ত্রের সেই মৌলিক মহান্ উদারতার বিষয় আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত জনগণেরও উপযোগীরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থকার সিদ্ধ-সাধক; নতুবা এরূপ সহজে বোধগম্যভাবে তন্ত্রতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার শক্তি

অপরের হইতে পারে না। পুস্তকখানি সকলকেই একবার পড়িতে অনুরোধ করি।”

পূজ্যপাদ উক্ত স্বামীজী মহারাজের প্রণীত নিম্নলিখিত অন্যান্য পুস্তকগুলির সমালোচনা স্থানাভাবে আর প্রদত্ত হইল না।

গুরুপ্রদীপ [‘সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য’ ২য় খণ্ড] দ্বিতীয়সংস্করণ—সংশোধিত ও সম্বর্দ্ধিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে দীক্ষা-অভিষেক এবং যোগাদি সাধনার ক্রমোন্নত বিধান ও তাহার গূঢ় রহস্যসমূহ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রী৺তারাদেবীর সুরঞ্জিত চিত্রসহ সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

জ্ঞানপ্রদীপ (১ম ভাগ) ঃ—[‘সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য’ (৩য় খণ্ড)] পঞ্চদেবতার ত্রিবর্ণ-চিত্রসহ সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১৲০ পাঁচ সিকা মাত্র। ‘সনাতনধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা’, ‘যোগসমাহার’, ‘মন্ত্রযোগ’, ‘হঠযোগ’, ‘লয়যোগ’, ‘রাজযোগ’, পূর্ণদীক্ষাদি’, ও ‘বৈরাগ্য’-সম্বন্ধে এরূপ সরল, বিস্তৃত ও ক্রমোন্নত সাধন-বিজ্ঞানযুক্ত ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তকেই প্রকাশ হয় নাই। “তত্ত্বাভিলাষী মুমুক্ষু সজ্জনগণ গ্রন্থস্থিত উপদেশরূপ স্থির প্রদীপালোকে আত্মদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন।”

যোগবিজ্ঞান সহ উপাসনাক্রম বা পূজাপ্রদীপ [সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য (৬ষ্ঠ খণ্ড)] বঙ্গবাসী' আদি সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত। যোগ ও সাধন-বিজ্ঞানপূর্ণ এমন উপাদেয় উপাসনা-গ্রন্থ কস্মিনকালেও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা সিদ্ধ-গুরুমণ্ডলীর অমূল্যদান! সনাতন-ধর্ম্মের এ হেন দুর্দ্দিনে এই অসাধারণ গ্রন্থের প্রকাশ কেবল শ্রীশ্রীইষ্টগুরুর অপার করুণার নিদর্শনমাত্র। ইহার বর্ণনা ভাষায় চলে না, প্রকৃত সাধনাভিলাষী ভক্ত-জনের কেবল অন্তরের আনন্দ ও অনুভূতির বিষয়! 'ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের প্রথম-কৃত্য' হইতে 'অহোরাত্রির নিত্য-কর্ম্ম' ও নৈমিত্তিকাদি আজীবন-সাধনার অতীব গূঢ়যোগরহস্যপূর্ণ প্রকৃত অনুষ্ঠান ও উপদেশসমূহ' সহজবোধ্য-ভাষায় কথিত হইয়াছে। ইহা সাধকমাত্রেরই অপরিত্যাজ্য নিত্য-ধন, চিরজীবনের সঙ্গের সাথী; ইহাতে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার স্বামিজীমহারাজের কৃপাদেশক্রমে যথাযথবর্ণে রঞ্জিত বিচিত্র ও বিশুদ্ধ 'ষট্‌চক্র চিত্র', 'ষট্‌চক্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাদিগের চিত্র', কামিনীদেবীর সুরঞ্জিত অদ্ভুত চিত্র', 'আসন-মণ্ডল', 'গুরুপাদুকা', বিবিধপ্রকার 'করমুদ্রা' 'সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল', নানা দেবদেবীর 'মন্ত্র' 'হোমকুণ্ডাবলী', 'স্থণ্ডিল যন্ত্র', 'ত্রিশূলদণ্ড', 'শব্দব্রহ্ম', 'গুরুমূর্ত্তি' ও 'আত্মলয়াদির' বিপুল চিত্রাবলীর অদ্ভুত সমাবেশ হইয়াছে। প্রায় সাড়ে চারিশত পৃষ্ঠারও অধিক বিরাট অদ্বৈত-গ্রন্থ। মূল্য সুন্দর বাঁধাই ২।০ নয়সিকা মাত্র।

পুরশ্চরণ প্রদীপ [সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য (৭ম, খণ্ড)] ইহা 'পূজাপ্রদীপেরই' শেষ-অঙ্গস্বরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে মন্ত্র-পুরশ্চরণ-সম্বন্ধীয় মন্ত্রচৈতন্য,

কুণ্ডলিনী জাগরণ ও যোগবিজ্ঞানমূলক সাধন-রহস্যপূর্ণ সমস্ত কথাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইহাতে চাতুর্মাস্যব্রত-বিধান, যোগিরোগ-চিকিৎসা, স্বরোদয়-শাস্ত্রোক্ত স্বাস্থ্য ও ক্রিয়াবিধান, পঞ্চতত্ত্বাদির অনুগত মানবপ্রকৃতি, রোগাদি-শান্তিকর সিদ্ধমন্ত্র ও ঔষধাবলী এবং বিবিধ-বিষয়যুক্ত বিস্তৃত পরিশিষ্ট-সম্বলিত হওয়ায় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থাদি সকল-আশ্রমীর পক্ষেই পরম উপাদেয় বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহাও মন্ত্রাদি-যোগীর অপরিত্যাজ্য নিত্যধনরূপে আজীবন সঙ্গের সাথী। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কাশীমাহাত্ম্য (দ্বিতীয় সংস্করণ) ইহাতে কাশী পঞ্চক-স্তোত্র, কাশীমাহাত্ম্য, কাশীর মৃত্তিকা ও গঙ্গাস্নান-মাহাত্ম্য, বিশ্বেশ্বরের ধ্যান, প্রণাম, শ্রীকাশীদেবীর ধ্যান, বিশ্বেশ্বরের আরতি-স্তোত্র, কালভৈরবাষ্টক, নিত্যযাত্রা, অন্নপূর্ণা-ধ্যান, প্রণাম, প্রার্থনা, অন্তর্গৃহী-যাত্রা, পঞ্চক্রোশী-যাত্রাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কাশীবাসী ও কাশীযাত্রী সকলের অতি আদরের ধন। মূল্য ৶৹ তিন আনা মাত্র।

ঠাকুর সদানন্দ সাধক-চূড়ামণি পরমহংস-প্রবর পূজ্যপাদ ঠাকুর শ্রীমদ্ সদানন্দ সরস্বতীজী মহারাজের অসাধারণ জীবন-বৃত্তান্ত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র 'ভারতবর্ষ' আদিতে উচ্চপ্রশংসিত অতি উপাদেয় গ্রন্থ, সকলেরই ইহা শ্রদ্ধা ও সমাদরে পাঠ্য। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ॥৵৹ দশ আনা মাত্র।

বিহারীবাবা বা মৌনীবাবা। পরমহংসপ্রবর শ্রীমৎ বিহারীবাবার 'জীবনামৃত'।

কাশীর দশমাশ্বমেধ ঘাটে যে প্রসিদ্ধ পরমহংস মৌনীবাবা বা বিহারী বাবা নামে পরিচিত হইয়া সতত দিগম্বর বিশ্বনাথের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। যাঁহার সুন্দর শঙ্খ মর্ম্মর মূর্ত্তি এখনও দশাশ্বমেধ ঘাটে তাঁহার আশ্রম মন্দির প্রতিষ্ঠিত, সেই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব ও অসাধারণ জীবন বৃত্তান্ত, পড়িতে পড়িতে চমৎকৃত ও আত্মহারা হইতে হয়। প্রায় আড়াইশত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ গঙ্গাধর বাবার অপূর্ব্ব জীবন কথা।

আদর্শ মহাপুরুষের জীবনী সকলেরই সমাদরে পাঠ্য। বিশেষ পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ ঠাকুর সদানন্দ ও বিহারী বাবা আদি জীবন কথা-প্রসঙ্গে সামাজিক, নৈতিক, ধার্ম্মিক ও প্রসিদ্ধ তীর্থাদি সম্বন্ধে এমন সুন্দর ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন যে, ইহা উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ন্যায় সকলেরই শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

'গুরুমণ্ডলীর' ফটো ও বিশুদ্ধ চিত্রাবলীঃ—

'নন্দনলাল' 'শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী', 'শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকা', 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভগবান' ও 'প্রণবেযুগল' ইত্যাদি দেবদেবীর চিত্র। (১) হাট-